বাংলার সাধক

(২য় খণ্ড)

বাংলার সাধক

(২য় খণ্ড)

গঙ্গেশচন্দ্র চক্রবর্তী

বিশ্ববাণী প্রকাশনী । কলকাতা

প্রথম প্রকাশ :

ভাদ্র, ১৩৩৪

প্রকাশক :

ব্রজকিশোর মণ্ডল

বিশ্ববাণী প্রকাশনী

৭৯/১বি, মহাত্মা গান্ধী রোড

কলকাতা ৯

মুদ্রাকর :

লীলা ঘোষ

তাপসী প্রিণ্টার্স

৩ শিবু বিশ্বাস লেন

কলকাতা ৬

প্রচ্ছদশিল্পী :

মনোজ বিশ্বাস

স্বর্গত পিতৃদেব
ডাক্তার সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর
পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে উৎসর্গীত
হলো।

গঙ্গেশচন্দ্র চক্রবর্তী

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এই গ্রন্থ রচনায় যাঁরা আমাকে শুধু উৎসাহিতই করেননি প্রকাশনার কার্যেও করেছেন নানাভাবে সাহায্য ও অক্লান্ত পরিশ্রম তাঁরা হলেন আমার বন্ধু ও শ্রদ্ধাস্পদ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ননীগোপাল তর্কতীর্থ, শ্রীপ্রেমানন্দ সেন, শ্রীঅনিল সেন ও শ্রীপ্রফুল্লরঞ্জন মুখোপাধ্যায়। সকলের নিকটই আমি স্বীকার করছি ঋণ ও কৃতজ্ঞতা।

কলিকাতা সতীশ মুখার্জী রোডস্থিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব মঠের সেক্রেটারী শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ মঠের লাইব্রেরীটি স্বাধীনভাবে ব্যবহার করতে দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে করেছেন আবদ্ধ।

জাতীয় গ্রন্থাগারের লাইব্রেরীয়ান শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ও সহকারী লাইব্রেরীয়ান অধুনা আনন্দবাজার পত্রিকার লাইব্রেরীয়ান শ্রীনকুল চট্টোপাধ্যায় এবং যে সমস্ত গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ করেছি সেইসব গ্রন্থের গ্রন্থকারদের নিকটও স্বীকার করছি কৃতজ্ঞতা।

গ্রন্থকার

এতে আছে :

পরমপুরুষ
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস

নবীন সন্ন্যাসী যোগাসনে হলেন উপবিষ্ট। পূত-সলিলা গঙ্গার তীরে সাধনকুটিরে। অরূপ পরব্রহ্মে লীন হতে হবে। কিন্তু মাতৃ-ভাবের সাধক অরূপের ধারণা করতে গিয়েও দেখেন অপরূপ রূপময়ী 'শ্যামা মা'—সম্মুখে দাঁড়িয়ে হাসছেন। মাতৃরূপ আর মাতৃ-নামের বাইরে আর কিছুই পারেন না কল্পনা করতে। অবশেষে নিরাশ হয়ে বললেন গুরুকে, 'তোমার অদ্বৈত জ্ঞান, অরূপ ব্রহ্ম নির্বিকল্প সমাধি, আমার হবে না। কি করি বল?' শিষ্যের 'না' শুনে ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন গুরু নাগা সন্ন্যাসী। দৃঢ় কণ্ঠে বলেন,—'নিশ্চয়ই হবে। সকল সাধনার সিদ্ধি তোমার করতলগত আর এটা হবে না? দেখি কেমন না হয়।' এই বলেই উত্তেজিত গুরু তীক্ষ্ণধার একখণ্ড কাঁচ সংগ্রহ করে শিষ্যের ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে নির্মমভাবে দিলেন বিদ্ধ করে। দরদরধারে বইতে লাগল রক্তধারা। এবারে শিষ্যকে নির্দেশ দিলেন,—'এইখানে। ঠিক এইখানে। এই ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে, সমস্ত ভুলে গিয়ে চিত্ত নিবিষ্ট কর। অবশ্যই হবে।' শিষ্যও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে পুনরায় কেন্দ্রীভূত করলেন চিত্তকে। স্থির হয়ে এলো দেহের স্পন্দন। স্থির হয়ে এলো চিত্ত। তারপর নিষ্প্রতীক। আর প্রতীক নেই। প্রতিমা নেই। প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য নেই। ভুবনময়

একটি অখণ্ড জ্যোতিঃ। একটি অখণ্ড পারস্পন্দ। আদিঅন্তশূন্য অরূপ সমুদ্র। আব্রহ্মস্তম্ব পর্যন্ত ব্রহ্মনিভা। তখন আর আমি তুমি নেই। *মিশে গেলেন আয়তাতীত আদিত্য। আকার থেকে* নিরাকারে। অসীমে অনন্তে। লীন হয়ে গেলেন পরমব্রহ্মে। বেদান্তোক্ত জ্ঞানমার্গের চরম ফল করলেন লাভ। নির্বিকল্প সমাধি। দেহে প্রাণের প্রকাশ মাত্র নেই। কিন্তু মুখ প্রশান্ত। গম্ভীর। জ্যোতিঃপূর্ণ। আত্মানুভূতির শুভ্র আলোকছটায় তখন তার মানবরূপ জ্যোতির্ময় দেবতার মূর্তিতে হলো রূপান্তরিত। এই নবীন সন্ন্যাসীই হলেন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস। আর এই দীক্ষাগুরুই হলেন নাগা সন্ন্যাসী তোতাপুরী পরমহংস। ইনি নবীন সন্ন্যাসীর সেই অলৌকিক মূর্তি নয়নগোচর করে বিস্ময়ানন্দে অভিভূত হয়ে চীৎকার করে বলে উঠলেন, 'য়হ ক্যা দৈবী মায়া'। সত্যসত্যই সমাধি! একদিনের বেদান্তোক্ত জ্ঞানমার্গের চরম ফল লাভ। দেবতার একি অদ্ভুত মায়া। এই তোতাপুরীই গদাধরকে সন্ন্যাসীর দীক্ষায় করেন দীক্ষিত। ইতিপূর্বে গদাধর শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হন তান্ত্রিকাচার্য কেনারাম ভট্টাচার্যের নিকট হতে। আর কঠিনতম তান্ত্রিক সাধনায় নিযুক্ত হয়েছিলেন যাঁর উৎসাহে এবং যার সহায়তায় চৌষট্টি প্রকার তন্ত্রোক্ত সাধনা করে অতি অল্পকালের মধ্যেই করেছিলেন সিদ্ধিলাভ তিনি হলেন ভৈরবী ব্রাহ্মণী সন্ন্যাসিনী যোগেশ্বরী। ইনিই প্রথম গদাধরকে অবতার-পুরুষ বলে করেন প্রচার।

এইভাবে মূর্তিপূজা হতে আরম্ভ করে নিরাকার নির্গুণ অদ্বৈত-তত্ত্বের উচ্চতম ধ্যানধারণা পর্যন্ত সকলপ্রকার সাধনায় সিদ্ধ হয়ে অল্পকালের মধ্যেই অনুভূতিলব্ধ জ্ঞানলাভ করলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। ঈশ্বরানুভূতি লাভ হওয়ার পর থেকেই বাংলার ধর্মপিপাসু ও প্রকৃত সত্যানুসন্ধিৎসুরা তাঁর নিকট আসতে লাগলেন এবং তাঁর শ্রীচরণে করলেন আত্মনিবেদন। ব্রাহ্মসমাজের দুই শ্রেষ্ঠ নেতা কেশবচন্দ্র সেন ও প্রতাপচন্দ্র মজুমদারও তাঁর দ্বারা হলেন প্রভাবিত।

শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে প্রতাপচন্দ্র বলেছেন, 'এই মহাপুরুষ যেখানেই যাইতেন সেখানেই আপনার চতুর্দিকে একটি জ্যোতির্ময় পরিমণ্ডল সৃষ্টি করিতেন। আজিও আমার চিত্ত সেই জ্যোতির্মণ্ডলে ভ্রমণ করিতেছে। যখনই আমার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইত এক অপূর্ব ভাবাতীত ও ভাষাতীত করুণা তিনি আমার প্রাণে ঢালিয়া দিতেন, আমি আজিও সেই প্রভাব অতিক্রম করিতে পারি নাই। আমি একজন ইউরোপীয়-ভাবাপন্ন, অর্ধনাস্তিক এবং তথাকথিত শিক্ষিত যুক্তিবাদী। আর তিনি একজন দরিদ্র অশিক্ষিত মূর্তিপূজক হিন্দু। কেন আমি তাঁহার কথা শুনিবার জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাঁহার পদতলে বসিয়া থাকিতাম?

তাঁহার ধর্মই তাঁহার একমাত্র পরিচয়। তাঁহার ধর্ম কি? ইহা গোঁড়া হিন্দুধর্ম নয়। ইহা এক অভিনব হিন্দুধর্ম। রামকৃষ্ণ পরমহংস কোন বিশেষ হিন্দু-দেবতার উপাসক নহেন। তিনি শৈব নহেন, বৈষ্ণব নহেন, তবুও তিনি এই সবই। তিনি শিবোপাসনা করেন, কালীপূজা করেন, রামের আরাধনা করেন এবং কৃষ্ণের বন্দনা করেন। আবার তিনি বেদান্তধর্মের একজন একনিষ্ঠ সাধক ও প্রচারক। তিনি প্রত্যেকটি ধর্ম উহার আনুষঙ্গিক আচার-ব্যবহার ও প্রথাসমেত গ্রহণ করিয়া থাকেন।'

ধীরে ধীরে শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্যসঙ্গের ফলে ব্রাহ্মসমাজের নবীন ও প্রবীণের দল তাঁর অনুরাগী হয়ে উঠলেন। তাঁর নিকট হতে দিব্য-প্রেরণালাভ করে অনেকেরই ধর্মজীবনে হলো আমূল পরিবর্তন। সত্য সত্যই ব্রাহ্মসমাজের আধ্যাত্মিক ভিত্তি সুদৃঢ় না হওয়ায় তা প্রকৃত সত্যানুসন্ধিৎসুর অন্তরের ধর্মপিপাসাকে পরিতৃপ্ত করতে হলো না সমর্থ। তাইতো তরুণ বঙ্গের সকল সম্প্রদায় হতেই সত্যানুরাগীরা দলে দলে আসতে লাগলেন শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট। তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন তরুণ নরেন্দ্রনাথ। তিনিও ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত

এবং ইউরোপীয় চিন্তায় ভাবিত হয়ে অজ্ঞেয়বাদী হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু তিনি ছিলেন সত্যানুসন্ধানী। তাঁর অন্তর হতে উত্থিত প্রশ্নের ঈশ্বরানুভূতির সদুত্তর দিতে পারেন নি ব্রাহ্মসমাজের আচার্যেরা। অবশেষে ব্যাকুল হয়ে ছুটে এলেন শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট, দক্ষিণেশ্বরে। সোজাসুজি প্রশ্ন করলেন—আপনি ভগবান দেখেছেন? তপোবনের সত্যদ্রষ্টা ঋষির মত, দক্ষিণেশ্বরের তপস্যাভাস্বর শ্রীরামকৃষ্ণ প্রত্যুত্তরে বললেন,—কেবল আমি দেখেছি তা নয়, তোমাকেও ভগবান দেখাতে পারি। তোমাকে যেমন দেখছি, তার চেয়েও স্পষ্টভাবে—তাঁকে দেখতে পাই গো।

অব্যক্ত বিস্ময়ে ও ভয়ে নরেন্দ্রনাথ দেবমানব শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট সম্পূর্ণরূপে করলেন আত্মসমর্পণ।

এইভাবে অতি উদ্ধত ধর্মচেতনায় গর্বিত অতিজ্ঞানী সকলেই শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীচরণে করলেন আত্মনিবেদন।

তরুণ নরেন্দ্রনাথের প্রশ্ন শুধুমাত্র তাঁর ব্যক্তিগত প্রশ্ন নয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা তথা সমগ্র ভারতের শিক্ষিত তরুণ সম্প্রদায়ের অন্তরের জিজ্ঞাসা। ঊনবিংশ শতাব্দীর তরুণ সম্প্রদায় পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ও ভাবিত হয়ে স্বজাতীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যের প্রতি হারিয়ে ফেললো শ্রদ্ধা, বিশ্বাস। কৃত্রিম অনুকরণপ্রিয় মেরুদণ্ডহীন হয়ে পড়লো। হিন্দু সংস্কৃতি ও ধর্মের পক্ষে তারা হয়ে উঠলো প্রাণঘাতী। সমাজে সৃষ্টি হলো বিশৃঙ্খলা, বিপর্যয়। ইউরোপীয় সভ্যতা বিজাতীয়করণের স্রোত দিয়েছিল প্রবাহিত করে সমগ্র বঙ্গে তথা ভারতে। আর সেই বিশৃঙ্খলা ও বিপর্যয়ের স্রোতকে প্রতিহত ও প্রতিরুদ্ধ করতেই যেন আবির্ভূত হলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব। বাংলার ছোট্ট এক পল্লীগ্রামে, হুগলী জেলার কামারপুকুরে। বারোশো বিয়াল্লিশ সালের ৬ই ফাল্গুন, (ইংরাজী ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই ফেব্রুয়ারী) বুধবার শুক্লা দ্বিতীয়া তিথির ব্রাহ্মমুহূর্তে।

পিতা ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় ছিলেন সত্যনিষ্ঠ ও ধর্মপরায়ণ। আর মাতা চন্দ্রমণি দেবী ছিলেন স্নেহ, সেবা ও সরলতার প্রতিমূর্তি। গৃহদেবতা রঘুবীর শালগ্রাম-শিলা আর রামেশ্বর শিবলিঙ্গের সেবা আরাধনার মধ্য দিয়েই দিন অতিবাহিত করেন ভক্তপ্রবর ক্ষুদিরাম।

ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোন চিন্তাই ছিল না ক্ষুদিরামের। পৈতৃক বাড়ি আর দেড়শত বিঘা ধানের জমি। ঘরে আছেন রঘুবীর। অভয়প্রদা প্রসন্নতা। সংসারে আর কি চাই? সত্যের আশ্রয়েই তো বেশী শান্তি। এরই পরীক্ষা নিতে ভগবান বোধ হয় সত্যনিষ্ঠ ক্ষুদিরামের নিকট এসে উপস্থিত হলেন। ক্ষুদিরাম অবশ্য সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন।

আদালতে আপনাকে সাক্ষী দিতে হবে, রাজাসাহেবের হুকুম। মামলা রুজু আছে, বললো—জমিদারের পেয়াদা।

ক্ষুদিরাম তাঁর মুখের দিকে হতবাক্ হয়ে তাকিয়ে থেকে বললেন —তা আমায় কেন গো? পেয়াদা হেসে বললো, আপনি ধার্মিক লোক। এ অঞ্চলে আপনার মত সৎ লোক দ্বিতীয় আর কেউ নেই। আপনার জবানবন্দির দাম আছে, রাজা বাহাদুর ভেবেচিন্তেই আমাকে পাঠিয়েছেন।

এবারে ক্ষুদিরামের মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। বুঝলেন মামলাটি মিথ্যে, তঞ্চকি। তারপর গুরুগম্ভীরস্বরে বললে—মিথ্যে মামলার সাক্ষী হতে পারবো না। এক বাক্যে না করলেন সত্যনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ ক্ষুদিরাম। দেরে গ্রামের জমিদার রামানন্দ রায়, দোর্দণ্ডপ্রতাপ তার। ফল কি হলো? কোপে পড়লেন জমিদারের। অবশেষে জমিদার ক্ষুদিরামের বিরুদ্ধেই নালিশ করলেন। ডিক্রি পেয়ে গেলেন। ধার্মিক ব্রাহ্মণের বাস্তুভিটা, ধানের জমি এক নিমেষে মিলিয়ে গেল শূন্যে, রইলো শুধু রঘুবীর।

স্ত্রী কন্যা ও পুত্রের হাত ধরে রাস্তায় এসে দাঁড়ালেন। হঠাৎ এক বন্ধু এসে পাশে দাঁড়ালো, কামারপুকুর গ্রামের সুখলাল গোস্বামী।

—চল আমাদের গ্রামে, তুমি ধার্মিক মানুষ গ্রামে থাকলে গ্রামেরও মঙ্গল। এক বিঘে জমি দেবো, এক রকম চলে যাবে। কি বল?

ক্ষুদিরাম আর আপত্তি করলেন না। সপরিবারে চলে এলেন কামারপুকুর গ্রামে। গোস্বামীদের বাড়ির একাংশে চালাঘর তুলে বাস করতে লাগলেন। লক্ষ্মীজলার মাঠে ধানী জমি পেলেন এক বিঘে। ধানী জমি সোনার ধানে হয়ে উঠলো ঝলমল। রঘুবীর-শিলার সেবা পূজা আরাধনার কোনও ত্রুটি হলো না।

এবারে ক্ষুদিরাম রওনা হলেন গয়াধামের পথে পদব্রজে। পদব্রজে না হলে তীর্থ কী? ইতিপূর্বে পদব্রজে সমস্ত দক্ষিণভারত ও রামেশ্বর সেতুবন্ধ ঘুরে এসেছেন। গয়াধামে পৌঁছুলেন চৈত্রের শুরুতে। পিণ্ড দিলেন বিষ্ণুপদে। রাত্রে অভাবনীয় অপূর্ব এক স্বপ্ন দেখলেন ক্ষুদিরাম।

শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী গদাধর শ্রীশ্রীনারায়ণ তাঁর সম্মুখে আবির্ভূত হয়ে বলছেন, 'আমি পুত্র হয়ে তোর ঘরে যাবো।' বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে ক্ষুদিরাম বললেন,—'আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ তোমার সেবা কেমন করে করবো গো?' প্রত্যুত্তরে মৃদু হেসে স্বয়ং বিষ্ণু বললেন,—'ওরে, আমি উপচার চাই না, চাই ভক্তি।' হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। ভক্তি ও বিস্ময়ে আবিষ্ট ব্রাহ্মণ দেবতার এইরূপ অহেতুকী করুণা, অদ্ভুত অভিলাষের কথা চিন্তা করে অভিভূত হলেন। আনন্দাশ্রু নির্গত হতে লাগলো।

স্বপ্নের কথা গোপন রাখলেন। দেশে ফিরে চন্দ্রমণির মুখে অলৌকিক দর্শন ও নানা দেবদেবীর অনুভূতির কথা শুনে স্বপ্নদর্শনের সত্যতা সম্বন্ধে হলেন নিঃসন্দেহ।

দিনে দিনে—চন্দ্রমণির রূপলাবণ্যও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে লাগলো। যেন 'রূপের কুসুম' বলাবলি করে পাড়া-প্রতিবেশিনীরা, পরিণত বয়সে ব্রাহ্মণী আবার সন্তানসম্ভবা হলেন। দিব্য দর্শন হতে লাগলো।

শিবমন্দিরের সামনে—দাঁড়িয়ে আছেন চন্দ্রমণি,—দেখলেন মহাদেবের গা থেকে তীব্র একটা জ্যোতি বেরিয়ে তার শরীরে মধ্যে ঢুকে পড়লো, মহাদেব হাসছেন।

—ওগো দেবতা প্রসন্ন হয়েছেন। একান্তচিত্তে কেবল রঘুবীরের শরণাপন্ন হও, ক্ষুদিরাম বললেন স্ত্রী চন্দ্রমণিকে।

এই হলেন পিতৃদেব আর মাতৃদেবী। উভয়েই দিব্যভাবের ভাবুক। ধীরে ধীরে সেই শুভদিনটি এসে উপস্থিত হলো। বেজে উঠলো মঙ্গলশঙ্খ। শুধু কামারপুকুর নয়, আকাশ-বাতাস-অরণ্য-সমুদ্র—সমস্ত বিশ্ব হয়ে উঠলো মধুময়, দিব্য শিশুর আবির্ভাবে। ক্ষুদিরাম নবজাত শিশুর নাম রাখলেন গদাধর। ক্ষুদিরামের তিন পুত্র রামকুমার, রামেশ্বর ও গদাধর। আর দুই কন্যা হলেন কাত্যায়নী ও সর্বমঙ্গলা।

স্বয়ং গদাধর এসে জন্ম নিয়েছেন দরিদ্র ব্রাহ্মণের পর্ণকুটিরে। আর সেই পর্ণকুটিরে হলো দেবতার লীলানিকেতন। গদাধর লীলা করেন জননী চন্দ্রমণির সঙ্গে। ছোট্ট শিশুকে কোলে নিয়ে বসে আছেন চন্দ্রমণি। হঠাৎ বোধ করেন পূর্ণাবয়ব পুরুষের ওজন। হালকা ছোট্ট শিশুর ওজন তো নয়। এত ভারি যে দুই হাত দিয়ে শিশুকে তুলতেও পারেন না। ভয়ে চীৎকার করে ওঠেন। ছুটে আসেন সকলে, কি হলো? হলো কি? তখন আবার যেমন শিশু তেমনটিই। সবকিছু শুনে সকলে হাসাহাসি করে। কিন্তু চন্দ্রমণি মনে মনে বুঝলেন এ শিশু সাধারণ শিশু নয়। নিশ্চয়ই কোন দেবতা শিশুর রূপ ধরে তার ঘরে বিরাজ করছেন। আর একদিন ঘরে মশারির মধ্যে শিশু ঘুমিয়ে আছে। হঠাৎ কি কাজে ঘরে এসে —চন্দ্রমণি দেখেন মশারির মধ্যে ছোট্ট শিশু তো নেই। বৃহৎকায় বিশাল দেহধারী কে যেন শুয়ে আছে। ভয়ে বিস্ময়ে সেদিনও চীৎকার করে ওঠেন চন্দ্রমণি।

শিশু গদাধর তখন একটু বড় হয়েছে। ছোট ছোট পা ফেলে

চলাফেরা করে। ক্ষুদিরাম রঘুবীরের পূজায় মগ্ন। ইতিমধ্যে ছোট্ট গদাধর ঠাকুরঘরে ঢুকে চন্দন সারা গায়ে মেখে রঘুবীরকে দেবার মালাটি গলায় পরে পিতার অনুকরণে ধ্যানমগ্ন হয়ে বসে রইলো। অনির্বচনীয় এক রূপ ধারণ করলেন শিশুরূপী রামকৃষ্ণ। অকস্মাৎ পুত্রের এই দিব্যরূপ দর্শন করে দিব্যভাবের ভাবুক ক্ষুদিরাম হলেন মুগ্ধ। বিস্মিত। অভিভূত।

আধো আধো ভাষায় শিশু গদাধর বলছেন, দেখো বাবা আমি রঘুবীর সেজেছি। রাগ করবেন কি ; আদর করে পুত্রকে কোলে তুলে নিলেন ক্ষুদিরাম। আত্মভোলা শিশুর মাঝে যে বাসা বেঁধেছেন শিশু ভোলানাথ। পাঁচ বছরের শিশু গদাধর বই বগলে করে এসে উঠলো লাহাবাবুদের পাঠশালায়। লেখাপড়া করতে নয়, সহপাঠীদের সঙ্গে আনন্দ করতে। লেখাপড়ায় মন ছিল না গদাধরের। পড়া বলতে বললেই মুশকিল। স্তোত্র, প্রণাম দাও মুখস্থ বলে দেবে। তালপাতায় ঠাকুরের নাম লিখতে দাও লিখে দেবে। কিন্তু অঙ্কে আতঙ্ক। ভজন কীর্তন আর কথকতা করে ধীরে ধীরে সে সকলেরই প্রিয় হয়ে উঠলো। বালকদের যাত্রাগানের শিক্ষাগুরু ও সঙ্গীতাচার্য ছিল বালক গদাধর। স্বভাবে চঞ্চল হলেও তার মধ্যে ভাবতন্ময়তাও ছিল। একদিন নির্জন প্রান্তরের মধ্য দিয়ে চলতে চলতে হঠাৎ আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখে বালক গদাধর শুভ্র বলাকার মালা ভেসে চলেছে অসীমের পথে। বলাকাদের যাত্রা, আকাশের বিশালতা আর প্রকৃতির নিস্তব্ধতা তার অন্তরের সুপ্ত চৈতন্যকে তুললো জাগিয়ে। ভাবাবেশে বিভোর হয়ে মূর্ছিত হয়ে পড়লো গদাধর। আত্মভোলা গদাধরকে নিয়ে চিন্তিত হলেন মাতা চন্দ্রমণি।

শৈশবেই পিতৃহারা হলো গদাধর। যখন তার বয়স মাত্র সাত বৎসর। বাবা নেই সবই যেন শূন্য। মন বসে না কিছুতে। ঘুরে বেড়ায় ভূতির খালের শ্মশানে। পিতার মৃত্যুর দুই বৎসর পর গদাধরের উপনয়ন সংস্কার হলো সম্পন্ন।

লাহাবাবুদের অতিথিশালায় সাধুসন্ন্যাসীদের আনাগোনা। গদাধরের মন পড়ে আছে সেখানে। বসে বসে শুনছে সাধুদের মুখনিঃসৃত অমৃতময় বাণী। ধর্মালোচনা। আবার কখনও হরিনাম গানে মাতোয়ারা। গাঁয়ের কুমোরদের সঙ্গে মূর্তি গড়তে, পট আঁকতেও ওস্তাদ গদাধর।

মধু যুগীর বাড়িতে প্রহ্লাদ-চরিত পড়ছে গদাধর। রামায়ণ মহাভারতও দক্ষ কথকদের মত পড়ে। মনোহরণ পড়া। তাইতো গ্রামের মানুষ সকলেই ভালবাসে এই চঞ্চলমতি বালক গদাধরকে।

আনুড়ে বিশালাক্ষীর মন্দির। কামারপুকুর থেকে মাইল দুই দূর। অনেকে চলেছে। মানত আছে। হঠাৎ গদাধরও যাত্রীদের পিছু নিল। মাঠের মধ্য দিয়ে পথ। দূরপ্রসারী প্রান্তর। ঘন সবুজ শস্যে আছে ভরে। বনলতার গন্ধ নিয়ে, মৃদু বাতাস শস্যক্ষেত্রকে আন্দোলিত করে বয়ে চলেছে। চারিদিকে ফুল। অজস্র বনফুল। অপূর্ব এক প্রাকৃতিক পরিবেশে মুগ্ধ অভিভূত হলো গদাধর। ভাবে বিভোর হয়ে গান ধরলো। বিশালাক্ষীর মহিমা কীর্তনের গান। ভাবাবেশে এবারও মূর্ছিত হলো গদাধর।

গ্রামে কিছুই হচ্ছে না তাই গদাধরকে কলকাতায় নিয়ে এলেন রামকুমার। পিতার মৃত্যুর পর সংসারের অবস্থা দিনে দিনে যখন অচল হয়ে উঠলো। তখন রামকুমার চলে এলেন কলকাতায়। ঝামাপুকুরে চতুষ্পাঠী স্থাপন করে অধ্যাপনার কাজে ব্রতী হলেন। গ্রামের সঙ্গীদের প্রভাব থেকে বিচ্ছিন্ন হলে লেখাপড়ায় মন বসবে গদাধরের এই আশাই ছিল রামকুমারের। কিন্তু ভগবানের ইচ্ছা অন্যরূপ।

কলকাতায় এসেও কোন পরিবর্তন হলো না গদাধরের। লেখাপড়া নয়, জ্যেষ্ঠ সহোদরের গৃহকর্ম ও যাজনকার্যে সহায়তা করতে লাগলেন। পূজাপার্বণের জন্য যে সব যজমানের বাড়ি যেতেন তাঁরাও গদাধরের সরলতা ভক্তি ও সঙ্গীতে মুগ্ধ হতেন। কথকতা ও

ধর্মসঙ্গীত শোনাবার জন্য অনেক জায়গা থেকেই আমন্ত্রণ আসতো গদাধরের। সুতরাং এখানেও তাঁর অনুরাগীর অভাব হলো না। আর অর্থোপার্জনে কোন স্পৃহা ছিল না গদাধরের। সবকিছুই লক্ষ্য করছিলেন রামকুমার। মাসের পর মাস অতিক্রান্ত হলো বছর ঘুরে এলো। কিন্তু গদাধরের বিদ্যার্জনের কোন সম্ভাবনাই দেখলেন না রামকুমার। বিচলিত হলেন জ্যেষ্ঠ সহোদর। একদিন দৃঢ়কণ্ঠে সজাগ করে দিলেন কনিষ্ঠ সহোদরকে। আত্মভোলা গদাধরকে। কনিষ্ঠও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত জ্যেষ্ঠকে জানিয়ে দিলেন, 'তোমাদের ও চাল-কলা-বাঁধা বিদ্যা আমি শিখতে চাই না।'

রামকুমারও নিঃসংশয় হলেন। বুঝলেন চেষ্টা বৃথা।

পুঁথিগত বিদ্যার অসারতা প্রমাণ করবার জন্যই বোধ হয় রামকৃষ্ণ একপ্রকার নিরক্ষর রইলেন।

যে অজানা শক্তি গদাধরের জীবনকে পরিচালিত করছেন তাঁরই ইচ্ছায় গঙ্গার পূর্বকূলে দক্ষিণেশ্বরে ভবতারিণীর বিগ্রহ করলেন প্রতিষ্ঠা রাণী রাসমণি। বিপুল অর্থব্যয়ে বিরাট এবং সুরম্য এক দেবালয় করলেন নির্মাণ। এই সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হলো বিষ্ণুমন্দির এবং দ্বাদশ শিবমন্দির। ১২৬২ সালের পূর্ণিমার দিনে নবনির্মিত মন্দিরে মহাসমারোহে দেবতার পূজার্চনার শুভ উদ্বোধন হলো। রামকুমার ভবতারিণীর পূজকের কার্যে হলেন ব্রতী। ঝামাপুকুরের চতুষ্পাঠী হলো বন্ধ। গদাধরও চলে এলেন দক্ষিণেশ্বরে। কালী-বাড়িতে। সরল সৌম্যদর্শন নবীন যুবক গদাধরকে দর্শন করে মুগ্ধ হলেন মথুরানাথ। আর রাণী রাসমণি। কিছুদিনের মধ্যেই মথুরা-নাথের অনুরোধে গদাধর ভবতারিণীর বেশকারীর কার্যে হলেন ব্রতী। এই সময়েই শক্তিসাধক কেনারাম ভট্টাচার্যের নিকট তিনি শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেন। এবং অল্পকালের মধ্যেই গদাধর ভবতারিণীর পূজকের পদে হলেন অধিষ্ঠিত। ইতিমধ্যে জ্যেষ্ঠ সহোদর রামকুমার অকস্মাৎ দেহলীলা সংবরণ করলেন। অকালে অপরিণত বয়সে।

এবারে শুরু হলো সাধনা।

ভবতারিণীর পূজারী গদাধর। ধীরে ধীরে মাতৃসাধক গদাধরে রূপান্তরিত হলেন। দিনের পর দিন রাত্রির পর রাত্রি। মাতৃনামে বিভোর, মাতৃপূজায় মাতৃনামে বিভোর নবীন সাধক গদাধর। পুরোহিতের গতানুগতিক ক্রিয়াপদ্ধতি অনুসরণ করলেন না। বাহ্যাড়ম্বর করলেন পরিত্যাগ। অন্তরের অন্তস্থল হতে উদগত ভক্তি-ধারা দিয়ে করতে লাগলেন পূজা। ভবতারিণীকে। শিশুর মত সরল প্রাণে ডাকেন মা'কে। ভবতারিণীকে। শ্রীশ্রীকালী মাতাকে। মায়ের সঙ্গে কথা বলবার জন্য ব্যাকুল হয়ে ছুটে যান মন্দিরে। দর্শন না পেয়ে অভিমানে কাঁদেন। মন্দিরে, ঘরে, পঞ্চবটীতে, গঙ্গার তীরে তীরে। মাতৃহারা বালকের মত কেবল কাঁদেন আর মা'কে মা-মা বলে ডাকেন। দিনে দিনে ব্যাকুলতা তীব্র হতে হয়ে উঠলো তীব্রতর। সাধনা ব্যাকুলতা পৌঁছল চরমে। একদিন অন্ধকার রাত্রিতে মন্দিরে প্রবেশ করে মাতৃদর্শন পিপাসা-কাতর গদাধর বলে উঠলেন, 'মা, দেখা দিবি তো দে নতুবা এই খড়্গ দিয়ে এখানেই জীবন বলি দেবো।' সহসা জ্যোতির্ময়ী মূর্তি জীবন্ত হয়ে উঠলো। নিখিল ভুবন বিলুপ্ত করে উজ্জ্বল উর্মিমালায় অন্তর বাহির ব্যাপ্ত করে মায়ের মুখখানি হাসতে লাগলো। সাধক গদাধর দেখলেন। বরাভয়করা চিন্ময়ী মূর্তি হাসছেন। কথা বললেন। পরমুহূর্তেই মূর্ছিত হলেন নবীন সাধক। একটু সংজ্ঞা ফিরলেই কাতর কণ্ঠে মা-মা বলে ডাকতে লাগলেন। মাকে যেন খুঁজছেন। আবার সংজ্ঞাশূন্য। প্রথম দর্শনের গদাধরের ব্যাকুলতা আরও বেড়ে গেল। জগজ্জননীও তাঁকে বার বার দেখা দিলেন। কিন্তু নবীন সাধকের চিত্ত তাতেও হলো না তৃপ্ত। আহার নিদ্রা ত্যাগ করে কঠোর সাধনায় হলেন নিমগ্ন। মায়ের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার সাধনা। শরীরের প্রতিও কোন ভ্রুক্ষেপ নেই। উদাসীন ভাব।

সংবাদ পৌঁছালো কামারপুকুরে জননী চন্দ্রমণির কাছে। তিনি

বুঝলেন গদাধরের বাল্যের সেই বায়ুরোগ আবার প্রবল হয়েছে। তাই চিকিৎসার জন্য নিজের কাছে নিয়ে এলেন পুত্রকে। বাল্যের লীলানিকেতনে কিছুদিন বাস করে জননীর স্নেহযত্নে গদাধরের উদ্দাম আধ্যাত্মিক আবেগ অনেকটা হলো প্রশমিত। মাতা ও ভ্রাতার মনে আশার সঞ্চার হলো। প্রতিবেশীদের পরামর্শে বিবাহের চেষ্টাও চলতে লাগলো। কিন্তু কোথাও মনের মত কন্যা খুঁজে পাওয়া গেল না। সকলেই হলেন হতাশ। গদাধর কিন্তু সবকিছু দেখছেন, শুনছেন। আর মৃদু মৃদু হাসছেন।

'জয়রামবাটীর রামচন্দ্র মুখুজ্যের মেয়েটি কুটো বেঁধে রাখা আছে দেখগে যাও।' বললেন গদাধর। অবশেষে সত্যে সত্যই রামচন্দ্র মুখুজ্যের কন্যা সারদামণির সন্ধান মিললো। শুভদিনে, শুভলগ্নে বিবাহকার্যও হলো সুসম্পন্ন। বাংলা ১২৬৬ সালের বৈশাখ মাসে। গদাধরের বয়স তখন তেইশ পূর্ণ হয়েছে আর সারদামণি পড়েছেন ছয়ে। সারদামণির পিতা রামচন্দ্র মুখুজ্যে স্বধর্মনিষ্ঠ ন্যায়পরায়ণ ঈশ্বরভক্ত ও অমায়িক ছিলেন। স্বভাবগুণে এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ গ্রামের সকলেরই শ্রদ্ধা ও ভালবাসার পাত্র হয়েছিলেন। সহধর্মিণী শ্যামা-সুন্দরী ছিলেন পাশ্ববর্তী শিহড় গ্রামের মেয়ে। স্বামীর অনুগতা ও ভক্তিমতী রমণী। অল্প জমিজমার ফসল সজনসাজন আর পৈতার সুতা কেটে এই দরিদ্র দম্পতি দিন অতিবাহিত করতেন। দুঃখ দরিদ্রতার মধ্যেও সত্যভ্রষ্ট হন নি। সত্যকে আশ্রয় করেই তাঁরা ছিলেন শান্তিতে।

বাঁকুড়া জেলার পূর্ব প্রান্তে জয়রামবাটী গ্রাম, আর হুগলী জেলার পশ্চিমপ্রান্তে কামারপুকুর। মাত্র সাড়ে তিন মাইল ব্যবধান। আর মধ্যে একটি খালের মতো আঁকাবাঁকা দামো[illegible]

জয়রামবাটী আর কামারপুকুর। এই দুই পল্লী যেন প্রকৃতি আর পুরুষ। তাদের শুভমিলনে জগতে এক নবযুগের হলো সূচনা। বসুন্ধরা মর্মে মর্মে অনুভব করে এই নবযুগের নবজাগরণের স্পন্দন।
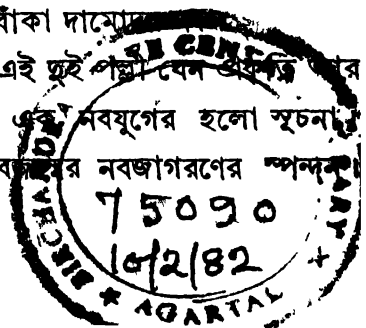
পুলক শিহরণ জাগে তার অঙ্গে প্রত্যঙ্গে। শিরায় উপশিরায়। বিদ্যুদ্‌বেগে ছুটে চলে যেন নবচৈতন্যের প্রাণশক্তি। সর্বাঙ্গে তার নবজীবনের পরিপূর্ণ শোভা। অন্তরে তার নূতন দিনের নব-উন্মাদন।

এই ক্ষণিক মিলনের পর নববধূ সারদামণি ফিরে গেলেন পিত্রালয়ে। আর গদাধর চলে এলেন তাঁর সাধনভূমিতে। দক্ষিণেশ্বরে। আবার আত্মনিয়োগ করলেন মাতৃপূজায়। সাধনায়। ক্ষুধা তৃষ্ণা, বৃদ্ধা জননী, নববিবাহিতা পত্নী, বাহ্যজগতের সবকিছুই গেলেন ভুলে। মাতৃভাবে এমনই বিভোর হলেন যে পূজার নিয়ম-পদ্ধতির ভুল হতে লাগলো। কখনও দেবীর উদ্দেশে উৎসৃষ্ট পুষ্পমালা নিজকণ্ঠেই অর্পণ করেন আবার কখনও পাষাণ প্রতিমার মুখে পায়সান্ন না দিয়ে নিজের মুখে দিয়েই বলেন খাও মা, খাও। আবার কখনও মন্ত্রোচ্চারণের পরিবর্তে কেবল শ্যামাসঙ্গীত গাইতে থাকেন।

অভিযোগ পৌঁছাল রাণী রাসমণির কাছে। মন্দিরের কর্মচারীরাই অভিযোগ জানিয়েছেন পূজারীর বিরুদ্ধে। অনাচারের অভিযোগ। সবকিছু শুনে—রাণীও হলেন ভীত। দেবীর কোপে যদি সর্বনাশ হয়। জামাতা মথুরানাথকে আদেশ করলেন প্রতিবিধান করবার জন্য। মথুরানাথও রাণীকে আশ্বস্ত করে বললেন, তিনি থাকতে মন্দিরে কিছুতেই অনাচার হতে দেবেন না।

পূজারীর অবস্থা স্বয়ং প্রত্যক্ষ করবার জন্য মথুরানাথ এলেন দক্ষিণেশ্বরে। স্বেচ্ছাচারী পূজারীর পেছনে দরজার পাশে নিঃশব্দে রইলেন দাঁড়িয়ে।

পূজারী দেবী প্রতিমার সম্মুখে বসে আছেন। হাতে অঞ্জলির পত্রপুষ্প। সমাধিস্থ। নিবাত নিষ্কম্প দীপশিখার মত। নীরব নিস্তব্ধ চতুর্দিক। ধীরে ধীরে পূজকের বাহ্যচৈতন্য ফিরে আসে। ভক্তি গদ্‌গদ কণ্ঠে বলেন,—মা, মাগো পূজা গ্রহণ কর্। দয়া কর্ মা। মা—মাগো! এ কণ্ঠস্বর কোন মানুষের নয়। তপোবনের কোনও মহর্ষির কণ্ঠের আওয়াজ। সিদ্ধপুরুষ মহামানবের কণ্ঠস্বর।

যেন কোনও দেবতার কণ্ঠের সুরধ্বনি। সে কণ্ঠধ্বনিতে গম্‌গম্ করে ওঠে মন্দিরের অভ্যন্তর, সমস্ত মন্দিরপ্রাঙ্গণ। তারপর সে ধ্বনি অদূরে প্রবাহিতা গঙ্গার কুলরোলের সাথে যায় মিশে। ভয়ে বিস্ময়ে অবাক হয়ে ওঠেন সেজবাবু—মথুরানাথ বিশ্বাস। একি দৃষ্টিবিভ্রম, না স্বপ্ন? আর এক মুহূর্তও দেরি করেন নি মথুরানাথ দক্ষিণেশ্বরে। ছুটে চলে এলেন রাণী রাসমণির নিকট। অদ্ভুত অভিজ্ঞতার কথা শুনলেন রাণী জামাতার মুখ থেকে। উভয়ে স্তব্ধ, পরম বিস্ময়ে হতবাক্। পূজারীর সাধনায় পাষাণ প্রতিমা সত্যই জাগ্রত হয়েছে। স্বপ্ন হয়েছে সার্থক। আনন্দাশ্রু নির্গত হতে লাগলো রাণীর গণ্ড বেয়ে।

যথাসময়ে মন্দিরের কর্মচারীদের উপর নির্দেশ এলো—'বাবার কোন কাজে কেউ বাধা দেবে না। বাধা দিলে চাকরি থাকবে না।'

একদিন রাণী রাসমণি গঙ্গাস্নানান্তে মন্দিরে এসেছেন। ভবতারিণীকে প্রণাম করে সাধক গদাধরের নিকটেই বসলেন। তারপর অনুরোধ করলেন গদাধরকে একখানি শ্যামাসঙ্গীত গাইবার জন্য। গদাধরও মৃদু হেসে গান ধরলেন। ভাবোন্মাদে মত্ত হয়ে গাইছেন। কি সে সুর! কি সে ভাব! কিন্তু কোথায় রাণী রাসমণি? রাসমণি তখন একটি মকদ্দমার ফলাফলের কথা ভাবছেন। তাইতে হঠাৎ সাধকের ভাবস্রোত হলো স্তব্ধ। ব্যথিত হলেন সাধক রাণী রাসমণির মুখের দিকে তাকিয়ে। ব্যথিত চিত্তে চপেটাঘাত করলেন রাণীকে। —কি এখানে মায়ের পায়ের তলায় বসেও বিষয়চিন্তা? রাণী নিজের অপরাধ বুঝে অপ্রতিভ হলেন। কিন্তু অসন্তুষ্ট হলেন না। মনে মনে ভাবলেন বাবা আমার মনের গোপন কথা জানলেন কি করে? তবে কি ইনি—মহাপুরুষ? অন্তর্যামী?

তাইতো ব্রহ্মজ্ঞ সন্ন্যাসী তোতাপুরীও অন্তর্দৃষ্টিতে নবীন সাধক গদাধরের উচ্চাবস্থা উপলব্ধি করেই বলেছিলেন,—বিবাহ হইয়াছে

তো কি হইয়াছে ? যাঁহার আত্মসংযম এবং আত্মজ্ঞান সুপ্রতিষ্ঠিত কে তাঁহাকে বিচলিত করতে পারে ?

এই তোতাপুরীর নিকট হতে সন্ন্যাসমন্ত্রে দীক্ষা নিয়েই গদাধর হলেন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ। অনায়াসে শিষ্যকে সমাধিনিমগ্ন দেখে তোতাপুরীর মন প্রসন্নতায় ওঠে ভরে। নির্বিকল্প সমাধির দিব্যানন্দে শ্রীরামকৃষ্ণের দিবারাত্র চলতে লাগলো সমভাবে। সর্বদাই তদ্ভাবে বিভোর। আহার্য ও পানীয় গ্রহণেও অনীহা। কয়েক মাসের মধ্যে স্বাস্থ্যের খুবই অবনতি ঘটলো। এই সময়ের সেবা-সঙ্গী ছিলেন ভাগিনেয় হৃদয়রাম মুখোপাধ্যায়। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। স্বাস্থ্যের আর উন্নতির লক্ষণ দেখা গেল না। চিন্তিত হলেন সকলে। স্থান পরিবর্তনে স্বাস্থ্যের উন্নতি হতে পারে মনে করে মথুরানাথের পরামর্শে সেবক হৃদয়রাম শ্রীরামকৃষ্ণকে নিয়ে এলেন কামারপুকুরে, শৈশব ও বাল্যের লীলানিকেতনে। যেন লীলা করবার জন্য। আর সঙ্গে এলেন ব্রাহ্মণী সন্ন্যাসিনী যোগেশ্বরী। শ্রীরামকৃষ্ণের তন্ত্রসাধনার গুরু। জয়রামবাটী থেকে এলেন সহধর্মিণী সারদামণি। পতির সেবায় আত্মনিয়োগ করবার জন্য। আনন্দের হাট বসে গেলো কামারপুকুরে। পল্লীর নরনারী যুবক বৃদ্ধ বৃদ্ধা সকলেই এসে ভিড় জমালো গদাধরের বাড়িতে। তাদের কাছের মানুষ, সকলেরই প্রিয় গদাধর এসেছে অনেকদিন পর। শ্রীরামকৃষ্ণ নয় গদাধর। তারা দেখলো জানলো চিনলো গদাধরকে। গদাধর উন্মাদগ্রস্ত নয়, এক আনন্দময় পুরুষ। তাঁর মুখনিঃসৃত ভাগবতী কথা শুনবার জন্যই তাদের এ আকুলতা। সরল সদানন্দ গদাধরও সকলের সঙ্গে প্রাণ খুলে মেলামেশা করতে লাগলো। প্রভাবিত করলো তাদের মনকে। আনন্দময়ের সংস্পর্শে এসে সকলেই যেন এক অনির্বচনীয় প্রসন্নতা অনুভব করতে লাগলো মনে মনে। আবার সহধর্মিণীকেও তিনি গ্রহণ করলেন আন্তরিকতার সঙ্গে। নিজেকে সংসারত্যাগী মনে করে দূরে সরে আত্মগোপন করলেন না।

সারদামণিকে তিনি সাধারণ স্ত্রীলোক বলে মনে করতেন না। তাঁকে সহধর্মচারিণীরূপেই গ্রহণ করেছিলেন। একদিন জীবনের উদ্দেশ্য ও আধ্যাত্মিক সাধনা সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন সারদামণিকে, 'চাঁদামামা সকলেরই মামা তেমনই ঈশ্বরও সকলের অতি আপনার। যে তাঁকে মনেপ্রাণে ভালবাসে ডাকে সেই তাঁর দেখা পায়। তুমি যদি ডাক, তুমিও তাঁর দেখা পাবে। আর তাঁর দেখা পাওয়াই জীবনের উদ্দেশ্য। নতুবা জীবন বৃথা।' স্বামীর এই প্রেমপূর্ণ অমৃতময় কথামৃত পান করে মুগ্ধ হলেন কিশোরী সারদামণি। শ্রীরামকৃষ্ণের মধুর ব্যবহার আর প্রেমপূর্ণ কথাবার্তায় সারদামণি অভিভূত হয়েছিলেন এবং স্বামীর আসল চরিত্রটি জানতে পেরেছিলেন। তাঁর স্বামী 'পাগল বামুন নন। বেশ স্বাভাবিক এবং সুস্থ মানুষ। তবে সাধারণ মানুষ নন। দেবমানব। সর্বদাই ঈশ্বরীয় কথায় মত্ত। ভগবদ্ ভাবে বিভোর। মহান্ সাধক, পরমযোগী।' শ্রদ্ধাভক্তি ও প্রীতিতে তাঁর মনপ্রাণ ভরে উঠলো। পরমগুরু পতিকেই করে নিলেন। জীবনের ধ্রুবতারা। তাঁর বাক্যকে মন্ত্রের মত মনে করে সাধনার পথে হতে লাগলেন অগ্রসর। এই সময়ের কথা বলতে গিয়ে পরবর্তীকালে সারদামণি বলেছেন, 'তখন মনে হত কে যেন হৃদয়ে একটি আনন্দের ঘট স্থাপন করে রেখেছে।' 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলা-প্রসঙ্গ' বলেছেন, 'পবিত্রা বালিকা দেহবুদ্ধি বিরহিত ঠাকুরের দিব্য এবং নিঃস্বার্থ আদর-যত্ন লোভে ঐ সময়ে অনির্বচনীয় আনন্দে উল্লসিত হইয়াছিলেন। সেই ধীর স্থির দিব্য উল্লাসে অন্তর কতদূর কিরূপ পূর্ণ থাকিত তাহা বলিয়া বুঝাইবার নহে।'

কামারপুকুরের এইভাবে ছয় সাত মাস সকলকে আনন্দ বিতরণ করে শ্রীরামকৃষ্ণ আবার ভেঙে দিলেন সেই আনন্দের হাট। ফিরে এলেন দক্ষিণেশ্বরে। আর কিশোর বধূ সারদামণি গেলেন জয়রাম-বাটীতে। পিত্রালয়ে। সংসারের নানা কাজের মধ্যেও তাঁর মন ছুটে যেতো পতির চরণপ্রান্তে। পতির অন্তস্পর্শী সরল স্নেহপূর্ণ

কথাগুলি স্মরণ করে তাঁর অন্তর বিমল আনন্দে হয়ে থাকতো পরিপূর্ণ।

১৩৩৪ সালের মাঘ মাস। এক শুভদিনে যাত্রা হলো শুরু। তীর্থ-যাত্রা। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের তীর্থে তীর্থে ঘুরতে লাগলেন শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তবৃন্দসহ। সঙ্গে আছেন ভক্তপ্রবর মথুরানাথ। সেজবাবু। তাঁর পরিবারবর্গ। আর ভাগ্নে সেবক হৃদয়। বৈদ্যনাথধামে এসে দরিদ্র পল্লীবাসীদের দুরবস্থা দেখে ব্যথিত হলো রামকৃষ্ণের মন। অর্ধনগ্ন ক্ষুধাকাতর শীর্ণদেহের মানুষগুলির দিকে তাকিয়ে আর স্থির থাকতে পারলেন না দয়াল ঠাকুর। মথুরানাথকে বললেন,—

'ওগো সেজবাবু, এ দৃশ্য তো আর সহ্য হয় না। মা তোমায় প্রচুর দিয়েছেন। তুমি এদেব রুক্ষু মাথায় একটু তেল, পেট ভরে একদিন খেতে, আর একখানি করে কাপড় দাও। এদের সেবা করে তুষ্ট কর বাবা। তোমার কল্যাণ হবে।'

এতগুলি দরিদ্র মানুষকে সেবা করতে হলে অনেক টাকার দরকার। তীর্থযাত্রার জন্য যে টাকা সঙ্গে এনেছেন তা থেকে খরচ করলে তীর্থযাত্রা কেমন করে হবে? বিদেশ জায়গা! ইতস্তত করে মথুরানাথ বললেন,—বাবা, অনেক খরচ পড়বে এতে। এত টাকার ব্যবস্থা এখানে কি করে হবে?

—তোমার টাকায় কুলোবে না? আচ্ছা! রুষ্ট হয়ে বললেন ঠাকুর। পরমুহূর্তেই পল্লীর দরিদ্র মানুষগুলির মধ্যে গিয়ে বসে পড়ে বলে উঠলেন—দূর শালা! যা তবে তোর যেখানে খুশি! করগে তীথ ধম্ম। আমি যাবো না।

উপায়ান্তর না দেখে, অগত্যা প্রতিশ্রুতি দিলেন রসদদার মথুরানাথ। বাবার পায়ে ধরে ক্ষমা চাইলেন তারপর নিয়ে চললেন বাসস্থানের দিকে। প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের জন্য তখনই নির্দেশ চলে গেল কলকাতায়। তারপর একদিন দীনদুঃখীর রুক্ষ কেশ ও শুষ্ক দেহ তৈলসিক্ত হলো। পেট ভরে খাওয়া গেল। নূতন বস্ত্রলাভ

করলো। আবার কিছু দক্ষিণাও মিললো। দুঃখী মানুষের মুখে সরল হাসি দেখে দয়াল ঠাকুরের আর আনন্দ ধরে না। শিশুর মত আনন্দ করতে লাগলেন আর প্রাণখুলে আশীর্বাদ করলেন মথুরানাথকে।

এইভাবে বৈদ্যনাথধামের লীলা সমাপন করে এলেন বারাণসী-ধামে। দর্শন করলেন তৈলঙ্গ স্বামীকে। দুই মহাপুরুষের মিলন হলো পুণ্যতোয়া গঙ্গার তীরে। অনির্বচনীয় এক পরিবেশের হলো সৃষ্টি। অমেয় সৌভাগ্যবান্ ভক্তবৃন্দ সে দৃশ্য নয়নগোচর করে মুগ্ধ ও অভিভূত হলো।

আবার কাশীর লীলা সাঙ্গ করে এলেন শ্রীধাম বৃন্দাবনে। শ্রীকৃষ্ণ-লীলাভূমি দর্শনে। লীলায় ছাওয়া এই বৃন্দাবন। নিধুবন। নিকুঞ্জবন। রাধাকৃষ্ণের নিত্যলীলাস্থল। বৃন্দাবনের পথে শ্রীরামকৃষ্ণ ঘুরে বেড়াচ্ছেন। ব্রজের সবকিছুই আছে। শুধু নেই কৃষ্ণ। কৃষ্ণ চিন্তায় বিভোর হয়ে ডাকতে লাগলেন, কোথা কৃষ্ণ! কোথা কৃষ্ণ! দেখা দাও। দেখা দাও! ব্রজের প্রতিটি ধূলিকণায় মিশে আছে ভক্ত-প্রাণের মহিমা। একদিন শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু সর্বাঙ্গে মেখেছিলেন এই ধূলি। আর আজ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবও ব্রজের ধূলি মেখে উন্মত্তের মত কোথা কৃষ্ণ! কোথা কৃষ্ণ! বলে ছুটে গেলেন যমুনাপুলিনে। গিরিগোবর্ধন। মানসগঙ্গা। পাশাপাশি দুই কুণ্ড। শ্যামকুণ্ড। রাধাকুণ্ড। মাটি নিয়ে তিলক কাটলেন কপালে। চৈতন্য মহাপ্রভুও রাধাকৃষ্ণর লীলাস্থলী উদ্ধার করতে এসে এখানকার মাটি নিয়ে তিলক কেটেছিলেন কপালে। মথুরাতে এসে দেখলেন মথুরানাথকে। রাখালরাজা কৃষ্ণকে। এইভাবে রাধাকৃষ্ণের লীলাস্থলী মথুরা বৃন্দাবন পরিক্রমা করে, শ্রীরামকৃষ্ণ আবার ফিরে এলেন আপন সাধনভূমিতে। দক্ষিণেশ্বরে। ১২৭৫ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে।

রামকৃষ্ণ বললেন একদিন মথুরানাথকে,—শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ডের

রজঃ এনে ছড়িয়েছি পঞ্চবটীতে। পঞ্চবটী এখন বৃন্দাবন তুল্য। বৈষ্ণবদের তীর্থক্ষেত্র। তুমি মহোৎসবের আয়োজন কর। আর নিমন্ত্রণ কর মহা মহা বৈষ্ণব আচার্যদের। রামকৃষ্ণের একান্ত অনুগত ভক্ত সেজবাবু, মথুরানাথ মহা উৎসাহে আয়োজন করলেন মহোৎ-সবের। পঞ্চবটীতে বসে গেল তীর্থের মেলা। রামকৃষ্ণের সাধনভূমি অকস্মাৎ বৈষ্ণবতীর্থে হলো রূপান্তরিত। বৈষ্ণবাচার্যদের আগমনে অনির্বচনীয় এক পরিবেশের হলো সৃষ্টি। সবই যে শ্রীরামকৃষ্ণ পরম-হংসদেবের লীলাখেলা।

আবার একদিন বৈষ্ণবদের মহোৎসবেও আমন্ত্রণ এলো শ্রীরামকৃষ্ণদেবের। কলুটোলার মহোৎসবে। শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত মথুরানাথ সহ এলেন; অভাবনীয় অনির্বচনীয় এক পরিবেশ। কৃষ্ণ-নামে মুখরিত চতুর্দিক। চৈতন্য মহাপ্রভুর জন্য একটি বেদী করা হয়েছে। মালা চন্দনে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুকে সাজিয়েছেন। মধুর স্বরে কীর্তন করছেন সকলে। কৃষ্ণনাম শুনতে শুনতে কৃষ্ণ-ভাবে বিভোর হলেন রামকৃষ্ণদেব। কৃষ্ণ-চিন্তানিরতা শ্রীমতীর ভাব। কৃষ্ণপ্রেমপাগলিনী গোপিনীর ভাব। মহাভাবভাবিনী শ্রীরাধারাণীর ভাব। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর ভাবে হলেন বিভোর। অকস্মাৎ কিসের এক আকর্ষণে তিনি এসে দাঁড়ালেন সেই বেদীর ওপর। দুই হাত তুলে গৌরাঙ্গমহাপ্রভুর মত কৃষ্ণনাম করতে লাগলেন। নেত্র অর্ধনিমীলিত। শরীর অবশ। ধীরে ধীরে সমাধিস্থ হলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের সেই দিব্য জ্যোতির্ময় মূর্তি দর্শন করে অভিভূত হলেন সকলে। বৈষ্ণব আচার্যেরা তো বিচলিত হয়ে পড়লেন। তখন মথুরানাথ বললেন, বৈষ্ণবদের গৌর-কীর্তন করতে। কৃষ্ণনাম,—গৌরসুন্দরের নামগানেই স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসবে। সত্য সত্যই কীর্তনের সুমধুর ধ্বনিতে শ্রীরামকৃষ্ণ ধীরে ধীরে স্বাভাবিক অবস্থায় এলেন ফিরে। এই ঘটনার পর বৈষ্ণব-সমাজে আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল সত্য। কিন্তু পরে তাঁরা শ্রীরাম-

কৃষ্ণকে লোকাতীত মহাপুরুষ বলে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের সেদিনকার লীলা ও লোকাতীত অনির্বচনীয় মূর্তি নয়নগোচর করে অনেকেই দিব্যভাবে হয়েছিলেন আবিষ্ট।

শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবের খেলা বিচিত্র। কখন কি করেন, কেন করেন, তা বুঝবার চেষ্টা করাই যে বৃথা।

তখন ১২৭৮ সাল। দোলপূর্ণিমা সমাগত। দূর গ্রামের মানুষেরা চলেছে কলকাতায়। গঙ্গাস্নান করতে। জয়রামবাটীর মেয়েরাও যাবে গঙ্গাস্নান করতে, কলকাতায়। সারদাও তাদের সঙ্গে যাবার ইচ্ছা জানালো। স্নেহময় পিতা কন্যার মনোগত অভিলাষ বুঝতে পেরে নিজেই সঙ্গে যেতে স্বীকৃত হলেন। এক শুভদিনে যাত্রা হলো শুরু। পদব্রজে। দলবদ্ধ হয়ে। পথ প্রায় ত্রিশ ক্রোশ। দীর্ঘপথ, চলার অভ্যাস নেই। সারদামণির সুকুমার দেহ অল্পকাল মধ্যেই ক্লান্ত হয়ে পড়লো। জ্বরে আক্রান্ত হলেন। ধীরে ধীরে জ্ঞানও হারালেন। উপায়ান্তর না দেখে পীড়িত কন্যাকে নিয়ে পিতা রামচন্দ্র এক চটিতে নিলেন আশ্রয়। নিদ্রাভিভূতা সারদা দেখলেন, অপূর্ব লাবণ্যময়ী এক নারী এসে স্নেহশীতল অমৃতময় স্পর্শে তাঁর সকল ব্যথা জুড়িয়ে দিয়ে গেলেন। পরবর্তীকালে এই দিব্যদর্শন প্রসঙ্গে সারদা-মা বলেছেন, 'জ্বরে যখন একেবারে বেহুঁশ। লজ্জা-সরম রহিত হয়ে পড়ে আছি তখন দেখলাম পার্শ্বে একজন রমণী এসে বসলো। মেয়েটির রং কালো কিন্তু এমন সুন্দর রূপ কখনও দেখি নাই। বসে আমার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। এমন নরম ঠাণ্ডা হাত—গায়ের জ্বালা জুড়িয়ে যেতে লাগল।'

'জিগ্‌গেস করলাম,—তুমি কোথা থেকে আসছ গা? রমণীটি বললো, আমি দক্ষিণেশ্বর থেকে আসছি। শুনে অবাক হয়ে বললাম, দক্ষিণেশ্বর থেকে? আমি মনে করেছিলাম দক্ষিণেশ্বর যাবো। তাঁকে দেখবো, তাঁর সেবা করবো। কিন্তু পথে জ্বর হওয়ায় আমার ভাগ্যে ঐ সব আর হলো না। রমণী বললো, সে কি? তুমি

দক্ষিণেশ্বরে যাবে বই কি। ভাল হয়ে সেখানে যাবে, তাঁকে দেখবে, তোমার জন্যই তো তাঁকে সেখানে আটকে রেখেছি।

আমি বললাম,—তুমি আমাদের কে হও গা?

মেয়েটি বললে,—আমি তোমার বোন হই।

আমি বললাম, ও, তাই তুমি এসেছ।' একটা আবেশে এইভাবে কথা বলতে বলতে আবার গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লাম।

সকালে ঘুম ভেঙে গেলে, দেখলেন, তাঁর জ্বরের প্রকোপ দূর হয়েছে। গ্লানিও আর নেই। উৎফুল্ল মনে যাত্রা করলেন দক্ষিণেশ্বর অভিমুখে, স্বামী সন্নিধানে। অকস্মাৎ পথে একটি শিবিকা পাওয়া গেল। যাত্রা হলো দ্রুত হতে দ্রুততর।

এক শুভক্ষণে পিতা পুত্রী এসে পৌঁছলেন দক্ষিণেশ্বরে। তখন রাণী রাসমণি ও ভক্তপ্রবর মথুরানাথ সেজবাবুও দেহলীলা সংবরণ করেছেন। অকস্মাৎ সহধর্মিণীকে দেখে শ্রীরামকৃষ্ণ সাদরে আহ্বান করে বললেন,—এই যে! তুমি এসেছো? বেশ করছো। এসো। এসো।

তারপর শ্বশুর মহাশয়ের নিকট থেকে সবকিছু শুনে সারদামণির চিকিৎসা ও সেবা-শুশ্রূষায় সুব্যবস্থা করে ফেললেন। কন্যা সুস্থ হলে, পিতা রামচন্দ্র কন্যা জামাতার মিলন দেখে সন্তুষ্ট চিত্তে ফিরে গেলেন জয়রামবাটীতে। সারদামণিও স্বামীর যত্ন ভালবাসা পেয়ে বুঝলেন প্রাণের ঠাকুর ঠিকই আছেন। বাইরের খোঁজখবর না নিলেও অন্তরের আসনটি অটুটই আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ জিজ্ঞেস করছেন সারদামণিকে—তুমি কি আমাকে সংসারের পথে টেনে নিতে এসেছ?

প্রত্যুত্তরে মৃদু হেসে সারদা-মা বললেন—না, তা কেন? আমি তোমার সহধর্মিণী, তোমাকে ধর্মপথে সহায়তা করতেই কাছে এসেছি।

নিশ্চিন্ত হলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। নহবতে জননী চন্দ্রমণি দেবীর

কাছেই থাকেন সারদা। ঐখানে থেকেই সারদামণি মনের আনন্দে শাশুড়ী ঠাকুরাণী আর স্বামী সেবায় হলেন মগ্ন।

ধনী মাড়োয়ারী ভক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ দশ হাজার টাকা নিয়ে এসেছেন শ্রীরামকৃষ্ণের সম্মুখে, গ্রহণ করবার জন্য অনুরোধ করছেন। দান করছেন ঠাকুরের সেবার জন্য। তখন ঠাকুর রামকৃষ্ণ চীৎকার করে কেঁদে উঠলেন টাকা…কাঞ্চন…অবিদ্যা। মা তুই এ কি করলি? লক্ষ্মীনারায়ণও ব্যবসায়ী মানুষ। ছাড়বার পাত্র নন। নানাভাবে বুঝিয়ে চেষ্টা করতে লাগলেন। বললেন, সাধু-মহাত্মাদের অর্থ গ্রহণ করা ধর্মহানিকর নয়। কারণ তাদের সেবার জন্যও অর্থের প্রয়োজন আছে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। রামকৃষ্ণ তখন বৈরাগ্য, কঠোরতা ও নিষ্ঠার দ্বারা লাভ করেছেন পরিপূর্ণতা। ধর্মজীবনের চরম শিখরে আরোহণ করেছেন, সুতরাং সামান্য অর্থের লোভ তাঁর চিত্তচাঞ্চল্য ঘটাতে সমর্থ হলো না। অবশ্য সময়ান্তরে রামকৃষ্ণ পত্নীর মনোগত ইচ্ছা জানবার জন্য লক্ষ্মীনারায়ণের মনোবাসনার কথা নিবেদন করলেন। সারদামণি সব কিছু শুনে তীব্র কণ্ঠে প্রতিবাদ করে বলেছিলেন,—সে কি হয়? আমি নিলেও তোমারই নেওয়া হবে। সে টাকা তোমার সেবাতেই তো খরচ হবে। তুমি যে টাকা নেবে না, আমি তা কি করে নেবো? ও টাকা আমাদের চাই না।

পত্নীর কঠোর আদর্শ ও বৈরাগ্যের পরিচয় পেয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ প্রসন্ন হলেন। এই হলেন শ্রীরামকৃষ্ণ আর তাঁর সহধর্মিণী সারদামণি। যেমন ঠাকুর তেমনই ঠাকুরাণী।

শ্রীরামকৃষ্ণ এখন অধিকাংশ সময়ই দিব্যভাবে বিভোর হয়ে থাকেন। ঘন ঘন সমাধিস্থ হন। ভগবানের নাম, গুণগান, উচ্চ অনুভূতির সামান্য একটু ইঙ্গিত, সঙ্গীতের মাত্র একটি কলি, তাঁর মনকে সমাধির স্তরে নিয়ে যায়। আর এইটাই যেন স্বাভাবিক অবস্থা। সহজ অবস্থা। জোর করে যেন মনকে বাহ্য জগতে

নামিয়ে রাখতে হয়। তখন তাঁর আচার-আচরণও ঠিক সরল শিশুর মতো। ঠাকুরেরই ইচ্ছানুযায়ী সারদামণিও তাঁর শয্যায় শয়ন করেন। সারাদিন নহবতে থেকে কাজকর্ম করে রাত্রিতে আসেন ঠাকুরের ঘরে। এই সময়ই এক চন্দ্রালোকিত রজনীতে পার্শ্বে নিদ্রিতা ধর্মপত্নীর প্রতি চেয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর সাধনমার্জিত মনকে বলছেন—মন, এরই নাম স্ত্রী শরীর। গ্রহণ করলে দেহের আনন্দেই আবদ্ধ থাকতে হয়। সচ্চিদানন্দ লাভ করা যায় না। ভাবের ঘরে চুরি করো না। সত্য বল কোনটি চাও?

সচ্চিদানন্দ চিন্তামাত্রই ভাবসমাধি হলো রামকৃষ্ণের। দেহ স্থির নিস্পন্দ। অকস্মাৎ সারদামণির ঘুম ভেঙে গেলো। আর সেই ঘুমজড়িত চোখে স্বামীর ঐ নিশ্চল সমাধিস্থ অবস্থা দেখে ভীত হয়ে ডাকলেন ভাগিনেয় হৃদয়কে। হৃদয় ছুটে এসে ধীরে ধীরে নাম শোনাতে লাগলেন ঠাকুরকে। অবশেষে ঠাকুর প্রকৃতিস্থ হলেন।

এই প্রসঙ্গে স্বামী সারদানন্দ 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলা প্রসঙ্গে' বলেছেন, 'পূর্ণ যৌবন ঠাকুর ও নবযৌবন-সম্পন্না শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর এই কালের দিব্য লীলাবিলাস সম্বন্ধে যে সকল কথা আমরা ঠাকুরের নিকট শ্রবণ করিয়াছি, তাহা জগতের আধ্যাত্মিক ইতিহাসে অপর কোনও মহাপুরুষের সম্বন্ধে শ্রবণ করা যায় না। উহাতে মুগ্ধ হইয়া মানবহৃদয় স্বতই ইঁহাদিগের দেবত্বে বিশ্বাসবান্ হইয়া উঠে এবং অন্তরের ভক্তিশ্রদ্ধা ইঁহাদিগের শ্রীপাদপদ্মে অর্পণ করিতে বাধ্য হয়। দেহবোধ বিরহিত ঠাকুরের প্রায় সমস্ত রাত্রি এই কালে সমাধিতে অতিবাহিত হইত এবং সমাধি হইতে ব্যুত্থিত হইয়া বাহ্যভূমিতে অবরোহণ করিলেও তাঁহার মন এত উচ্চে অবস্থান করিত যে, সাধারণ মানুষের ন্যায় দেহবুদ্ধি উঁহাতে একক্ষণের জন্যও উদিত হইত না।'

ইন্দ্রিয় সংযম প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, আপনাতে মেয়ের ভাব আরোপ করতে হয়। তা না হ'লে পরিবারকে আটমাস কাছে এনে

রেখেছিলাম কেমন করে? দু'জনেই মার সখী। যত স্ত্রীলোক শক্তিস্বরূপা। সেই আদ্যাশক্তিই স্ত্রী হয়ে স্ত্রীরূপ ধরে রয়েছেন। সেই আদ্যাশক্তির পূজা করতে হয়। তাঁকে প্রসন্ন করতে হয়। তিনিই মেয়েদের রূপ ধারণ করে রয়েছেন। তাই তো আমার মাতৃভাব।

পতির পদসেবা করতে করতে পত্নী জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা, আমি তোমার কে?' ঠাকুর মৃদু হেসে সরল শিশুর মতো বললেন, 'যে মা মন্দিরে, যে মা এই শরীরের জন্ম দিয়েছেন। আজকাল বাস করছেন নহবতে, তুমি আমার সেই মা আনন্দময়ী।'

নারীতে মাতৃভাব এবং পত্নীতে ব্রহ্মময়ীভাব উপলব্ধি করেও শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরে আর এক সংকল্পের হলো উদয়। স্থির করলেন কালীপূজার রাত্রিতে প্রত্যক্ষ জগজ্জননী জ্ঞানে ষোড়শী পূজা করবেন পত্নীকে, সারদামণিকে।

অবশেষে সেই অভিনব পূজার রাত্রিটা এসে উপস্থিত হলো অমাবস্যার তমোময়ী রজনী। অদূরে প্রবাহিতা পুণ্যতোয়া গঙ্গা। অভিনব এক প্রাকৃতিক পরিবেশ। গভীর তমিস্রায় কৃষ্ণবরণী ভয়ঙ্করী এক মূর্তি অথচ অপরূপা। সাধক ভালবাসেন অমারাত্রির এই গভীর অন্ধকারকে। ধীরে ধীরে ঘনিয়ে আসে রাত্রির দ্বিতীয় প্রহর। পূজার উপকরণ সবকিছুই প্রস্তুত। সাধক রামকৃষ্ণ ডেকে পাঠালেন পত্নী সারদামণিকে নিজের ঘরে। পূজা প্রকোষ্ঠে। ঘরে প্রবেশ করে সারদামণি দেখেন—শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবোন্মাদনার বিহ্বলতার অনির্বচনীয় এক মূর্তি। সেই অলোকসামান্য ভাবঘনমূর্তি তাঁকে করে ফেললো মোহমুগ্ধ। শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশে মন্ত্রমুগ্ধার মত তিনি দেবীর আসনে করলেন উপবেশন। তিনি কি করছেন, কেন করছেন, কিছুই বুঝতে পারছেন না। নির্বাক। ভাবাবিষ্টা। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে মন্ত্রপূত বারিদ্বারা অভিষিক্ত করে তাঁর অন্তর্নিহিত দিব্যশক্তি উদ্বুদ্ধ করবার জন্য প্রার্থনা করতে লাগলেন।

সারদাদেবী বাহ্যজ্ঞানশূন্যা। শ্রীরামকৃষ্ণ সাক্ষাৎ দেবী জ্ঞানে ষোড়শোপচারে পূজা করলেন সারদামণিকে। পত্নী সারদামণিকে নয়। সারদা-মাকে। মাতৃমূর্তিকে। মহাভাবময়ী মহামায়াকে। ভবভয়-নাশিনী রুদ্রাণীকে। ইচ্ছাময়ী মহাশক্তিরূপা চিদানন্দময়ী জননীকে। যিনি পূর্ণা। পরংপরা। সনাতনী। যিনি রহস্যরূপা। রসময়ী। প্রেমঘন বিগ্রহা। সেই মহামায়া জননীকে।

জগজ্জননীরূপে সারদা-মা পতির পূজা করলেন। সারদা-মা তখন সমাধিস্থা। শ্রীরামকৃষ্ণও অর্ধবাহ্যদশার মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে সমাধিমগ্ন। উভয়ে আত্মস্বরূপে একীভূত।

প্রকৃত নরনারীর দাম্পত্য জীবনের বহু উর্ধ্বে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে সারদা-মা'র সম্বন্ধ। অনুপম তাঁদের চরিত্র। অলৌকিক তাঁদের জীবনের ঘটনাবলী। সংসারে থাকতেও কঠোর সাধনায় মগ্ন তাঁরা। শ্রীরামকৃষ্ণ ও মা সারদা। শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনা যে সংসারে থেকেই। সন্ন্যাসীর চেয়ে গৃহীকে বৃহত্তর সম্মান দিয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। বলছেন, 'তুমি সংসারে থেকে ঈশ্বরের প্রতি মন রেখেছ, একি কম কথা গো। যে সংসারত্যাগী সে তো ঈশ্বরকে ডাকবেই। তাতে আর বাহাদুরি কি। সংসারে থেকে যে ডাকে সেই ধন্য। সে বিশ মন পাথর সরিয়ে তবে দেখে।'

সংসারে থেকে সাধন করা বড় কঠিন গো। অনেক ব্যাঘাত। রোগ শোক দারিদ্র্য, আবার স্ত্রীর সঙ্গে সর্বদাই অমিল, ছেলে মূর্খ গোঁয়ার অবাধ্য। না মা গোল। ওদিকে যাবি ঝাঁটা ফেলে মারবে। এদিকে যাবি জুতো ফেলে মারবে।

এই অবস্থায় যোগস্থ হওয়া চারটিখানি কথা? আবার বলছেন, এই সংসারী লোকের ব্রত কি। ব্রত সহিষ্ণুতা। স, স, স, সহ্য কর। সহ্য কর। সহ্য কর। তিন সত্য বলার মত করে।

যার সহ্য করবার শক্তি নেই, কোন সাধনাই তার সফল হবার নয়। যে সয় সে রয়। যে না সয়, সে নাশ হয়।

আপনাকে আপনার ভেতর দেখতে পাবার জন্যই সাধনা। আপনাকে আপনার ভেতর দেখতে পেলে তো সব হয়ে গেল। ঐ সাধনার জন্যই শরীর। মাটির ছাঁচ ততক্ষণ দরকার, যতক্ষণ না সোনার প্রতিমা ঢালাই করে নেওয়া হয়। ঢালাই কাজ হয়ে গেলে কারিকর মাটির ছাঁচ রাখতেও পারে, ভেঙে ফেলতেও পারে।

'সংসারেই থাকবো, কিন্তু থাকবো সং ফেলে সারকে নিয়ে।' কিন্তু সংসারই দেবে না তোমাকে স্থির থাকতে। ভগবানের শরণাপন্ন কি সহজে হওয়া যায় গা। মহামায়ার এমন কাণ্ড—হ'তে কি দেয়? যার তিন কুলে কেউ নেই তাকে দিয়ে একটা বেড়াল পুষিয়ে সংসার করাবে! সেও বেড়ালের মাছ দুধ ঘুরে ঘুরে যোগাড় করবে আর বলবে,—'মাছ দুধ না হলে বেড়ালটা খায় না, কি করি।'

আবার বলছেন, 'তীব্র বৈরাগ্য হলে সংসার পাতকুয়ো, আত্মীয় কালসাপের মত বোধ হয়। তখন টাকা জমাবো, বিষয় ঠিকঠাক করবো এসব হিসেব আসে না। ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু এই চিন্তাই পেয়ে বসে।'

কেশব সেনকে বললেন,—'কাঠের আপেল যেমন আমাদের আপেলের কথা মনে করিয়ে দেয়, মূর্তিও তেমনি নিরাকার ভগবানের চিন্তা করতে মানুষকে সাহায্য করে। যেমন প্রচণ্ড শীতে জল জমে বরফ হয় তেমনি ভক্তির গভীরতায় নিরাকার ভগবান সাকার মূর্তি ধারণ করেন।······নিরাকার, নিরাকার। নির্বিকল্প সমাধিতেই নিরাকার ব্রহ্মের উপলব্ধি হয়।'

শ্রীরামকৃষ্ণের পূতসঙ্গ কেশব সেনের মনে গভীর রেখাপাত করলো। এই দিব্য সঙ্গের ফলে তাঁর জীবনধারাও পরিবর্তিত হলো। ধীরে ধীরে কেশব সেন ভগবানের সাকার রূপে বিশ্বাসী হলেন এবং মূর্তিপূজাও মানলেন। কেশব সেনের ধর্মমতও অনেকাংশে পরিবর্তিত ও উদার হলো ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে 'নব-বিধান' আত্মপ্রকাশ করলো। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীও রামকৃষ্ণের প্রভাবে প্রভাবিত

হলেন। বিজয়কৃষ্ণের উচ্চ অধ্যাত্ম অবস্থা সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন,—'বিজয় এখন সমাধি গৃহের দ্বারে করাঘাত করছে।' বিজয়কৃষ্ণও একদিন ভাবে বিভোর হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের পদযুগল বক্ষে ধারণ করে বললেন, 'শ্রীরামকৃষ্ণ ভগবানের অবতার।' অভাবনীয় অনির্বচনীয় সে দৃশ্য। বিজয়কৃষ্ণের অধ্যাত্ম চিন্তাজগতে হলো আমূল পরিবর্তন। সনাতন ধর্মের প্রকৃত স্বরূপ দেখতে পেলেন। সাকার ঈশ্বরে হলেন বিশ্বাসী। অধ্যাত্ম আলোক লাভ করলেন। সে সময়ে ব্রাহ্মসমাজ শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষা সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করেনি সত্য, কিন্তু এই ব্রাহ্ম-সমাজই সর্বপ্রথম শ্রীরামকৃষ্ণের অধ্যাত্ম আদর্শ আংশিকভাবে অনুসরণ করে বাংলার ধর্মপিপাসু ব্যক্তিদের করেন তাঁর প্রতি আকর্ষণ। আর এই ব্রাহ্মসমাজই ছিল ঠাকুরের সঙ্গে তরুণ ভক্তগণের মিলনক্ষেত্র।

শ্রীরামকৃষ্ণের প্রচারিত ও সাধিত ঈশ্বরে মাতৃভাব কেশব সেনের মত শিবনাথ শাস্ত্রীর মনেও জাগিয়েছিল সাড়া। শিবনাথ শাস্ত্রী পরবর্তীকালে বলেছিলেন,—'শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে আমার সংযোগ অল্প দিবসের জন্য হইলেও আমার অধ্যাত্ম চিন্তারাশিকে দৃঢ় করিতে ফলদায়ক হইয়াছিল। তাঁহার সুভীর স্নেহের ঋণে আমি আজিও আবদ্ধ রহিয়াছি। এ জীবনে আমি যাঁহাদের সৎসঙ্গ লাভে ধন্য হইয়াছি শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাদিগের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক উল্লেখযোগ্য।

শ্রীরামকৃষ্ণ প্রথম দর্শনে শিবনাথ শাস্ত্রীকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলেছিলেন,—'আঃ আমার বুক জুড়িয়ে গেল।' তারপর বললেন, সব রকমের বিঘ্ন বিপদের মধ্যেও যে বিশ্বাস অটল না থাকতে পারে, সে বিশ্বাসই নয়। আসল কথা বিশ্বাস চাই। কর্ম করতে গেলে আগে একটি বিশ্বাস চাই। সে আনন্দের অনুভবেই তার কর্মের প্রবৃত্তি।

—'যে বুড়ি ছুঁয়েছে তাকে আর চোর করবার জো নেই। ইঁট বা টালি যদি ছাপশুদ্ধ পোড়ানো হয় তো ছাপ আর কিছুতেই ওঠে না।'

বিদ্যাসাগরকে বললেন রামকৃষ্ণ,

'ব্রহ্ম অনুচ্ছিষ্ট।'

ব্রহ্ম যে কি মুখে বলা যায় না। সব জিনিস উচ্ছিষ্ট হয়ে গেছে। বেদ, পুরাণ, তন্ত্র, ষড়দর্শন সব এঁটো হয়ে গেছে। মুখে পড়া হয়েছে, মুখে উচ্চারণ হয়েছে, তাই এঁটো হয়েছে। কিন্তু একটি জিনিস কেবল উচ্ছিষ্ট হয়নি যে জিনিসটি ব্রহ্ম। ব্রহ্ম যে কি তা আজ পর্যন্ত কেউ মুখে বলতে পারেনি।

বিদ্যাসাগর তো মহাখুশি। শ্রীরামকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত ব্রহ্ম-তত্ত্বের সরল সরস ব্যাখ্যা শুনে মুগ্ধ ও বিস্মিত হলেন। প্রত্যুত্তরে বললেন,

—বা! এটি তো বেশ কথা! আজ একটি নূতন কথা শিখলাম। এই প্রসঙ্গে রামকৃষ্ণ বিদ্যাসাগরকে একটি গল্প বললেন,—এক বাপের দুই ছেলে, ব্রহ্ম বিদ্যা শিখবার জন্য ছেলে দুটিকে বাপ আচার্যের হাতে দিলেন। কয়েক বছর পর শিক্ষা সমাপ্ত করে তারা গুরুগৃহ থেকে ফিরে এলো। বাপের ইচ্ছা—দেখেন এদের ব্রহ্মজ্ঞান কেমন হয়েছে। বাপ জিজ্ঞেস করলো বড় ছেলেকে। তুমি ত সব পড়েছ, বল দেখি ব্রহ্ম কিরূপ? বড় ছেলেটি বেদ থেকে নানা শ্লোক বলে বলে ব্রহ্মের স্বরূপ বোঝাতে লাগলো। বাপু চুপ করে রইলেন। যখন ছোট ছেলেকে জিজ্ঞেস করলেন, সে হেঁট মুখে চুপ করে রইলো। মুখে কোন কথা নাই, বাপ তখন প্রসন্ন হয়ে ছোট ছেলেকে বললেন, 'বাপু! তুমিই একটু বুঝেছ। ব্রহ্ম যে কি তা মুখে বলা যায় না। ব্রহ্ম যে অনুচ্ছিষ্ট।

রামকৃষ্ণ আবার বলছেন,

তবে বেদে পুরাণে যা বলেছে সে কি রকম বলা জান? একজন সাগর দেখে এলে কেউ যদি জিজ্ঞেস করে কেমন দেখলে, সে লোক মুখ হাঁ করে বলে,—'ও! কি দেখলুম। কি হিল্লোল কল্লোল!' ব্রহ্মের কথাও সেই রকম। বেদে আছে, তিনি আনন্দস্বরূপ—সচ্চিদানন্দ। শুকদেবাদি এই ব্রহ্মসাগর তটে দাঁড়িয়ে দর্শন স্পর্শন

করেছিলেন। এক মতে আছে তাঁরা এ সাগরে নামেন নাই। এ সাগরে নামলে আর ফিরবার যো নাই।

সমাধিস্থ হলে ব্রহ্মজ্ঞান হয়, ব্রহ্ম দর্শন হয়। সে অবস্থায় বিচার একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। মানুষ চুপ হয়ে যায়। ব্রহ্ম কি বস্তু মুখে বলবার শক্তি থাকে না। এই প্রসঙ্গে আবার সুন্দর একটি উপমা দিলেন, 'নুনের পুতুল সমুদ্র মাপতে গিছলো। কত গভীর জল তাই খবর দেবে। খবর দেওয়া আর হল না। যেই নামা অমনি গলে যাওয়া। কে আর খবর দিবেক ?

ব্রহ্ম দর্শন হলে মানুষ চুপ হয়ে যায়। যতক্ষণ দর্শন না হয় ততক্ষণই বিচার। ঘি কাঁচা যতক্ষণ থাকে ততক্ষণই কলকলানি। পাকা ঘি'র কোন শব্দ থাকে না। কিন্তু যখন পাকা ঘিয়ে আবার কাঁচা লুচি পড়ে, তখন আর একবার ছ্যাঁক্ কল্‌কল্ করে। যখন কাঁচা লুচিকে পাকা করে তখন আবার চুপ হয়ে যায়। তেমনি সমাধিস্থ পুরুষ লোকশিক্ষা দেবার জন্য আবার নেমে আসে, আবার কথা কয়। শঙ্করাচার্য লোকশিক্ষার জন্য বিদ্যার 'আমি' রেখেছিলেন।

যতক্ষণ মৌমাছি ফুলে না বসে ততক্ষণ ভন্‌ভন্ করে। ফুলে বসে মধু পান করতে আরম্ভ করলে চুপ হয়ে যায়। মধুপান করবার পর মাতাল হয়ে আবার কখনও কখনও গুন্‌গুন্ করে।

জ্ঞানলাভের পরও আবার কোথা থেকে 'আমি' এসে পড়ে। স্বপনে বাঘ দেখেছিলে, তারপর জাগলে, তবুও তোমার বুক দুরদুর করছে। জীবের আমি ল'য়েই ত যত যন্ত্রণা। গরু হাম্বা (আমি) হাম্বা (আমি) করে, তাই ত এত যন্ত্রণা। লাঙলে জোড়ে, রোদ বৃষ্টি গায়ের উপর দিয়ে যায় আবার কসাইয়ে কাটে। চামড়ায় জুতো হয়, ঢোল হয়, তখন খুব পেটে। তবুও নিস্তার নাই, শেষে নাড়ীভুঁড়ী থেকে তাঁত তৈয়ার হয়, সেই তাঁতে ধুনুরীর যন্ত্র হয়। তখন আর 'আমি' বলে না, তখন বলে, 'তুঁহু, তুঁহু' ('তুমি' 'তুমি')।

যখন তুমি তুমি বলে তখন নিস্তার। হে ঈশ্বর আমি দাস তুমি প্রভু। আমি ছেলে তুমি মা। সেব্য সেবক ভাবই ভাল। 'আমি' ত যাবার নয়। তবে থাক শালা 'দাস আমি' হয়ে। শুধু পাণ্ডিত্যে কিছু নাই। শুধু পুঁথিগত বিদ্যাও অসার। ভক্তিই সার।

কলিতে অন্নগত প্রাণ, দেহবুদ্ধি যায় না। এ অবস্থায় 'সোঽহং' বলা ভাল নয়। সবই করা যাচ্ছে, আবার 'আমিই ব্রহ্ম' বলা ঠিক নয়। যারা বিষয় ত্যাগ করতে পারে না, যাদের 'আমি' কোনমতে যাচ্ছে না, তাদের 'আমি দাস' 'আমি ভক্ত' এ অভিমান ভাল। ভক্তি পথে থাকলেও তাঁকে পাওয়া যায়।

জ্ঞানীর পথও পথ। জ্ঞান-ভক্তির পথও পথ। আবার ভক্তির পথও পথ। জ্ঞানযোগও সত্য, ভক্তিপথও সত্য। সব পথ দিয়ে তাঁর কাছে যাওয়া যায়। তিনি যতক্ষণ আমি রেখে দেন—ততক্ষণ ভক্তিপথই সোজা।

ভাব ভক্তি এর মানে তাঁকে ভালবাসা। যিনিই ব্রহ্ম তাঁকেই 'মা' বলে ডাকা হচ্ছে। 'মা' বড় ভালবাসার জিনিস কিনা। ঈশ্বরকে ভালবাসতে পারলেই তাঁকে পাওয়া যায়। ভাব ভক্তি ভালবাসা আর বিশ্বাস। যিনিই নির্গুণ, তিনিই সগুণ। যিনিই ব্রহ্ম তিনিই শক্তি। যখন নিষ্ক্রিয় বলে বোধ হয়, তখন তাঁকে 'ব্রহ্ম' বলি। যখন ভাবি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করছেন তখন তাঁকে আদ্যা শক্তি বলি, কালী বলি।

নিষ্কাম কর্ম করতে পারলে ঈশ্বরে ভালবাসা হয়। ক্রমে তাঁর কৃপায় তাঁকে পাওয়া যায়। ঈশ্বরকে দেখা যায়, তার সঙ্গে কথা কওয়া যায়।

আবার বলছেন ব্রহ্মের স্বরূপ সম্বন্ধে—ব্রহ্ম নির্লিপ্ত। যেমন প্রদীপ। প্রদীপের সম্মুখে কেউ ভাগবত পড়ছে আর কেউ জাল করছে। প্রদীপ নির্লিপ্ত।

যেমন সূর্য। সূর্য শিষ্টের উপর আলো দিচ্ছে, আবার দুষ্টের উপরও দিচ্ছে।

যদি বল দুঃখ, পাপ, অশান্তি এ সকল তবে কি! ও সব জীবের পক্ষে। ব্রহ্ম নির্লিপ্ত। সাপের ভিতর বিষ আছে। অন্যকে কামড়ালে মরে যায়। কিন্তু সাপের কিছু হয় না।

ব্রহ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে এমন সরল মধুর ব্যাখ্যা ইতিপূর্বে আর কোনও ব্রহ্মবিদ্ পণ্ডিত দার্শনিক ও তত্ত্বজ্ঞানী মহাপুরুষও করতে সক্ষম হন নি।

ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার যিনি বিজ্ঞানের বাইরে কোন বিষয় আছে বলে মানতে রাজী নন, তিনিও রামকৃষ্ণের সংস্পর্শে রামকৃষ্ণের দ্বারা প্রভাবিত হলেন। হরিনাম গান শুনে ভাবে হলেন বিভোর। তাইতো সরস করে রামকৃষ্ণ বলছেন,

'ছেলে বলেছিল বাবা একটু মদ চেখে দেখ, তারপর আমায় ছাড়তে বলো তো ছাড়া যাবে। বাবা খেয়ে বললেন,—তুমি বাছা ছাড়ো আপত্তি নেই, কিন্তু আমি ছাড়ছি না।'

বিচার নয়, বিশ্বাস। তর্ক নয়, প্রেম। প্রেমেই সকল চাওয়ার সকল পাওয়ার শান্তি। বিচার বন্ধ হলেই দর্শন। তখনই মানুষ অবাক, সমাধিস্থ। থিয়েটারে গিয়ে বসে লোকে কত গল্প করে—এ গল্প সে গল্প। যেই পর্দা উঠে যায় সব গল্প-টল্প বন্ধ হয়ে যায়। যা দেখে তাইতেই তখন মগ্ন হয়ে থাকে। বিচার যেখানে থেমে যায় সেখানেই ব্রহ্ম।'

নাট্যকার গিরিশ ঘোষকে বললেন রামকৃষ্ণ,—তুমি মার নামে বিশ্বাস কোরো, হয়ে যাবে। নিজেকে পাপী ভেবো না। যে পাপ পাপ সর্বদা করে সে শালাই পাপী হয়ে যায়।

হাজার বছরের অন্ধকার ঘরে যদি আলো আসে, সে কি একটু একটু করে আলো হয়? না, একেবারে দপ্ করে আলো হয়?

কলিতে নারদীয় ভক্তি। সর্বদা তাঁর নাম গুণ কীর্তন করা।

ভক্তির অসিতে অহঙ্কার হয় না। অজ্ঞান করে না, বরং ঈশ্বরের লাভ করিয়ে দেয়। এ 'আমি'—আমির মধ্যে নয়। যেমন হিংচে শাক, শাকের মধ্যে নয়। অন্যে শাকে অসুখ হয়, কিন্তু হিংচে শাক খেলে পিত্ত নাশ হয়, উল্‌টে উপকার হয়। মিছরি মিষ্টের মধ্যে নয়, অন্য মিষ্ট খেলে অপকার হয়, মিছরি খেলে অম্বল নাশ হয়।

জমি পাট করা হলে যা রুইবে, তাই জন্মাবে। তবে কর্ম নিষ্কামভাবে করতে হয়।

তুমি তো বেশ সব লিখেছো! তোমার ধারণা আছে। ভিতরে ভক্তি না থাকলে কি চালচিত্র আঁকা যায়?

গিরিশ ঘোষ বলছেন,—মাঝে মাঝে মনে হয় থিয়েটারগুলো আর করা কেন।

প্রত্যুত্তরে রামকৃষ্ণ বলছেন,—না না, ও থাক, ওতে লোকশিক্ষা হবে। যেমন শুকদেবাদি, ঈশ্বরকে লাভ করে আবার লোকশিক্ষা দেন। কেউ আম খেয়ে মুখটি পুঁছে ফেলে। কে পাঁচজনকে দেয়। কেউ পাতকুয়া খুঁড়বার সময়—ঝুড়ি কোদাল আনে, খোঁড়া হয়ে গেলে ঝুড়ি কোদাল ঐ পাতকোতেই ফেলে দেয়। কেউ ঝুড়ি কোদাল রেখে দেয় যদি পাড়ার লোকের কারুর দরকার লাগে। শুকদেবাদি পরের জন্য ঝুড়ি কোদাল তুলে রেখেছিলেন। তুমি পরের জন্য রাখবে।

রামকৃষ্ণ বললেন নরেন্দ্রকে,—'জীবে দয়া নয়, জীবে সেবা। জীবে শ্রদ্ধা। জীবে প্রেম।' এই দীপ্তমন্ত্রেই দীক্ষিত করলেন যুবক নরেন্দ্রকে এবং জীব সেবাকেই মূলমন্ত্র জ্ঞান করে নরেন্দ্র একদিন হয়ে উঠলেন স্বামী বিবেকানন্দ।

রামকৃষ্ণ আবার বলছেন, 'কামনা থাকতে, যত সাধনা কর না কেন সিদ্ধিলাভ হয় না। তবে একটি কথা আছে, ঈশ্বরের কৃপা হলে, ঈশ্বরের দয়া হলে, সিদ্ধি করতে পারে। যেমন হাজার বছরের অন্ধকার ঘর, হঠাৎ কেউ যদি প্রদীপ আনে, তাহলে একমুহূর্তে

আলো হয়ে যায়। আন্তরিকভাবে ঈশ্বরকে যে জানতে চাইবে তারই হবে। যে ব্যাকুল, ঈশ্বর বই আর কিছু চায় না, তারই হবে।

কিন্তু আমার কি ভাব জানো? চোখ চাইলেই কি তিনি আর নাই? তিনি নিত্য, তিনি লীলাময়। তাঁকে লাভ করলে জানতে পারা যায়, তিনিই স্বরাট্ তিনিই বিরাট্। তিনিই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ তিনিই আবার জীব জগৎ হয়েছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের উদার বোধ। ধর্মের জগতে তিনি সর্ব ধর্ম সমন্বয়ের প্রবর্তক। তাইতো তিনি বললেন, 'যত মত তত পথ।' 'যেমন ভাব তেমন লাভ।'

আবার বলছেন, 'আমায় সব ধর্ম একবার করে নিতে হয়েছিল, হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান—আবার শক্তি বৈষ্ণব বেদান্ত—এ সব পথ দিয়েও আসতে হয়েছে। দেখলাম সেই এক ঈশ্বর। তাঁর কাছেই সকলে আসছে, ভিন্ন ভিন্ন পথ দিয়ে।

ঈশ্বর এক বৈ দুই নাই। তাঁকে ভিন্ন ভিন্ন লোকে ডাকে। কেউ বলে 'গড্', কেউ বলে 'আল্লা',—কেউ বলে কৃষ্ণ, কেউ বলে শিব, কেউ বলে ব্রহ্ম।

মত—পথ। সকল ধর্মই সত্য। যেমন কালীঘাটে নানা পথ দিয়ে যাওয়া যায়। ধর্ম ঈশ্বর নয়। ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম আশ্রয় করে ঈশ্বরের কাছে যাওয়া যায়। নদী সব নানা দিক দিয়ে আসে, কিন্তু সব নদী সমুদ্রে গিয়ে পড়ে। সেখানে সব এক।

তবে অহং থাকলে হবে না। চাই একাগ্রতা। পাণ্ডিত্যের অভিমানে নয়, অন্তরের ব্যাকুলতায়। শুধু পাণ্ডিত্যে কি হবে? পণ্ডিতেরা অনেক জানে শোনে—বেদ পুরাণ তন্ত্র। চাই বিবেক বৈরাগ্য। যারা সংসারকে সার করেছে তাদের হবে না।

গীতা পড়লে কি হয়? দশবার গীতা গীতা বললে যা হয়। গীতা গীতা বলতে বলতে ত্যাগী হয়ে যায়। সংসারে কামিনী কাঞ্চনে আসক্তি যার ত্যাগ হয়ে গেছে, যে ঈশ্বরেতে ষোল আনা ভক্তি দিতে

পেয়েছে, সেই গীতার মর্ম বুঝেছে। গীতা সব বইটা পড়বার দরকার নেই। ত্যাগী ত্যাগী বলতে পারলেই হলো।

আমি সংসার ত্যাগ করে চললুম। একজন তার স্ত্রীকে বলেছিল। বললেন রামকৃষ্ণ। স্ত্রীটি তার জ্ঞানী। বললে, কেন তুমি ঘুরে ঘুরে বেড়াবে? যদি পেটের ভাতের জন্য দশঘরে যেতে না হয়, তবে যাও। ঘর তো ছাড়বে কিন্তু দেহ-গেহ কি ছাড়তে পারবে?

আবার গেরুয়া কেন? গেরুয়াধারী সন্ন্যাসীকে বললেন রামকৃষ্ণ। 'একটা কি পরলেই হলো? একজন বলেছিল চণ্ডী ছেড়ে হলুম ঢাকী। আগে চণ্ডীর গান গাইতো, এখন ঢাক বজায়।'

বিকার কাটবে শুধু ভক্তিতে। তাঁতে যখন মনের যোগ হয় তখন ঈশ্বরকে হৃদয়ের মধ্যে দেখা যায়। যত এই যোগ হবে তত বাইরের জিনিস থেকে মন সরে আসবে। এইপ্রসঙ্গে একটি গল্প বলেছেন রামকৃষ্ণ। ভক্ত বিল্বমঙ্গল রোজ বেশ্যালয়ে যেতো। একদিন অনেকরাত্রে যাচ্ছে। বাড়িতে বাপ মায়ের শ্রাদ্ধ হয়েছিল তাই দেরি হয়ে গেছে। ভাল ভাল মিষ্টান্ন বেশ্যাকে খাওয়াবে বলে সঙ্গে নিয়ে চলেছে, ব্যাকুল চিত্তে দিশাহারার মত ছুটছে। বেশ্যার উপর মন এত একাগ্র কিসের উপর দিয়ে যাচ্ছে কিছুই হুঁশ নেই। পথে এক যোগী চোখ বুজে ঈশ্বর চিন্তা করছিল, তার গায়ে পা দিয়ে চলে যাচ্ছে। যোগী রাগ করে বলে উঠলো—কি তুই দেখতে পাচ্ছিস না। আমি ঈশ্বর চিন্তায় মগ্ন আর আর তুই গায়ের উপর পা দিয়ে চলে যাচ্ছিস? প্রত্যুত্তরে বিল্বমঙ্গল বললো আমায় মাপ করবেন। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞেস করি, বেশ্যাকে চিন্তা করে আমার হুঁশ নেই। আর আপনি ঈশ্বর চিন্তা করছেন আপনার তো দেখছি বাইরের সব হুঁশই রয়েছে। এ কি রকম ঈশ্বর চিন্তা। বিল্বমঙ্গল বেশ্যাকে বলেছিল,—তুমি আমার গুরু, তুমি শিখিয়েছ কি ভাবে ঈশ্বরে অনুরাগ করতে হয়। অবশেষে বেশ্যাকে 'মা'—বলে, সবকিছু ত্যাগ করেছিল। যাকে দেখেছিল ভোগবতীরূপে তাকে আবার দেখলো ভগবতীরূপে।

হাঁড়িতে ভাত ফুটছে। আলু বেগুন লাফাচ্ছে। ছোট ছেলে বলে, আলু বেগুনগুলো আপনি নাচছে। জানে না যে নীচে আগুন আছে। মানুষ বলে ইন্দ্রিয়েরা আপনা আপনি কাজ করছে। ভিতরে যে সেই চৈতন্যস্বরূপ আছে তা ভাবে না।

'তাঁর দর্শন হলে সব সংশয় যায়।' যার যেমন মন ঈশ্বরকে সেইরূপ দেখে।

লক্ষ্মণ বলেছিলেন—রাম, যিনি স্বয়ং বশিষ্ঠদেব, তাঁর আবার পুত্রশোক! রাম বললেন, ভাই যার জ্ঞান আছে তার অজ্ঞানও আছে। যার আলো বোধ আছে, তাঁর অন্ধকার বোধও আছে। তাই জ্ঞান অজ্ঞানের পার হও। ঈশ্বরকে বিশেষরূপে জানলে সেই অবস্থা হয়। এরই নাম বিজ্ঞান।

পায়ে কাঁটা ফুটলে আর একটি কাঁটা যোগাড় করে আনতে হয়। এনে সেই কাঁটাটি তুলতে হয়। তোলার পর দুটি কাঁটাই ফেলে দেয়। জ্ঞান কাঁটা দিয়ে অজ্ঞান কাঁটা তুলে, জ্ঞান অজ্ঞান দুই কাঁটাই ফেলে দিতে হয়।

পূর্ণজ্ঞানের লক্ষণ আছে। বিচার বন্ধ হয়ে যায়। কাঁচা থাকলেই ঘিয়ের কলকলানি।

সহাস্যে রামকৃষ্ণ আবার বলছেন, জল স্থির থাকলেও জল, হেললে দুললেও জল, তরঙ্গ হলেও জল।

আর একটি কথা। মাহুত নারায়ণের কথাই বা শোনো না কেন? গুরু শিষ্যকে বলে দিলেন, সব নারায়ণ। পাগলা হাতী আসছিল। শিষ্য গুরুবাক্য বিশ্বাস করে সেখান থেকে সরলো না। হাতী যে নারায়ণ। মাহুত কিন্তু চেঁচিয়ে বলছিলো সব সরে যাও, সব সরে যাও। শিষ্যটি সরেনি, হাতী তাকে আছাড় দিয়ে চলে গেল। প্রাণ যায়নি। চোখে-মুখে জল দিতে জ্ঞান হলো। যখন জিজ্ঞেস করা হলো, কেন তুমি সরে যাওনি। সে বললে, কেন গুরুদেব যে বলেছেন, সব নারায়ণ। তখন গুরু বললেন, বাবা, মাহুত নারায়ণের

কথা তবে কেন শুনলে না ? তিনিই শুদ্ধ-মন শুদ্ধ-বুদ্ধি হয়ে ভিতরে আছেন। আমি যন্ত্র তিনি যন্ত্রী। আমি ঘর তিনি ঘরনী। তিনিই মাহুত নারায়ণ।

আবার রামকৃষ্ণ বলছেন,—যতক্ষণ আমি ঘট রয়েছে, ততক্ষণ এইরূপ হচ্ছে। মনে কর মহাসমুদ্র—অধঃ ঊর্ধ্ব পরিপূর্ণ, তার ভিতর একটি ঘট রয়েছে। ঘটের অন্তরে বাইরে জল। কিন্তু না ভাঙলে ঠিক একাকার হচ্ছে না। তিনিই এই আমি ঘট রেখে দিয়েছেন। তাঁর খেলা তাঁর লীলা! এক রাজার চার বেটা। রাজার ছেলে—কিন্তু খেলা করছে—কেউ মন্ত্রী কেউ কোটাল হয়েছে—এই সব। রাজার বেটা হয়ে কোটাল কোটাল খেলছে

একজন ভক্ত বললেন, ঈশ্বর দয়াময়।

কিসে দয়াময় ? জিজ্ঞেস করলেন রামকৃষ্ণ। কেন তিনি সর্বদা আমাদের দেখছেন, ধর্ম অর্থ সব দিচ্ছেন আহার যোগাচ্ছেন।

ঝলসে উঠলেন রামকৃষ্ণ! যদি কারো ছেলেপুলে হয় তাদের খবর, তাদের খাওয়াবার ভার বাপে নেবে না তো কি বামুনপাড়ার লোক এসে নেবে ?

—তাহলে কি ঈশ্বর দয়াময় নন ?

·তা কেন গো। ও একটা বললুম।

তিনি যে বড় আপনার লোক। তাঁর ওপর জোর চলে। আপনার লোককে এমন কথা পর্যন্ত বলা যায়,—'দিবি না রে শালা!' যারা 'দয়াময়' বলে তারা এটি ভাবে না যে, আমরা কি পরের ছেলে ? আমরা সকলে তাঁর ছেলে। ছেলের উপর আবার দয়া কি ? তিনি ছেলেদের দেখছেন।

ভ্রম সহজে যায় না, জ্ঞানের পরও থাকে।

ক্ষেতে চুরি করতে চোর এসেছে। খড়ের ছবি মানুষের আকার করে রেখে দিয়েছে—ভয় দেখাবার জন্য। চোরেরা কোনমতে ঢুকতে পারছে না। একজন কাছে গিয়ে দেখলে—খড়ের ছবি। এসে

ওদের বললে ভয় নেই। তবু ওরা আসতে চায় না। বলে বুক দুড়-দুড় করছে। তখন মাটিতে ছবিটাকে শুইয়ে দিলে, আর বলতে লাগলো এ কিছু নয়, এ কিছু নয়, 'নেতি' 'নেতি।'

ঠাকুর একবার মহেন্দ্র সরকারকে বললেন, কিছু বলো।

—তুমি কি বুঝছো না মনের ভাব? আর কত কষ্ট করে তোমায় এখানে দেখতে আসছি।

বললেন মহেন্দ্র সরকার।

—না গো মূর্খের জন্য কিছু বলো। বিভীষণ লঙ্কার রাজা হতে চায়নি। বলেছিলো রাম, তোমাকে পেয়েছি আবার রাজা হয়ে কি হবে? রাম বললেন বিভীষণ। তুমি মূর্খদের জন্য রাজা হও। তারা বলছে, তুমি এত রামের সেবা করলে, তোমার কি ঐশ্বর্য হলো? তাদের শিক্ষার জন্য রাজা হও।

এখানে তেমন মূর্খ কই? প্রশ্ন করলেন মহেন্দ্র সবকার। সহাস্যে রামকৃষ্ণ বললেন,—না গো, শাঁকও আছে আবার গেঁড়ি গুগ্‌লিও আছে।

উপস্থিত ভক্তবৃন্দ সকলেই হেসে উঠলেন। ঠাকুরের মুখনিঃসৃত সরস কথামৃত পান করে সকলেই অনাবিল আনন্দ উপভোগ করতে লাগলেন।

এইভাবে অফুরন্ত ঈশ্বরীয়প্রসঙ্গ নিয়ে ব্যাপৃত থাকেন শ্রীরামকৃষ্ণ। দিন নেই, রাত্রি নেই ভক্ত পিপাসুর পিপাসা মিটাতেই ব্যস্ত। ভক্তদের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য নিজের দেহ-মন-প্রাণ করলেন অর্পণ। অসংখ্য জনসমাগম হয় এখন দক্ষিণেশ্বরে। জ্ঞানী-গুণী মনীষী প্রতিভাবান্ ত্যাগী সাধু সন্ন্যাসী, আবার গৃহী ভক্তের দলও এসে ভিড় করতে লাগলেন। পঞ্চবটীর নির্জন পরিবেশ হয়ে উঠলো জনাকীর্ণ। শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনভূমি পঞ্চবটী—দক্ষিণেশ্বর—সকল শ্রেণীর মানুষের কাছেই—তান্ত্রিক বৈষ্ণব ব্রাহ্ম সকল ধর্মাবলম্বীর সম্প্রদায়ের নিকটই মহান তীর্থভূমিতে হলো পরিণত।

ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র আর উনিশ শতকের ধর্ম জাগরণের লীলাক্ষেত্র হয়ে উঠলো দক্ষিণেশ্বর। ফরাসী জীবনীকার মনীষী রোমাঁ রোলাঁর ভাষায়—'ত্রিশকোটি লোকের দুই সহস্র বৎসরের আধ্যাত্মিক জীবনের প্রতিমূর্তি ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ।' পরবর্তীকালে মহাত্মাগান্ধী লিখেছেন, 'রামকৃষ্ণ পরমহংসের জীবনের ইতিহাস ধর্মসাধনার অভূতপূর্ব ইতিহাস। তাঁর দেবজীবন আমাদের ভগবান লাভ করতে অনুপ্রাণিত করে। তাঁর উপদেশ কেবল পণ্ডিতের বাক্য নহে। পরন্তু তা জীবনবেদের জীবন্ত বাণী।'

বেদান্তের এই শুষ্ক জ্ঞানকে ভক্তিরসসিক্ত করে শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন ভক্তবৃন্দকে।

নামে রুচি জীবে দয়া বৈষ্ণব পূজন। সেই নাম সেই ঈশ্বর,— নাম নামী অভেদ জেনে সর্বদা অনুরাগের সঙ্গে নাম করবে। ভক্ত ও ভগবান, কৃষ্ণ ও বৈষ্ণব অভেদ জেনে সর্বদা সাধুভক্তদের শ্রদ্ধা পূজা ও বন্দনা করবে। কৃষ্ণেরই জগৎসংসার একথা হৃদয়ে ধারণ করে— 'সর্বজীবে দয়া' প্রকাশ করবে। 'সর্বজীবে দয়া' পর্যন্ত বলেই ঠাকুর সহসা সমাধিস্থ হয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পর অর্ধবাহ্যদশায় উপস্থিত হয়ে বলতে লাগলেন, জীবে দয়া—জীবে দয়া? দূর শালা!

কীটানুকীট তুই জীবকে দয়া করবি? দয়া করবার তুই কে? না না—জীবে দয়া নয়—শিবজ্ঞানে জীবের সেবা।

ভাবাবিষ্ট ঠাকুরের ঐ কথা শুনে অভিভূত হলেন নরেন্দ্রনাথ। গূঢ় মর্ম উপলব্ধি করে অন্তরঙ্গদের বলেছিলেম—

'কি অদ্ভুত আলোকই আজ ঠাকুরের কথায় দেখতে পেলাম! শুষ্ক কঠোর ও নির্মম বলে প্রসিদ্ধ বেদান্ত জ্ঞানকে ভক্তির সঙ্গে সম্মিলিত করে কি সহজ সরস ও মধুর আলোকই প্রদর্শন করলেন…। সর্বভূতে ঈশ্বরকে যতদিন না দেখতে পাওয়া যায় ততদিন যথার্থ ভক্তি বা পরাভক্তি লাভ সাধকের পক্ষে সুদূরপরাহত থাকে। শিব বা নারায়ণ-জ্ঞানে জীবের সেবা করলে ঈশ্বরকে সকলের ভিতর দর্শন

করে ভক্ত সাধক যথার্থ ভক্তিলাভে সমর্থ হয়। ভগবান যদি কখন দিন দেন ত আজ যা শুনলাম এই অদ্ভুত সত্য সংসারে সর্বত্র প্রচার করবো। পণ্ডিত-মূর্খ ধনী দরিদ্র ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল সকলকে শুনিয়ে মোহিত করবো।

ভবিষ্যতে নরেন্দ্রনাথের সে মনোবাসনা পূর্ণ হয়েছিল।

দক্ষিণেশ্বরের এই লীলাতীর্থ থেকেই 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা' এবং 'জ্যান্ত-জগদম্বা' জ্ঞানে নারী সেবার নব দৃষ্টিভঙ্গী লাভ করেছিলেন নরেন্দ্র—ভবিষ্যতের শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ।

শ্রীরামকৃষ্ণ সত্যদ্রষ্টা, অবতার পুরুষ। কিন্তু শাশুড়ী শ্যামাসুন্দরীর মনে শান্তি নেই। দুঃখ করে বলতেন,—এমন পাগল জামায়ের সঙ্গে আমার সারদার বে দিলুম, আহা! ঘর সংসারও করলে না, ছেলে-পিলেও হলো না, মা বলাও শুনলে না!' একদিন ঠাকুর তাই শুনতে পেয়ে বললেন—'শাশুড়ী ঠাকরুণ সেজন্য আপনি দুঃখ করবেন না, আপনার মেয়ের এত ছেলেমেয়ে হবে শেষে দেখবেন মা ডাকের জ্বালায় আবার অস্থির হয়ে উঠবে।'

তারপর একদিন নিরালায় জিজ্ঞেস করেন ঠাকুর সারদামণিকে—তোমার কি ছেলে-পিলের ইচ্ছে আছে নাকি মনেতে?

উত্তরে সারদা বলেছিলেন,—না; আমি কিছুই চাই না,—চাই কেবল তোমার আনন্দ।

—বেশ বেশ তোমার অনেক ভাল ভাল ছেলে হবে গো! কত সন্তান আসবে, দেশ-বিদেশের ভক্ত আসবে। তুমি সকলের মা হবে। সকলকে দেখবে। রামকৃষ্ণ বললেন, মৃদু হেসে।

আবার একদিন ঠাকুর বললেন সারদামণিকে নরেন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে। —এমন চোখ তোমায় দেখাবো, যেমনটি আর কখনও দেখনি। নরেন একেবারে মূর্তিমান জ্ঞান, সপ্তর্ষিমণ্ডল থেকে এসেছে। কী তার চোখ দুটি, তুমি দেখো। সারদা বললেন,—কি করে তাকে দেখবো? আমি তো ছেলেদের সামনে বেরুই না।

আচ্ছা সে হবে'খন।

অকস্মাৎ একদিন ঠাকুর নরেন্দ্রনাথকে নহবত ঘরে পাঠালেন কি একটা জিনিস আনতে। দরমার বেড়া দিয়ে নহবত ঘর ঘেরা। 'মা'-বলে ডেকে উপস্থিত হলেন নরেন্দ্রনাথ নহবত ঘরের সামনে। আর বেড়ার ফাঁক দিয়ে দেখলেন সারদামণি নরেন্দ্রনাথকে। সত্যই চমৎকার চোখ, দেখলে চোখ জুড়ায়। কেমন স্বচ্ছ যেন আরশি। মনে মনে বললেন সারদামণি।

লাটু মহারাজ একদিন ধ্যানে বসেছেন। তাকে লক্ষ্য করে ঠাকুর বললেন,—আরে তুই যাঁর ধ্যান করছিস, তিনি তো নবতে ময়দা ঠেসছেন। তাঁকে সারদার কাছে উপস্থিত করে বললেন,—এ ছেলেটি বেশ। এ তোমার ময়দা ঠেসে দেবে, রুটি বেলে দেবে। তোমার যখন যা প্রয়োজন একে বলো, ক'রে দেবে।' লাটু মহারাজও মায়ের আশ্রয় পেয়ে মহাখুশি।

আর একদিন একটি সন্তানকে ঠাকুর নহবতে নিয়ে এসে সারদা-মাকে দেখিয়ে বললেন,—'ওঁর চরণ ধ'রে পড়ে থাক, ওখানে তোর সব হবে।' ইনিই যোগেন মহারাজ।

সারদা মহারাজকে ঠাকুর বললেন,—তোর দীক্ষা ঐ ঘরে হবে। (নহবতে মায়ের নিকট')

এইভাবে ধীরে ধীরে ঠাকুর সন্তানদের সঙ্গে জ্যান্ত মায়ের পরিচয় করিয়ে দিলেন। সারদামণিও সকলের মা হয়ে উঠলেন। মাতৃস্নেহ থেকে তিনি কাউকেই বঞ্চিত করেননি। ছেলেদের প্রসন্ন করবার জন্য সকল রকম ক্লেশ স্বীকার করতেও কুণ্ঠিত হতেন না। বিভিন্ন সন্তানের আবার বিভিন্ন রুচি। সময়-অসময়েরও কোন হিসাব নেই। ক্ষুদ্র নহবতের মধ্যে বিরাট সমারোহ লেগেই থাকতো।

ঠাকুরের নির্দেশ মত ছেলেরা কেউ তাঁর ঘরে, কেউ মন্দিরে কেউ পঞ্চবটীতলায় কেউ বা বেলতলায় বসে জপধ্যান করতেন। ক্ষুধায় কষ্ট হবে ভেবে ঠাকুর ডেকে বলতেন,—'ওরে তোরা খেয়ে নে, তারপর

আবার জপধ্যান করবি। মা ত পর নন, পেট ঠাণ্ডা করে ডাকলেও মা রাগ করবেন না।'

একদিন রাখাল মহারাজের বড় খিদে পেয়েছে, ঠাকুরকে বললে। তখন দক্ষিণেশ্বরে খাবার পাওয়া যেতো না। ঠাকুর মৃদু হেসে গঙ্গার ধারে গিয়ে চীৎকার করে বললে,—'ও গৌরদাসী, আয় না, আমার রাখালের যে বড় খিদে পেয়েছে।'

অলৌকিক ব্যাপার কিছুক্ষণের মধ্যেই গঙ্গায় একখানা নৌকা দেখা গেল। নৌকাখানা ঘাটে লাগতেই তার মধ্য থেকে বলরামবাবু, গৌরদাসী প্রভৃতি ভক্তরা নামলো এক গামলা রসগোল্লা নিয়ে। ঠাকুরের তো মহানন্দ। চীৎকার করে ডাকতে লাগলেন,—'ওরে ও রাখাল আয় না রে রসগোল্লা এনেছে, খাবি আয়। খিদে পেয়েছে বললি যে।' রাখাল মহারাজ লজ্জায় লাল হয়ে রাগ করে কাছে গিয়ে বললেন—আপনি অমন করে সকলের সামনে খিদে পেয়েছে বললেন কেন? ঠাকুর মৃদু হেসে বললেন,—তাতে কি রে, খিদে পেয়েছে খাবি, তা বল্‌তে দোষ কি? এমনই আন্তরিক গভীর ভালবাসা ছিল ঠাকুরের সন্তানদের প্রতি।

আবার একদিন সারদা-মাকে বললেন রামকৃষ্ণ—আজ নরেন খাবে ভাল করে রেঁধো। সারদামাও যত্ন করে তাঁর জন্য রুটি, মুগের ডাল তরকারি রাঁধলেন।

নরেনের খাওয়া হয়ে গেলে ঠাকুর জিজ্ঞেস করলেন—রান্না কেমন খেলিরে নরেন। বললেন,—হয়েছে ভালই রুগীর পথ্যির মত।

মায়ের ঘরে গিয়ে ঠাকুর হেসে হেসে বললেন, নরেনের জন্য ভাল ক'রে ঘন ডাল আর মোটা রুটি তৈরী করবে। আজকের খাওয়া পছন্দ হয়নি।

পরে আবার সারদা-মা নরেনের জন্য মোটা রুটি আর ঘন ডাল রান্না করে খাওয়ালেন। নরেন্দ্রও তৃপ্তিসহকারে খেয়ে আনন্দ প্রকাশ করলেন।

পরবর্তীকালে সারদা-মা বলছেন,—ঠাকুরের রান্না হত,...অপর সব ভক্তদের রান্না হত।......দিনরাত রান্নাই হচ্ছে। এই হয়তো রাম দত্ত এল। গাড়ি থেকে নেমেই বলছে, 'আজ ছোলার ডাল আর রুটি খাবো। আমি শুনতে পেয়েই রান্না চাপিয়ে দিতুম। তিন চার সের ময়দার রুটি হতো। রাখাল থাকতো তার জন্য প্রায়ই খিচুড়ি হত।'......দক্ষিণেশ্বরে তখন অফুরন্ত আনন্দ। সময় নেই অসময় নেই দিনের পর দিন এই আনন্দোৎসব চলতো।

আবার একদিন রামকৃষ্ণ বঙ্কিমচন্দ্রকে প্রশ্ন করলেন,—বঙ্কিম! তুমি আবার কার ভাবে বাঁকা গো!

বঙ্কিম বললেন,—আরে মশায়! জুতোর চোটে। সাহেবের জুতোর চোটে বাঁকা।

বিদ্যাসাগরকে বলেছিলেন,—আজ সাগরে এসে মিললাম। এতদিন খাল বিল হদ্দ নদী দেখেছি। এইবার সাগর দেখছি।

প্রত্যুত্তরে বিদ্যাসাগর বললেন,—তবে নোনা জল খানিকটা নিয়ে যান।

শ্রীরামকৃষ্ণ—না গো নোনা জল কেন? তুমি তো অবিদ্যার সাগর নও, তুমি যে বিদ্যার সাগর। তুমি ক্ষীর সমুদ্র!

—তা বলতে পারেন বটে।

বললেন বিদ্যাসাগর।

রামকৃষ্ণ আবার বললেন,—তোমার কর্ম সাত্ত্বিক কর্ম। সত্ত্বের রজঃ। সত্ত্বগুণ থেকে দয়া হয়। দয়ার জন্য যে কর্ম করা যায়, সে রাজসিক কর্ম বটে, কিন্তু এ রজোগুণ সত্ত্বের রজোগুণ। এতে দোষ নেই। আর সিদ্ধ তো তুমি আছই।

বিদ্যাসাগর বললেন, মহাশয় কেমন করে?

হেসে হেসে বললেন ঠাকুর,—আলু পটল সিদ্ধ হলে তো নরম হয়। তা তুমি তো খুব নরম। তোমার অত দয়া!

বিদ্যাসাগরও সহাস্যে বললেন,—কলাই বাটা সিদ্ধ তো শক্তই হয়!

এবারে রামকৃষ্ণ বললেন,—তুমি তা নও গো। শুধু পণ্ডিতগুলো দড়কচা পড়া। না এদিক না ওদিক। শকুনি খুব উঁচুতে ওঠে, তার নজর ভাগাড়ে। যারা শুধু পণ্ডিত শুনতেই পণ্ডিত। কিন্তু তাদের কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি শকুনির মত। পচা মড়া খুঁজছে। আসক্তি অবিদ্যার সংসারে। দয়া ভক্তি বৈরাগ্য বিদ্যার ঐশ্বর্য।

কেশব সেনকে বললেন রামকৃষ্ণ—অহং ত্যাগ করতে হবে।

কেশব সেন বললেন,—তাহলে মহাশয় দল কেমন করে থাকে?

উত্তরে ঠাকুর বললেন,—তোমার এ কি বুদ্ধি। তুমি 'কাঁচা আমি' ত্যাগ করো।—যে আমিতে কামিনী কাঞ্চনে আসক্ত করে। কিন্তু পাকা আমি, দাস আমি, ভক্তের আমি ত্যাগ করতে বলছি না। আমি ঈশ্বরের দাস, আমি ঈশ্বরের সন্তান,—এর নাম পাকা আমি। এতে কোনও দোষ নেই।—'আমি'টা তো যাবে না, অতএব সে দাসভাবে থাক।—যেমন দাস থাকে।

অহঙ্কার আছে বলে ঈশ্বর দর্শন হয় না। ঈশ্বরের বাড়ির দরজার সামনে এই অহঙ্কাররূপ গাছের গুঁড়ি পড়ে আছে। এই গুঁড়ি পার না হলে তাঁর ঘরে প্রবেশ করা যায় না। অহঙ্কারও এই যায় আবার আসে। অহঙ্কার ত্যাগ না করলে ঈশ্বরের কৃপা হয় না।

গল্প বলছেন রামকৃষ্ণ ভক্ত সনে।

এক রাজা রোজ ভাগবত পাঠ শুনতো একজন পণ্ডিতের কাছে। ভাগবত পড়বার পর পণ্ডিত রাজাকে বলতো রাজা মশায় বুঝেছ? রাজাও রোজই বলতো, তুমি আগে বোঝো। ভাগবতের পণ্ডিত বাড়ি গিয়ে রোজ ভাবে যে, রাজা রোজ এমন কথা বলে কেন? আমি এত করে বোঝাই আর রাজা উলটে বলে তুমি আগে বোঝো? এ কি হলো!

পণ্ডিতটি সাধনভজনও করতো। কিছুদিন পরে তার হুঁশ হলো যে ঈশ্বরই বস্তু—আর সব গৃহ পরিবার ধন জন মান পাণ্ডিত্য সবই

অবস্তু। সংসারে সব মিথ্যা বোধ হওয়াতে সে সংসার ত্যাগ করলো। যাবার সময় কেবল একজনকে বলে গেল যে, রাজাকে বোলো যে এখন আমি বুঝেছি।

আবার বলছেন হেলে গরুওয়ালা ভাগবত পণ্ডিতের গল্প।

একজনের একটি ভাগবত পণ্ডিতের দরকার হয়েছিল। পণ্ডিত এসে রোজ তাকে শ্রীমদ্ভাগবতের কথামৃত শোনাবে। চারিদিকে লোক লাগালো। কিন্তু ভাগবতের পণ্ডিত পাওয়া যাচ্ছে না। অনেক খোঁজার পর একটি লোক এসে বললো, মশায় একজন উৎকৃষ্ট ভাগবতের পণ্ডিতের সন্ধান পেয়েছি।

—বেশ তো তাকে নিয়ে এসো।

এবারে লোকটি বললো, কিন্তু মহাশয় একটু গোল আছে।

—সে আবার কি ?

লোকটি আবার বললো—তাঁর কয়খানা লাঙ্গল আর কয়টা হেলে গরু আছে। তাদের নিয়ে সমস্ত দিন থাকতে হয়। চাষ দেখতে হয়। একটুও অবসর নেই।

সব শুনে, যার ভাগবতের পণ্ডিতের দরকার সে বললে,—ওহে যার লাঙ্গল আর হেলে গরু আছে, এমন ভাগবতের পণ্ডিত আমি চাই না। আমি চাচ্ছি এমন লোক যার অবসর আছে, আর আমাকে হরিকথা শোনাতে পারে।

রামকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত সরস গল্প শুনে ভক্তবৃন্দ হেসে উঠলো। ঠাকুরও মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন।

ভক্তবৃন্দের চোখের সামনে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রফুল্ল নির্মল মনোমোহন মূর্তিটি ভেসে উঠলো। যে হাসতে জানে, সেই বাঁচতে জানে, বাঁচাতেও জানে। শ্রীরামকৃষ্ণ অন্তরের ভাবকে রসে জ্বাল দিয়ে প্রতীকের সাহায্যে প্রকাশ করতেন। তাইতো কঠিন তত্ত্ব-কথাও সরস হয়ে উঠতো। তারপর সেই সরস সরল কথাগুলি এক দিন কথামৃত হয়ে উঠলো।

আনন্দময়ীর কাছে ঠাকুরের প্রার্থনাও ছিল—'আমাকে রসে বশে রাখিস মা। আমাকে শুকনো সন্ন্যাসী করিস নে।'

'রসো বৈ সঃ।' ব্রহ্ম যে অখণ্ড রসস্বরূপ। তিনি সর্বব্যাপী পরমানন্দ। সর্বত্রই যে তার প্রসারিত প্রসন্নতা। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্তের শুষ্ক জ্ঞানকে আনন্দরসে সিক্ত করে পরিবেশন করলেন ভক্তদের মধ্যে আজীবন ধরে। তাইতো দক্ষিণেশ্বর ভগবৎ আনন্দ উৎসবের লীলা-নিকেতন হয়ে উঠেছিল। অফুরন্ত ছিল সে কথামৃত—অফুরন্ত ছিল সে আনন্দ। আনন্দ...আনন্দ...আনন্দ ওগো মহানন্দ...আনন্দ...অপার...।

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের ঘরে যে অফুরন্ত আনন্দ মহোৎসব চলতো সেই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীমা সারদামণি বলছেন,—আমি থাকতুম বটে নহবতে, কিন্তু প্রাণ মন সর্বদা ঠাকুরেই পড়ে থাকতো। সেখানে কি হচ্ছে শোনবার জন্য উৎকর্ণ হয়ে থাকতুম। লক্ষ্মী, গৌরদাসী, গোপালের মা এদের দিয়েও খবর নিতুম। নহবতের বারান্দায় যে দরমার বেড়া ছিল, তার জায়গায় জায়গায় ফাঁক করে রেখেছিলুম। তার মধ্য দিয়ে ঠাকুরকে এবং তাঁর সব কাণ্ডকারখানা দেখতুম। বেড়ার ফাঁক ক্রমশ বড় হচ্ছে দেখে শেষে কিনা ঠাকুর একদিন হাসতে হাসতে বললেন, 'ও রামলাল, তোর খুড়ীর বাড়ির বেড়ার ফাঁক যে দিনকে দিন বেড়েই চলেছে—শেষ পর্যন্ত আবরুর অস্তিত্বটুকু থাকবে তো রে।' শুনে লজ্জায় মরে যেতুম। কিন্তু না দেখেও থাকতে পারতুম না। এমনই তীব্র ছিল সে আকর্ষণ।

অকস্মাৎ একদিন ভেঙে গেল এই আনন্দমেলা। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে ঠাকুর হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। পানিহাটির মহোৎসবে যোগদানের পর রোগের প্রকোপ আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হলো। কঠিন গলক্ষত রোগে শয্যাগত হলেন। পানিহাটিতে তাঁর অসুস্থ দেহের উপর সারাদিন ধরে চললো অত্যাচার। গ্রীষ্ম ও বৃষ্টির প্রকোপ। তার উপর ঠাকুরের বালকস্বভাব। কীর্তন শুনতে

শুনতে ভাবাবিষ্ট হলেন ভাব সংবরণ করতে পারলেন না। শুরু হলো উদ্দাম নৃত্য। অনিয়ম ও অত্যাচার চরমে উঠলো। আর তারই ফলস্বরূপ শয্যাগ্রহণ।

অবস্থা গুরুতর হলো। শারদীয়া পূজার কিছুদিন পূর্বে সুচিকিৎসার জন্য ভক্তরা ঠাকুরকে নিয়ে এলেন কলকাতায়। ৫৫নং শ্যামপুকুর স্ট্রীটের একটি বাড়িতে। ভক্ত ছেলেরা ঠাকুরের সেবা-শুশ্রূষা করতে লাগলেন। কিন্তু সারদামা'র অনুপস্থিতিতে সবকিছুই যেন ত্রুটিপূর্ণ মনে হলো। শ্রীশ্রীমা'র উপস্থিতির প্রয়োজনীয়তা সকলেই হৃদয়ঙ্গম করলেন। কিন্তু ঠাকুরের আপত্তি, সরস ভাষায় আপত্তি জানালেন—'না রে বাপু, সপত্নীক এখানে থাকলে শহরের লোকেরা হংস-হংসী বলে নিন্দা করবে গা।

অগত্যা ভক্তবৃন্দের একান্ত অনুরোধে ঠাকুর মৌনী রইলেন। সকলকে নিশ্চিন্ত করে সারদামা শ্যামপুকুরের বাসায় এসে উপস্থিত হলেন। নিভৃতে নীরবে আত্মগোপন করে একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে শ্রীশ্রীমা পতির সেবা-শুশ্রূষা করতে লাগলেন।

এইখানেই প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার ঠাকুরের সংস্পর্শে এসে ঠাকুরের অনুরাগী হয়ে উঠলেন। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের সমাধি-অবস্থা প্রত্যক্ষ ও পরীক্ষা করে উপলব্ধি করলেন ইহা মস্তিষ্কের বিকার অথবা স্নায়বিক দুর্বলতা নয়। ঐশ্বরিক ভাবই বটে। বুদ্ধি ও যুক্তি দিয়ে যার কোন ব্যাখ্যাই করা যায় না। আর ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করতে লাগলেন নরেন্দ্রনাথ, শ্রীম ও গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে। আরও প্রত্যক্ষ করলেন রামকৃষ্ণ স্পর্শমাত্র একসঙ্গে বহুলোককে ভাবাবিষ্ট করে ফেললেন। শ্রীরামকৃষ্ণ যে সত্য-সত্যই একজন শক্তিসম্পন্ন পুরুষ এ বিষয়ে তাঁর আর কোন সন্দেহই রইলো না। তাঁর বৈজ্ঞানিক মনের সব সংশয়ই দূর হলো। মহা-মায়ার বিচিত্র লীলা! মহেন্দ্র সরকার এসেছিলেন ঠাকুরের চিকিৎসা করতে, আর ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর অজ্ঞাতে তাঁর

বৈজ্ঞানিক মনের করলেন চিকিৎসা। তার সুফলও ফললো। মহেন্দ্র সরকার একজন ভক্ত মানুষে রূপান্তরিত হলেন। শ্রীরাম-কৃষ্ণের প্রিয় ভক্ত হলেন ডাঃ মহেন্দ্র সরকার।

শ্যামপুকুরে তিনমাস অবস্থানের পরও যখন রোগের উপশম হলো না তখন চিকিৎসকেরা পরামর্শ দিলেন রোগীকে মুক্তস্থানে স্থানান্তরিত করবার জন্য। ভক্তবৃন্দরা তখন কাশীপুরে একটি উদ্যানবাটী ভাড়া করলেন। দ্বিতল বাড়ি। সম্মুখে পুষ্করিণী। ফলফুলের তরুলতায় বেষ্টিত। মনোরম পরিবেশ। ত্যাগী যুবক ভক্তবৃন্দ আর শ্রীশ্রীমা সারদামণি ঠাকুরের সেবায় আত্মনিয়োগ করলেন। দিনের পর দিন রাত্রির পর রাত্রি চললো সেবা আর শুশ্রূষা। ত্যাগী সন্তানদের প্রতি শ্রীশ্রীমা'রও স্নেহধারা বর্ষিত হলো নহবতের ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ পরিত্যাগ করে সন্তানদের সম্মুখে করুণাময়ী জননীরূপে আবির্ভূতা হলেন শ্রীশ্রীমা সারদামণি। সন্তানেরাও সারদামণিকে জননীরূপে অতি নিকটে পেয়ে 'মা' বলে ডাকতে লাগলো। ছেলেরা মাকে এত কাছে এমন করে আর আর পায়নি ইতিপূর্বে। অনেকগুলি সন্তানের জননী হলেন সারদামণি। জ্যান্ত মা সারদেশ্বরী আর শ্রীরামকৃষ্ণ হয়ে উঠলেন পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ। ত্যাগীভক্ত সন্তানবৃন্দের কাছে।` আর এই স্থানেই শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘরূপ বিরাট মহীরুহের হলো বীজ বপন।

ঠাকুর বলছেন,—নরেন্দ্রের অবস্থা কি আশ্চর্য। দেখো, এই নরেন্দ্র আগে সাকার মানত না। এর প্রাণ কিরূপ আঁকপাঁক হয়েছে দেখছিস! সেই যে আছে—একজন জিজ্ঞেস করেছিল,—ঈশ্বরকে কেমন করে পাওয়া যায়। গুরু বললে, এসো আমার সঙ্গে, তোমায় দেখিয়ে দিই কি হলে ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। এই বলে একটা পুকুরে নিয়ে গিয়ে তাকে জলে চুবিয়ে ধরলে! খানিকক্ষণ পরে তাকে ছেড়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলে তোমার প্রাণটা কি রকম হচ্ছিলো? সে বললে, প্রাণ যায় যায় হচ্ছিল! ঈশ্বরের জন্য প্রাণ আঁকপাঁক করলে

জানবে যে দর্শনের আর দেরি নাই। অরুণ উদয় হলে—পূর্বদিকে লাল হলে বুঝা যায় সূর্য উঠবে।

ঠাকুর সস্নেহে দেখছেন নরেন্দ্রকে। দেখতে দেখতে যেন আনন্দে পরিপূর্ণ হচ্ছেন। ভক্তদের দিকে তাকিয়ে বলছেন,—'খু-ব।'

খুব কি? সহাস্যে জিজ্ঞেস করছেন নরেন্দ্রনাথ।

শ্রীরামকৃষ্ণ মৃদু মৃদু হাসছেন আর বলছেন,

—'খুব ত্যাগ হয়ে আসছে।'

আবার শ্রীম (মাস্টার মহাশয়)-কে লক্ষ্য করে বলছেন,—আবার দেখছি অনেক বুঝছে! না-গা?

মাস্টার মশায়ও মাথা নেড়ে ঠাকুরের কথায় সম্মতি জানালেন।

ঠাকুর আবার বলছেন, (নরেন্দ্রকে উদ্দেশ করে) দেখছি এর ভিতর থেকেই সব কিছু।

নরেন্দ্রকে ইঙ্গিত করে জিজ্ঞেস করছেন,—কি বুঝলি? প্রত্যুত্তরে নরেন্দ্র বলছেন,—যা কিছু অর্থাৎ যত সৃষ্ট পদার্থ সব আপনার ভিতর থেকে! শ্রীরামকৃষ্ণ হেসে হেসে অন্যান্য ভক্তদের বললেন দেখছিস।

আবার বলছেন যা বললুম সেই ময় দেখলে কি আর কিছু দেখা যায়? সংসার ফংসার আর কিছু দেখা যায়? তবে মনে ত্যাগ। এখানে যারা আসে, কেউ সংসারী নয়। কারু কারু একটু ইচ্ছা ছিল মেয়েমানুষের সঙ্গে থাকা। সেই ইচ্ছাটুকু হয়ে গেল। ভক্তবৃন্দ সকলেই হেসে উঠলেন। রামকৃষ্ণও মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন।

এবারে ঠাকুরের অনুরোধে নরেন্দ্র গান শুরু করলেন।—

কাহে সই জিয়ত মরত কি বিধান!
ব্রজ কি কিশোর সই, কাঁহা গেল ভাগই,
ব্রজজনে টুটায়ল পরাণ॥
মিলি সই নাগরী, ভুলি গেই মাধব,
রূপহীন গোপকুঙারী।

কো জানে পিয় সই, রসময় প্রেমিক

হেন্নু বঁধু রূপ কি ভিখারী ॥

আগে নহি বুঝনু, রূপ হেরি ভুলনু,

হৃদি কৈনু চরণ যুগল।

যমুনা সলিলে সই, অব তনু ডারব,

আন সখী ভখিব গরল ॥

কানন বল্লরী, গল বেঢ়ি বাঁধই,

নবীন তমালে দিব ফাঁস।

নহে শ্যাম শ্যাম শ্যাম শ্যাম শ্যাম নাম জপই,

ছার তনু করিব বিনাশ ॥

সঙ্গীত শেষে ঠাকুর ও ভক্তবৃন্দের নয়নে অঝোরে ঝরতে লাগলো প্রেমাশ্রু। অনির্বচনীয় পরিবেশের হলো সৃষ্টি।

দেখতে দেখতে কাশীপুরেও আটমাস অতিক্রান্ত হলো। ঠাকুরের অবস্থার বিশেষ কোনও পরিবর্তন হলো না। একদিন গভীর রাত্রিতে নরেন্দ্রনাথ, রাখালচন্দ্র ও শ্রীম—মাষ্টার মশায় ঠাকুরের পদসেবা করছেন। ঠাকুরের তখন কথা বলতেও কষ্ট। ধীরে ধীরে অতিকষ্টে বলছেন—'তোমরা কাঁদবে বলে এত ভোগ করছি সব্বাই যদি বল যে এত কষ্ট, তবে দেহ যাক,—তাহলে দেহ যায়।' একটু সুস্থ হলে আবার বলছেন,—'অনেক ঈশ্বরীয় রূপ দেখছি। তার মধ্যে এই রূপটিও (নিজের মূর্তি) দেখছি।'

আবার একদিন নরেন্দ্রকে ডেকে বললেন,—'নরেন, আমার এই সব ছেলেরা রইলো। তুই সকলের চেয়ে বুদ্ধিমান, শক্তিমান্। ওদের রক্ষা করিস সৎপথে চালাস্। আমি শীগ্‌গীরই দেহত্যাগ করবো।'

আর একদিন রাত্রে নরেনের দিকে অশ্রুসজল চোখে চেয়ে ঠাকুর বললেন, 'ওরে, আজ তোকে সর্বস্ব দিয়ে ফকীর হলুম।'

নরেন্দ্র বুঝলেন ঠাকুরের মহাপ্রস্থানের দিন—আসন্ন। ভাবাবেগ

দমন করতে পারলেন না। বালকের মত কেঁদে ফেললেন। সকলেই বিষম সত্যের সম্মুখীন হওয়ার জন্য মনকে প্রস্তুত করতে লাগলেন। সেই মর্মান্তিক বিচ্ছেদের দিন সর্পিল গতিতে অগ্রসর হতে লাগলো। একদিন ছুদিন করে।

ধীরে ধীরে সেই ভীষণ দিনটি অবশেষে এসে উপস্থিত হলো। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই আগস্ট রবিবার। মহাপুরুষের শয্যা ঘিরে শোক-ভারাক্রান্ত হৃদয়ে গৃহী ত্যাগী ভক্ত শিষ্যবৃন্দ মহাসমাধির প্রতীক্ষা করছেন। অকস্মাৎ শ্রীরামকৃষ্ণ চোখ মেলে পূর্ণ দৃষ্টিতে *নরেন্দ্রের দিকে চেয়ে বললেন,—'কি নরেন, এখনও তোর বিশ্বাস* হয়নি? যে রাম সে কৃষ্ণ সেই এবার একাধারে রামকৃষ্ণ। কিন্তু তোর বেদান্তের দিক দিয়ে নয়।'

দিবাবসানে রাত্রির হলো আগমন। ক্রমে ক্রমে রাত্রিও হয়ে এলো গভীর। শ্রীরামকৃষ্ণ সুমধুর কণ্ঠে বারত্রয় মহামন্ত্র কালী-কালী—কালী—উচ্চারণ করে জ্যোৎস্নাপ্লাবিত মহানিশায় ধীরে ধীরে মহাসমাধিতে হলেন নিমগ্ন। সর্বধর্মের সাধনা সিদ্ধি ও সমন্বয়ের মূর্তবিগ্রহ পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণ দেহলীলা সংবরণ করলেন—তখনও তাঁর বদনমণ্ডল মৃদুহাস্যে অনুরঞ্জিত। প্রেমমুখের প্রসন্নতা বিরাজমান। একটি শান্ত শুভ্র প্রাণঢালা প্রেমঢালা স্মৃতির ঘট ভক্তবৃন্দের হৃদয়ে স্থাপন করে যেন অমৃতধামের পথে করলেন যাত্রা।

স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতী

এ কি দৃষ্টিবিভ্রম না স্বপ্ন ?

নিষ্পলক চক্ষে বিস্মিত ও অভিভূত হয়ে দেখছেন নলিনীকান্ত। কক্ষের নিভৃতে ক্ষীণ আলোকের সম্মুখে তখনও দণ্ডায়মান রয়েছে তার প্রিয়তমা পত্নী। মুখমণ্ডলে ফুটে রয়েছে বিষাদের কালো ছায়া। মাত্র কয়েক মুহূর্ত তারপরেই অন্তর্ধান হলো সে মূর্তি। এবারে ভয়ার্তস্বরে চীৎকার করে উঠলেন নলিনীকান্ত। পাশের ঘর থেকে ছুটে এলো ভৃত্য। অনেক অনুসন্ধান করেও আর তার দেখা মিললো না।

তখন রাত্রি প্রায় আটটা। সেরেস্তার কাজে ব্যস্ত ছিলেন সুপারভাইজার নলিনীকান্ত। রাণী রাসমণি এস্টেটের সুপারভাইজার। কর্মস্থল নারায়ণপুর গ্রাম। জেলা দিনাজপুর। নব বিবাহিতা পত্নী নিয়ে নলিনীকান্ত এই গৃহেই প্রথম দাম্পত্যজীবন করেন শুরু। স্বামী অন্তপ্রাণা সহধর্মিণীকে নিয়ে সংসার পাতলেন বটে কিন্তু স্থায়ী হলো না। ছোট ছোট ভাইদের কথা চিন্তা করে স্ত্রীকে পাঠিয়ে দিলেন দেশে। কুতুবপুরে। মেহেরপুর মহকুমার অন্তর্গত এই কুতুবপুর গ্রাম। চুয়াডাঙ্গা রেলস্টেশন থেকে বিশ মাইল পথ।

ইতিপূর্বে মাতৃদেবী ইহধাম পরিত্যাগ করে চলে গেছেন। সংসার অচল। সংসারের দায়িত্ব পত্নী সুধাংশুবালাকেই যে গ্রহণ করতে

হবে, তাকে হতে হবে সুগৃহিণী। ভক্তিমতী স্ত্রী সুধাংশুবালাও আপত্তি করেননি। স্বামীর ইচ্ছাকেই নিজের ইচ্ছা বলে মেনে নিয়েছেন। স্বামীই যে তার ইষ্ট সেব্য। সর্বস্ব।

পূজা আসন্ন, দেশে যাবেন। প্রিয়তমা পত্নীর সঙ্গে মিলিত হবেন। সেই মধুরতম আশার আনন্দে বিভোর যুবক নলিনীকান্ত। সুখ-স্বপ্নে মগ্ন। প্রথম অনুরাগের নারীর রূপ দিয়ে গড়া প্রমোদময় এক জীবনের স্বপ্নে বিভোর। অকস্মাৎ সেই বিলাসস্বপ্নের জালকে এই মূর্তি এসে যেন করে দিয়ে গেল ছিন্ন।

রাত্রিতে আর ঘুম হলো না নলিনীকান্তের। নানা দুশ্চিন্তায় মন হয়ে রইলো ভরপুর। এ কি দেখলাম? স্ত্রীর অশরীরী মূর্তি? তবে কি স্ত্রী আর ইহধামে নেই? আবার মনে হয় ওসব কিচ্ছু না। দুর্বলতা! নিতান্তই ক্ষণিকের মোহগ্রস্ত মনের দুর্বলতা। এইভাবে অহেতুক নানা দুশ্চিন্তার মধ্য দিয়ে আরও দুই দিন হলো অতিক্রান্ত। অকস্মাৎ দেশ থেকে এক পত্র এলো, 'সুধাংশুবালা খুবই অসুস্থ। পত্রপাঠ চলে এসো।' আর দেরি করেননি নলিনীকান্ত। জরুরী কাজগুলি তাড়াতাড়ি সম্পন্ন করে রওনা হলেন স্বগৃহের পথে। কুতুবপুর অভিমুখে।

তখন শারোৎসবের আনন্দস্পর্শে বাংলার শহর পল্লী পুলকিত। চতুর্দিকে যেন নবজীবনের পরিপূর্ণ শোভা। অন্তরে নব-উন্মাদনা। পুষ্পিত তরুর শীর্ষে বিহঙ্গদেরও আনন্দকাকলি। দিকে দিকে আনন্দোৎসব, মহামহোৎসবের সমারোহ। কিন্তু যুবক নলিনীকান্তের মন নিরানন্দে ভরা। দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মন আর উদ্বেগ নিয়ে যেন রুদ্ধশ্বাসে ছুটে চলেছেন গৃহ অভিমুখে। গৃহে পৌঁছেই শুনলেন হৃদয়বিদারক সংবাদ। প্রাণপ্রিয়তমা জীবনসঙ্গিনী আর ইহজগতে নাই। কাল-নাগিনীর সহস্রদংশনের মত জর্জরিত হলেন নলিনীকান্ত। মর্মবেদনায় হৃদয় তাঁর হতে লাগলো বিদীর্ণ। একমুহূর্তে যেন জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা কামনা-বাসনার স্বপ্নজাল হয়ে গেল ছিন্নভিন্ন। সেদিনের

সে বিষাদময়ী মূর্তি যে তাঁর প্রাণপ্রিয়তমারই অশরীরী মূর্তি এ বিষয়ে আর সন্দেহ রইলো না নলিনীকান্তের। মৃত্যুর ঠিক কয়েকমুহূর্ত পূর্বেই স্ত্রী তাঁকে দর্শন দিয়ে গেছে। এবারে নানা জটিল প্রশ্ন তাঁর মনের কোণে উঁকি দিয়ে তাঁকে আরও ভাবিত করে তুললো। তবে কি আত্মা অবিনশ্বর? মৃত্যুর পরও কি তার অস্তিত্ব একেবারে বিলুপ্ত হয় না? ইচ্ছামতো দর্শন দেওয়া এবং কথাও বলা যায়?

শোকাহত নলিনীকান্তের এখন একমাত্র চিন্তা পরলোক ও অলৌকিক রাজ্যের গুঢ়তত্ত্ব কি করে জানা যায়।

নলিনীকান্তের কাকীমা নলিনীকান্তকে গোপনে ডেকে বাষ্পাচ্ছন্ন চোখে বললেন, 'ওরে, আমি বাঁচাতে পারলাম না বৌমাকে। বৌমা আমার তিন দিনের জ্বরে নিস্তব্ধ হয়ে গেলো। শেষ সময় আমার হাত ধরে বলে গেলো, ও যেন আর বিয়ে না করে।'

সুন্দর মাটির পুতুলের মত সুন্দরী স্ত্রী সুধাংশুবালার করুণ সে অনুরোধের কথা চিন্তা করে আরও ব্যাকুল হয়ে উঠলেন নলিনীকান্ত। দর্শনলাভের জন্য, কথা বলবার জন্য। আর তার সেই দুই চোখের সুস্মিত দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে থাকবার জন্য। সিক্ত হয়ে ওঠে নলিনীকান্তের চোখ। শুষ্ক শূন্য এক স্বপ্নের শ্মশানে যেন আগুনের করাল উৎসবে অন্তর তার ভস্ম হয়ে পড়েছে ঝরে।

এইভাবে একদিন কুতুবপুরের সেই বিষাদপূর্ণ দিনগুলিরও হলো অবসান। ফিরে এলেন কর্মক্ষেত্রে, নারায়ণপুরে। কিন্তু মনের শান্তি ফিরে পেলেন না নলিনীকান্ত। কাজের ফাঁকে ফাঁকে খোঁজ রাখতে লাগলেন সাধু সন্ন্যাসীদের। নানা শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদের সঙ্গেও আলোচনা করতে লাগলেন পরলোকতত্ত্ব সম্বন্ধে। কিন্তু কোন সূত্রই আবিষ্কার করতে পারলেন না। অকস্মাৎ একদিন রাত্রিতে আবার দেখতে পেলেন নলিনীকান্ত স্ত্রীর অশরীরী মূর্তি। তবে এবারে আর বিষাদমলিন নয়, দিব্যজ্যোতির্ময়ী আনন্দময়ী মূর্তি। নলিনীকান্ত ভীত হলেন না আরও যেন মনোবল ফিরে পেলেন। মনের বিশ্বাস আরও

যেন হলো দৃঢ়। সবকিছু খুলে বললেন একজন বন্ধুকে। বন্ধুবর নির্দেশ দিলেন কলকাতার থিওসফিক্যাল সোসাইটির সঙ্গে যোগাযোগ করতে। নলিনীকান্তও কলকাতায় আসবার সুযোগের অপেক্ষায় রইলেন। সুযোগও জুটে গেল। হঠাৎ বদলীর নির্দেশ এলো। বর্তমান কর্মক্ষেত্র হলো খুলনা জেলার কুমিরা গ্রাম। কুমিরার পথে কলকাতায় অপেক্ষা করলেন কয়েকদিন। যোগাযোগ করলেন থিওসফিক্যাল সোসাইটির সঙ্গে। কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা তর্ক-বিতর্ক করেও সমস্যা সমাধানের কোন পথ দেখতে পেলেন না। অবশেষে তাঁদের নির্দেশে মাদ্রাজে গিয়ে দেখা করলেন পরলোকতত্ত্ববিশারদ লেড্‌বিটার সাহেবের সঙ্গে। সেখানেও আলোচনা করে মনের দ্বন্দ্বের মীমাংসা হলো না। পরলোকের রহস্যজাল ছিন্ন করার কোন সূত্রই পেলেন না নলিনীকান্ত। তবে মনোবল হারালেন না। ফিরে এলেন কর্মক্ষেত্রে, কুমিরাগ্রামে। মনোনিবেশ করলেন কাজে। কিন্তু খোঁজ-খবর করতে লাগলেন প্রকৃত যোগী সন্ন্যাসীদের।

তাইতো কোথাও কোন সন্ন্যাসীর আগমনবার্তা কর্ণগোচর হলেই ছুটে যান মনের আকুতি নিয়ে। দর্শন করেন, কথা বলেন কিন্তু ফিরে আসেন ব্যর্থতা নিয়ে। কেউ বলে পাগল, কেউ বলে উদ্‌ভ্রান্ত নলিনীকান্তকে। অকস্মাৎ সংবাদ পেলেন কলকাতায় এসেছেন এক সিদ্ধপুরুষ। স্বামী পূর্ণানন্দ পরমহংস। পূর্বাশ্রমের নাম শ্রীপূর্ণচন্দ্র দত্ত। ডাফ্‌ কলেজের বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন। সাধক-জীবনের যশঃসৌরভ তখন তাঁর দূরদূরান্ত পর্যন্ত ব্যাপ্ত হয়েছে। আশ্রম বিন্ধ্যাচলে।

নলিনীকান্তও ছুটে এলেন কলকাতায়। সিদ্ধ মহাযোগী স্বামী পূর্ণানন্দের নিকট। কিন্তু কিছুই প্রকাশ করতে পারছেন না। স্বামীজী সর্বদাই ভক্তবৃন্দ পরিবৃত হয়ে থাকেন। দুই দিন শুধু ঘোরা-ফেরাই করলেন। কথা হলো না, তৃতীয় দিনে অকস্মাৎ মৃদু হেসে

স্বামী পূর্ণানন্দই জিজ্ঞেস করলেন, ওহে ছোকরা, এত নিরানন্দ কেন তোমার চোখ আর মুখ ?

বিচলিত নলিনীকান্ত স্বামীজীর নিকট ব্যক্ত করলেন তাঁর মনোবেদনার ইতিহাস। নলিনীকান্তের নিকট থেকে সব কিছু শুনে পূর্ণানন্দ বললেন, তোমার স্ত্রীকে পৃথকভাবে সাধনা করে পাবার আমি কিছু জানি না। তবে আমি যা জানি তা' হলো জগজ্জননীর আরাধনা করে তাঁর সাক্ষাৎলাভ করতে পারো। তোমার স্ত্রী এবং বিশ্বের সকল নারীই জগজ্জননীর অংশভূতা। তোমার স্ত্রী তাতেই মিশে গেছেন। তুমি যদি সাধনা করে জগজ্জননীর সাক্ষাৎপ্রাপ্ত হও তাহলে তোমার স্ত্রীকে পাবে। জগজ্জননীকে পেলেই তোমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। তুমি শুধু ঐ ছায়ার সন্ধানে যে শক্তি ব্যয় করবে তা দিয়েই জগজ্জননীকে লাভ করতে পারো।

প্রত্যুত্তর নলিনীকান্ত বললেন, আমার স্ত্রীকে পাওয়াই উদ্দেশ্য এবং আমার স্ত্রীকে লাভ করার জন্য আমি জগজ্জননীর আরাধনা করতে প্রস্তুত। আপনি আমাকে সাধনার প্রণালী বলে দিন।

স্বামীজী—দীক্ষা নিতে হবে।

নলিনীকান্ত—আপনি আমাকে দীক্ষা দিন।

স্বামীজী—আমি তোমার গুরু নই। তোমার গুরুর অনুসন্ধান করো। তারপর দীক্ষা নিয়ে মহাশক্তির আরাধনায় প্রবৃত্ত হও।

এবারে নলিনীকান্তের মুখে চোখে ফুটে উঠলো হতাশার চিহ্ন। শোকাহত যুবক নলিনীকান্তের মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে স্নেহার্দ্র কণ্ঠে বললেন স্বামীজী,—বাবা চিন্তা করো না। তোমার গুরু নির্দিষ্ট আছেন। সময় হলে সব কিছুই ঠিক ঠিক হয়ে যাবে। তুমি নিশ্চিত সফল হবে, শুধু চেষ্টা করে যাও।'

বিচলিত নলিনীকান্তের মন যেন হঠাৎ শান্ত হয়ে যায়। মুগ্ধচিত্তে তাকিয়ে থাকেন তপস্বী সাধক পূর্ণানন্দ স্বামীর শান্ত ও সৌম্য মুখের দিকে। দগ্ধ প্রাণে শান্তিবারি সিঞ্চিত হলো। আবার হলো

আশার সঞ্চার। যে নূতন জগতের সন্ধান পেয়েছেন, রহস্যাবৃত সেই অলৌকিক জগৎ যে তাঁকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। সে জগতে প্রবেশ করবার পথের সন্ধানও পেলেন। এখন সদ্‌গুরুর সন্ধান করে দীক্ষা গ্রহণ করলেই সফলতার পথে এগিয়ে যেতে পারবেন। তাইতো তীব্র ব্যাকুলতা জেগে উঠলো নলিনীকান্তের মনে সদ্‌গুরু লাভের জন্য। অন্তরে তীব্র ব্যাকুলতা নিয়ে ফিরে এলেন কর্মক্ষেত্রে। কুমিরাগ্রামে। দিনে দিনে গুরুলাভের তীব্রতা আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হলো। সাধু-সন্ন্যাসীদের সন্ধান পেলেই ছুটে যান। তাঁদের মধ্যে অনুসন্ধান করেন গুরুকে, কিন্তু ব্যর্থ হয়ে আসেন ফিরে। এইভাবে একদিন ছুটে এলেন যশোহরের এতনায়। এক বৈষ্ণব সাধুর পদতলে। কিন্তু মনস্কামনা পূর্ণ হলো না। এলেন বারাকপুরে চাণক গ্রামে, এক যোগীবরের চরণতলে। এখানেও ব্যর্থ হলেন। গেলেন বেলুড়মঠে, গেলেন চট্টগ্রামে এক সাধুর কাছে। সেখান থেকেও ব্যর্থতা নিয়ে ফিরলেন। দিনে দিনে অস্থিরতা বেড়ে গেল। মানসিক জগতে সৃষ্টি হলো তুমুল আলোড়নের। চাকরি ছেড়ে দেওয়াই মনস্থ করলেন। অকস্মাৎ একদিন মধ্যরাত্রিতে ঘুম ভেঙে গেল। বিস্মিত হয়ে নলিনীকান্ত দেখলেন, স্বপ্ন নয়, দৃষ্টি-বিভ্রমও নয়, সম্মুখে দণ্ডায়মান জটাজুটবিমণ্ডিত এক সন্ন্যাসী। সুস্মিত মুখমণ্ডল। সস্নেহে স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলছেন,—'এই নাও বৎস দীক্ষা।'

মোহাচ্ছন্নের মত হাত পাতলেন নলিনীকান্ত। হাতে একটা জিনিস পেলেন। কি দিলেন কি করতে হবে জিজ্ঞেস করতে বাক্যস্ফুরিত হলো না। যন্ত্রচালিতের মত নলিনীকান্ত শয্যা ছেড়ে আলো জ্বাললেন জিনিসটি দেখবার জন্য। দেখলেন একটি বিল্বপত্রে রক্তচন্দনে লেখা বীজমন্ত্র। পরমুহূর্তেই জিজ্ঞাসুর দৃষ্টিতে মুখ তুললেন, কিন্তু সন্ন্যাসীকে আর দেখতে পেলেন না। ঘরের দরজা ঠিকমতই বন্ধ রয়েছে, অলৌকিক ব্যাপার। অবশেষে দরজা খুলে

অনেক অনুসন্ধান করেও সন্ন্যাসীর দর্শন মিললো না। শোকভারাক্রান্ত হৃদয়ে রাত্রি অতিক্রান্ত হলো নলিনীকান্তের। এটি কি মন্ত্র? কেমন করে জপ করতে হবে? মনে মনে আওড়ালেন। মনোজগতে শুরু হলো তুমুল আলোড়নের। আর দ্বিধা করেননি। নলিনীকান্ত চলে এলেন কাশীধামে। কাশীতে বহু সাধু-সন্ন্যাসী সিদ্ধ মহাপুরুষ অবস্থান করেন তাঁরাই রহস্যের মূল উদ্‌ঘাটন করতে নিশ্চয়ই হবেন সক্ষম। মনে মনে ভাবলেন নলিনীকান্ত। কিন্তু বহু সাধু-সন্ন্যাসী সঙ্গে মিলিত হয়েও এ রহস্যের জাল ছিন্ন করতে পারলেন না নলিনী-কান্ত। সদ্‌গুরুর দর্শনও মিললো না। নিরাশ হয়ে স্থির করলেন প্রাপ্ত মন্ত্র সম্বন্ধে কোন নির্দেশ না পেলে গঙ্গার জলে আত্মবিসর্জন দিয়ে এ চিত্ত বিক্ষেপের হাত থেকে পরিত্রাণ লাভ করবেন। সেই দিন রাত্রিতেই বিচিত্র এক স্বপ্ন দেখলেন নলিনীকান্ত। সেই বৃদ্ধ ঋষিকায় পুরুষ সস্নেহে বলছেন,—'বাবা উতলা হয়ো না। তারাপীঠে মহাতান্ত্রিক বামাক্ষ্যাপার শরণাপন্ন হও। তিনিই তোমায় মহামায়ার সাধনায় সাহায্য করবেন।'

আর দ্বিধা-সংশয় রইলো না নলিনীকান্তের মনে। কাশী থেকে ব্যাকুল অন্তঃকরণে ছুটে এলেন তারাপীঠে। তারামায়ের মন্দির প্রাঙ্গণে এসে দর্শন পেলেন উলঙ্গ সাধু বামাক্ষ্যাপার। আকুল হয়ে দুই হাতে জড়িয়ে ধরলেন তাঁর পদযুগল। প্রণাম করে বেদনাহতের মত বিচলিতভাবে কেঁদে ফেললেন নলিনীকান্ত।

বামাক্ষ্যাপার স্নেহস্পর্শে নলিনীকান্তের বিচলিত মন যেন হঠাৎ শান্ত হয়ে গেল। বামাক্ষ্যাপাও অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে অপরিচিত যুবককে দেখে নিয়ে সস্নেহে জিজ্ঞেস করলেন,—তুই কি চাস?

শোক-দুঃখ তাপিত জীবনের সব ইতিবৃত্ত খুলে বললেন নলিনীকান্ত।

সবকিছু শুনে বামাক্ষ্যাপা বললেন,—হবে হবে তোর হবে। মা তোকে দিয়ে অনেক কিছু করাবেন রে। তুই তারামা'র ধ্যান কর,

সাধনা মহাশক্তির, জগজ্জননীই মহাশক্তি। সেই বিশ্বজননীর সঙ্গে যোগ হতে হলে নিজের ভিতর যে শক্তি সুপ্ত রয়েছে তার উদ্বোধন করতে হবে। আর এই মহাশ্মশানই সেই সুপ্ত শক্তি উদ্বোধনের উপযুক্ত ক্ষেত্র—বুঝলি? তারামাকে ডাক হয়ে যাবে। বামাক্ষ্যাপার পদতলে বসে নলিনীকান্তের জীবনের সাধনার প্রথম অধ্যায় হলো শুরু। নবীন সাধক নলিনীকান্ত তারাপীঠের মহাশ্মশানের নিভৃতে এসে কঠোর সাধনায় হলেন ব্রতী।

দ্বারকা নদীর তীরে মহাশ্মশান তারাপীঠ। জনবিরল দিগন্ত-প্রসারী। যুগ যুগ ধরে শ্মশানভূমির স্তরে স্তরে সঞ্চিত চিতাভস্ম। নৃমুণ্ড নৃকঙ্কাল ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে রয়েছে। গৃধিনী কাক শৃগাল কুকুর মহাশ্মশানকে ঘিরে যেন পাহারায় রত। তাদের চীৎকারধ্বনি যেন শত শত প্রেতের হৃৎপিণ্ডের উল্লাসধ্বনি। শুষ্ক ভগ্ন নৃমুণ্ডের রন্ধ্রে রন্ধ্রে নিশ্বাস হেনে ছুটে চলে যায় নিশীথের বাতাস। মনে হয় যেন এক অশরীরী বেদনার বিষাদ করুণ আর্তনাদ। শ্মশানের মাটি হতে যেন এক শোকরাগিণী গুঞ্জরিত হয়ে উঠছে। কখনো বা ঝড় জাগে, দিকপ্রান্ত হতে যেন ধেয়ে আসে অনন্ত হাহাকার। আবার আকস্মিক অট্টহাসির শব্দে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় মহাগম্ভীর শ্মশানের স্তব্ধতা। অমা-রজনীর গভীর তমিস্রায় ভয়ঙ্কর এই পরিবেশের মধ্যে মহামায়ার সাধনায় যোগাসীন হলেন নবীন সাধক নলিনীকান্ত। তন্ত্রসাধনার গুরু হলেন মহাতান্ত্রিক বামা-ক্ষ্যাপা। তাঁরই কৃপায় নলিনীকান্ত অতি অল্পসময়ের মধ্যে তন্ত্রোক্ত সাধনা সমূহ্ করলেন আয়ত্ত। ভালোবেসে ফেললেন মহাশ্মশানের ভয়ঙ্কর এই অন্ধকারকে। পরমানন্দের আভাস পেলেন। অননুভূত তেজের হলো অনুভব। জমিদারী সেরেস্তার কর্মচারী নলিনীকান্ত সাধক নলিনীকান্তে হলেন রূপান্তরিত। তখনও কিন্তু স্ত্রীকে পাওয়ার দর্শন করবার আকাঙ্ক্ষা একেবারে হলো না নির্বাপিত অন্তররাজ্য থেকে। তারপর সেই শুভদিনটিও এসে উপস্থিত হলো। চরম

তত্ত্বকে প্রত্যক্ষ করবার দিনটি। দ্বারকা নদীর ঘাটে সন্ধ্যা নামে, জনহীন নদীতীর, মহাশ্মশান। তারামায়ের সাধনায় রত নবীন সাধক নলিনীকান্ত। সমাধিমগ্ন। ধীরে ধীরে শ্মশানের বুকে ঘনিয়ে আসে অমা-রাত্রির নিরন্ধ্র অন্ধকার। স্তবকিত তমিস্রা। বিস্মিত হয়ে অনুভব করেন নলিনীকান্ত যেন এক বিরাট ভয়ালের ভ্রূকুটির আঘাতে শিহরিত হয়ে কাঁপছে শ্মশানের মাটি। সহস্র প্রেতের দন্তসংঘর্ষের ধ্বনি ছুটাছুটি করছে চারিদিকে। ভীত হলেন না নবীন সাধক, তখনও আত্মস্থ। পরমুহূর্তেই নয়নগোচর হলো জ্যোতির্ময়ী এক দেবীমূর্তি। আনন্দময়ী, মুখচ্ছবি প্রিয়তমা পত্নীর। বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন নলিনীকান্ত,

—তুমি কে?

মৃদু হেসে আনন্দময়ী বললেন,

—আমি তারা, তোমার ইষ্টদেবী।

নলিনীকান্ত সহজকণ্ঠেই বললেন,—তোমার এ মূর্তি তো গুরুর উপদিষ্ট মূর্তি নয়। সত্য বল তুমি কে?

দেবী মৃদু হেসে বললেন,—আমিই তারা। তোমার সাধনা ফলবতী হয়েছে। আমি তাই তোমার মনোময়ীরূপে তোমাকে দর্শন দিচ্ছি। আমি বিশ্বরূপা যে কোন মূর্তিতেই দর্শন দিতে পারি। মোহাচ্ছন্নের মত নলিনীকান্ত দেবীকে প্রণাম করলেন। দেবী সাধকের ললাটে পদস্পর্শ করলেন।

স্নেহার্দ্রকণ্ঠে দেবী বললেন,

সাধনার ফলস্বরূপ ফল প্রার্থনা কর।

ত্রিলোকে যা কিছু তোমার অভীষ্ট আমায় বল।

নলিনীকান্ত—কি আর চাহিব মাগো। ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে নিয়ে তোমার কাছে তো আসিনি। যদি চাইতেই হয় তবে তোমাকেই চাই। যখনই তোমাকে স্মরণ করবো তখনই যেন তুমি এই মূর্তিতে আমার নিকট আবির্ভূত হও।

প্রত্যুত্তরে দেবী বললেন, 'তাই হবে বাছা।'

অবশেষে নলিনীকান্ত তারামায়ের চরণে ঐহিক, কামনা বাসনা সবকিছু নিবেদন করে বললেন,—'মাগো, তুমি একবার সেই বেদময়ী মূর্তি দেখাও, যে মূর্তি সম্বন্ধে গুরু উপদেশ দিয়েছেন।'

ভক্ত সন্তান নবীন সাধকের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবার জন্য বিশ্বজননী আনন্দময়ী ধীরে ধীরে বিলীন হয়ে জ্যোতিঃপুঞ্জে পরিণত হয়ে মণ্ডলাকার ধারণ করলেন। তারপর মহাশূন্যে বিরাট জ্যোতির্মণ্ডল মধ্যবর্তী সদ্যচ্ছিন্ন রক্তাক্ত নৃমুণ্ডমালিনী রক্তনেত্রা ঊর্ধ্বকেশা রুদ্রনৃত্য-পরা বামা স্বরূপ ধারণ করলেন। মাতৃসাধক নলিনীকান্ত জগজ্জননীর স্বরূপ দর্শন করে মুগ্ধ হলেন। অভিভূত হয়ে মাথা লুটিয়ে প্রণাম করলেন জগজ্জননীকে। আবার মাতৃধ্যানে বিভোর হয়ে রইলেন নলিনীকান্ত। এইভাবে তন্ত্রসাধনা করে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ইষ্টকে লাভ করলেন তরুণ সাধক নলিনীকান্ত। বামাক্ষ্যাপাও খুশি হলেন।

অবশেষে নলিনীকান্ত গুরু বামাক্ষ্যাপার আশীর্বাদ গ্রহণ করে আবার ফিরে এলেন কলকাতায়।

কলকাতায় ফিরে নলিনীকান্তের সাধনালব্ধ ফল যেন কোথায় হলো তিরোহিত। স্ত্রীরূপে মহাশক্তিকে সাক্ষাৎ করে আনন্দের পরিবর্তে নিরানন্দই মনের ওপর প্রভাব বিস্তার করলো। স্ত্রীরূপে মহাশক্তি আসলেও স্বরূপে তো তিনি আর স্ত্রী নন, মনে মনে ভাবেন নলিনীকান্ত। নূতন করে এক মানসিক দ্বন্দ্বের হলো সৃষ্টি। কে এই তারা? কে এই মহাশক্তি যিনি আমায় স্ত্রীমূর্তিতে দর্শন দিয়ে প্রলুব্ধ করছেন? তাঁর স্বরূপ কি? কেন তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাঁর দাসত্ব গ্রহণ করেছি? আর আমিই বা কে? আমার স্বরূপ কি?

জ্ঞানরাজ্যের নানা জটিল প্রশ্নে নলিনীকান্তের মানসিক জগতে আবার আলোড়নের হলো সৃষ্টি। মনের কাছ থেকে কোন উত্তর

না পেয়ে আবার ছুটে এলেন ব্যাকুলচিত্তে তারাপুরের তারাপীঠে গুরু বামাক্ষ্যাপার চরণে। লুটিয়ে পড়ে বললেন, বাবা ইষ্টদর্শন করেও আমি শান্তি পাচ্ছি না। আমি কি তাহলে সিদ্ধকাম হইনি? তাছাড়া আমার স্বরূপ কি? আত্মসাক্ষাৎকার তো হলো না। আমার মনে হচ্ছে আমার কিছুই হলো না। আমার প্রতি কি কৃপা হবে না বাবা?

ক্ষ্যাপাবাবা তো রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলেন। তারপর রূঢ়স্বরে বলে উঠলেন,—আমি স্বচক্ষে দেখলাম তোর কত কি হয়ে গেল আর তুই শালা এখনও বলছিস তোর কিছুই হলো না। হতভাগা, লক্ষ্মী-ছাড়া। তারপর—পরদিন বামাক্ষ্যাপা ভক্ত শিষ্যকে আশ্বস্ত করে বললেন,—ওরে তোর স্বরূপ জানতে হলে তোকে সন্ন্যাসী হতে হবে। সন্ন্যাসীর দীক্ষা নিতে হবে।

নলিনীকান্তও আকুলতা নিয়ে বললেন,—বেশ, আপনি আমাকে সন্ন্যাসীর দীক্ষা দিন।

বামাক্ষ্যাপা এবার হেসে হেসে বললেন, ওরে আমার দ্বারা হবে না। আমি যে অবধূত। তোকে জ্ঞানপন্থী সন্ন্যাসী হতো হবে। শঙ্করসম্প্রদায়ভুক্ত সাধু অনেক কিছ করিয়ে নেবেন। তুই যা, সময়ে-সব ঠিক ঠিক হয়ে যাবে।

নবীন সাধক এবারে গম্ভীর হয়ে গেলেন। গুরু বামাক্ষ্যাপার আশীর্বাদ নিয়ে ফিরে এলেন কর্মস্থলে। আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করে চাকুরীতে ইস্তফা দিয়ে যাত্রা করলেন কাশীধামের পথে। জ্ঞানপন্থী গুরুর অনুসন্ধানে। তখনও মনের মধ্যে অবিরাম চলছে সেই একই প্রশ্ন কোঽহং—আমি কে?

কাশীধামে এসে—সাক্ষাৎ করলেন কৃষ্ণানন্দ স্বামী, ভাস্করানন্দ স্বামী ও অন্যান্য অনেক সাধু-সন্ন্যাসীর সঙ্গে। কিন্তু মানসিক দ্বন্দ্বের মীমাংসা ও গুরু নির্বাচন হলো না।

এদিকে সংবাদ পৌঁছালো নলিনীকান্তের গ্রামে কুতুবপুরে পিতার

নিকট। উদ্‌ভ্রান্তের মত নলিনীকান্ত এখানে ওখানে ছোটাছুটি করছে। চাকরিতেও দিয়েছে ইস্তফা। দুঃসংবাদে পিতৃদেব ভুবনমোহনও শোকভারাক্রান্ত হৃদয়ে শয্যাশায়ী হলেন। এবং লোক নিযুক্ত করলেন পুত্রকে ফিরিয়ে আনবার জন্য।

পিতার অনুসন্ধানের চেষ্টার কথা জানতে পেরে নলিনীকান্তও কাশীধাম পরিত্যাগ করে বৃন্দাবনের পথে পা বাড়ালেন। পথে বিন্ধ্যাচলে এসে সাক্ষাৎ করলেন পূর্ণানন্দ স্বামীজীর সঙ্গে। তিনি নলিনীকান্তকে আশীর্বাদ করে ভবিষ্যদ্বাণী করলেন, অতি সত্বরই তার শঙ্করসম্প্রদায়ভুক্ত বৈদান্তিক সন্ন্যাসী গুরুপ্রাপ্তি ঘটবে।

বৃন্দাবনে এসে উঠলেন এক বৈষ্ণব বাবাজীর আশ্রমে। নবীন সাধকের নয়নাভিরাম রূপ দর্শনে মুগ্ধ হলেন বাবাজীর ষোড়শী কন্যা। আত্মদানের আকুলতাও প্রকাশ করলেন। বৈষ্ণব বাবাজীও আপত্তি করলেন না, নলিনীকান্তের চরিত্রগুণে পূর্বেই মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং সানন্দে কন্যা সম্প্রদানের ইচ্ছা জানালেন। মাতৃসাধক আর দ্বিরুক্তি না করে সেই মুহূর্তেই তার ঝোলাঝুলি নিয়ে বৃন্দাবনধাম ত্যাগ করলেন। যাত্রা করলেন হরিদ্বারের পথে। হৃষীকেশ, লছমনঝোলা ও হিমালয়ের পাদদেশে পরিভ্রমণ করতে লাগলেন। পথে পথে। গঙ্গার তীরে তীরে। পথশ্রমে ক্লান্ত অবসাদগ্রস্ত দেহ নিয়ে কোথায় চলেছেন তরুণ সাধক নিজেও জানেন না। মনের মধ্যে সেই একই প্রশ্ন তখনও অনুরণিত হচ্ছে কোঽহং। আমি কে?

দিনের পর দিন মাসের পর মাস চলেছে পথপরিক্রমা। কোনদিন আহার জুটছে কোনদিন জুটছে না। কোন ভ্রূক্ষেপ নেই মনে তরুণ সাধকের। অবশেষে এসে উপস্থিত হলেন আজমীরে। শহরের শেষ প্রান্তে সেদিন অনুষ্ঠিত হচ্ছিল এক ধর্মসভা। তেজঃপুঞ্জ নয়নযুক্ত জটাজূটধারী দিব্যকান্তি এক সন্ন্যাসী বেদীতে বসে বেদান্ততত্ত্বের ব্যাখ্যা করছেন। নলিনীকান্ত সভামণ্ডপে প্রবেশ করে দেখলেন সেই মহাপুরুষকে। যোগীবরের সঙ্গে দৃষ্টিবিনিময় হতেই

বিস্মিত ও অভিভূত হলেন সাধক নলিনীকান্ত। মনোবিকার বা দৃষ্টিবিভ্রম নয়। সত্য, কঠিন সত্য। ইনিই সেই জ্যোতির্ময় দেহ-ধারী সন্ন্যাসী যাঁকে তিনি গৃহাভ্যন্তরে গভীর রাত্রিতে দর্শন করে-ছিলেন। ইনিই সেই মহাপুরুষ যিনি বিল্বপত্রে একাক্ষর বীজমন্ত্র দিয়ে অন্তর্ধান হয়েছিলেন। পরমুহূর্তেই আকুল হয়ে 'আমার গুরু পেয়েছি,—পেয়েছি' বলে চীৎকার করে ছুটে গেলেন সন্ন্যাসীর নিকটে এবং মোহাচ্ছন্নের মত পদতলে পড়লেন লুটিয়ে। নয়নে নয়নে অঝোরে বইতে লাগলো শ্রাবণের ধারা। অনেকদিনের সঞ্চিত অন্তরের গ্লানির দুর্বহ ভার হতে যেন মুক্ত হলেন নবীন সাধক নলিনীকান্ত।

ধীর গম্ভীর যোগীবরের মনও বিচলিত হলো। করুণায় বিগলিত হলো তাঁর অন্তর নবীন সাধকের মর্মবেদনার কথা ভেবে আর অসহায় অবস্থা দর্শন করে আচার্য। সচ্চিদানন্দ পরমহংস সেদিনকার মত ধর্ম প্রসঙ্গ বন্ধ করলেন। স্নেহকোমল হস্তে মুছিয়ে দিলেন সাধক ভক্ত নলিনীকান্তের অশ্রুধারা। ললাটে পরিয়ে দিলেন আশিস তিলক। আর যেন অমৃত বর্ষণে স্নিগ্ধ করে দিলেন তার তাপিত তৃষিত অন্তর।

নলিনীকান্তের বহুপ্রার্থিত জ্ঞানপন্থী গুরুর আশ্রয় অবশেষে মিললো। কিছুদিনের মধ্যেই গুরুর সঙ্গে চলে এলেন পুষ্কর আশ্রমে। শুরু হলো তাঁর কঠোর আশ্রমজীবন। এই সচ্চিদানন্দ পরমহংসই নলিনীকান্তের জ্ঞানপন্থী গুরু। ইনিই নলিনীকান্তকে দিয়েছিলেন সন্ন্যাসীর দীক্ষা। নলিনীকান্ত হলেন স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতী। উত্তরকালে স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতীর সাধনার যশঃসৌরভ সমগ্র বাংলা, আসাম ও উড়িষ্যায় পড়েছিলো ছড়িয়ে। বহু মানুষের অন্তরের দুঃসহ ব্যথা গ্লানি দূরীভূত হয়েছিল স্বামী নিগমানন্দের সংস্পর্শে এসে। অমৃতনিস্যন্দী বাণী শ্রবণ করে। আর আনন্দকর-স্পর্শে। কঠোর পরিশ্রম ও গভীর নিষ্ঠাসহকারে সাধনা করে যে অমৃত তিনি আহরণ করেছিলেন সেই অমৃতের আনন্দধারায় শোক

দুঃখ তাপিত জীবজগৎকে শীতল করে দিয়েছিলেন। তাপিত হৃদয়ে প্রবাহিত করে দিয়েছিলেন শান্তির ধারা।

বাংলা বারোশো ছিয়াশী সালের ঝুলন পূর্ণিমার তিথিতে রাত্রি দেড় ঘটিকার সময় কুতুবপুরের ব্রাহ্মণ বাড়িতে আবির্ভূত হলেন উত্তর কালের মহাপুরুষ স্বামী নিগমানন্দ। নদীয়া জেলার মেহেরপুর মহকুমার অন্তর্গত এই কুতুবপুর গ্রাম। আর কুতুবপুরের ব্রাহ্মণবাড়ি অতিথিবৎসল বলে খুব সুনাম ছিল। গ্রামের লোকে বলতো, ব্রাহ্মণবাড়ি যখনই যাওয়া যায় তখনই অন্ন মিলে। মা অন্নপূর্ণা যে ওখানে বিরাজ করছেন। সত্য সত্যই ভুবনমোহন চট্টোপাধ্যায়ের সহধর্মিণী মানিকসুন্দরী দেবী ছিলেন দেবদ্বিজে ভক্তিপরায়ণা, অতিথিবৎসলা। বিবাহের সাত-আট বৎসরের মধ্যেও পুত্র সন্তানাদি না হওয়ায় তিনি সর্বদাই ব্রত নিয়ম পালন, গরীব দুঃখী অনাথাদের সেবা আর কার্তিকের নিত্যপূজা নিয়ে থাকতেন ব্যস্ত। কুতুব-পুরেরই নিকটে রাধাকান্তপুর নিবাসী ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তীর কন্যা এই মানিকসুন্দরী দেবী।

ত্রৈলোক্যনাথও অপুত্রক ছিলেন। উভয়কুল পুত্রশূন্য দেখে মানিকসুন্দরীদেবীর মানসিক অস্থিরতাও হয়েছিল বৃদ্ধিপ্রাপ্ত। বাহ্য পূজা ধীরে ধীরে মানসরাজ্যে পৌঁছলো। অবশেষে যেন সাধনলব্ধ ফলস্বরূপ লাভ করলেন সর্বাঙ্গসুন্দর এই পুত্রসন্তান। ব্রাহ্মণ-বাড়িতে যেন এক অলৌকিক ঘটনা হলো সংঘটিত। মাতৃগর্ভে সন্তান যতই হতে লাগলো বড় ততই নানাবিধ দিব্য অনুভূতি লাভ হতে লাগলো মানিকসুন্দরী দেবীর। হৃদয় তাঁর ভরে উঠলো দিব্যানন্দে। কর্ণগোচর হতে লাগলো স্তোত্রপাঠধ্বনি। আরতির ঘণ্টাধ্বনি। দেববন্দনা গান। মাঝে মাঝে সমস্ত ঘরটি ভরে উঠতো অনাঘ্রাত পুষ্পের সৌরভে। বিস্মিত ও অভিভূত হতেন ধর্ম-পরায়ণ সত্যনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ ভুবনমোহন ভক্তিপরায়ণা স্ত্রীর মুখনিঃসৃত দিব্য অনুভূতির কথা শ্রবণ করে।

নবজাত শিশুর আগমনে আনন্দময় হয়ে উঠলো কুতুবপুর। কুতুবপুরের ব্রাহ্মণবাড়ি। ছোট্ট শিশুর মুখপদ্ম দর্শন করে মুগ্ধ হলেন পিতামাতা। আনন্দিত হলেন গ্রামবাসীরা। দিনে দিনে শিশু বড় হয়ে ওঠে। সপ্তাহ মাস বছর ঘুরে আসে। বাপ-মা আদর করে নাম রাখলেন নলিনীকান্ত। নবজাতক নির্মল হাসির মধ্য দিয়ে ক্ষুদ্র গৃহকে করে তোলে পরিপূর্ণ। শিশুর ছদ্মবেশে আত্মগোপন করে উত্তরকালের মহাসাধক যোগীবর নিগমানন্দ মহাভাবের শৈশবলীলায় পৃথিবীর মানুষের নিকট তখনও হয়ে রইলেন অপ্রকাশ।

পিতামাতা উভয়েই দিব্যভাবের ভাবুক। এমনই এক ভগবৎ ভাবের মধ্য দিয়ে শৈশবলীলা অতিক্রান্ত হলো নলিনীকান্তের। তবে লেখাপড়া আর দৌরাত্ম্য একই ভাবে চলতে লাগলো। পাঠশালার পাঠ সমাপ্ত করে স্থানীয় পোস্টমাস্টারের নিকট ইংরাজী শিক্ষায় মনোনিবেশ করলেন। প্রতিবেশীদের গৃহে গৃহে বালক নলিনী-কান্তের দৌরাত্ম্যও দিনে দিনে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে লাগলো।

এগারো বৎসর বয়সে উপনয়ন সংস্কার সম্পন্ন হলো। আর এই উপনয়ন সংস্কারের পর হতেই বালক নলিনীকান্তের মনোজগতে শুরু হলো পরিবর্তনের। উদাস অনাসক্ত ভাব। ভাবে যেন হয়ে থাকেন বিভোর। আবার মাঝে মাঝে অদ্ভুত সব স্বপ্ন দর্শনও হয়। একটি পুষ্করিণী! চতুর্দল পদ্মে পরিপূর্ণ। মধ্যস্থলে একটি রক্তপদ। পদ্মটির চারিটি দল। প্রতি দলে একটি করে অক্ষর লেখা। সেই পদ্ম হতে উপরে উঠেছে সূক্ষ্ম একটি সূত্র। আর সেই সূত্র ধরে নলিনীকান্ত ধীরে ধীরে উপরে উঠে উপরিস্থিত একটি পদ্মের উপর আসন স্থাপন করে বসলেন। সঙ্গে সঙ্গে স্বপ্নও ভঙ্গ হয়ে গেলো। আর ঘুম হলো না। কিসের আবেশে যেন আচ্ছন্ন হয়ে রইলেন অবশিষ্ট সময়। শৈশবকাল থেকেই নলিনীকান্ত মায়ের মতই সেবাপরায়ণ হয়ে উঠলেন। দীন দুঃখী অনাথদের অন্ন ও বস্ত্র দান করে আনন্দলাভ করতেন। পিতা-মাতাও পুত্রের সেবাপরায়ণতা দেখে আনন্দিত হতেন। বাধা দিতেন

না। মাতার আদর্শই ছিল নলিনীকান্তের বাল্য ও কৈশোরের প্রেরণা। ধীরে ধীরে কিশোর নলিনীকান্ত গ্রামের নানা সামাজিক সেবামূলক কার্যের মধ্যে লিপ্ত হয়ে পড়লেন। তবে সর্বক্ষেত্রেই ধর্মের গোঁড়ামির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করতেন। হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতা আর ধর্মের গোঁড়ামি সহ্য করতে পারতেন না নলিনীকান্ত। তাইতো অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর করবার মানসে ওভারসিয়ারী পাস করেও গ্রাম্য পাঠশালায় শিক্ষকতা করেছিলেন কিছুদিন। এই সেবামূলক কর্মপ্রবণতাই উত্তরকালে তাঁকে কর্মযোগীরূপে আত্মপ্রকাশ করতে সহায়তা করেছিল।

সংসারে নলিনীকান্ত এখন আর একমাত্র সন্তান নন। আরও চারিটি পুত্রসন্তানের জননী মানিকসুন্দরী দেবী। তারাপদ, দুর্গাপদ, শ্যামাপদ ও রামপদ। দুর্গাপদ ও শ্যামপদ শৈশবেই ইহধাম পরিত্যাগ করলেন। শোককাতরা জননীও অপরিণত বয়সে দেহলীলা সংবরণ করলেন। কালো মেঘের কৃষ্ণছায়া প্রতিফলিত হলো কুতুবপুরের আনন্দপূর্ণ বামুনবাড়িতে। কয়েকটি মৃত্যু নলিনীকান্তের অন্তর্জগতে সৃষ্টি করলো আলোড়নের। তাইতো অতি অল্প বয়স থেকেই দেহের নশ্বরতা তাঁর চিন্তার বিষয় হয়ে উঠেছিল। অবশ্য সে চিন্তা বেশীদিন স্থায়ী হয়নি।

শিক্ষাজীবন সমাপ্ত হলে নলিনীকান্তের বিবাহ সংস্কারও সম্পন্ন হলো। ১৩০৪ সালে। আঠারো বৎসর বয়সে। হালিশহরের নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের রূপবতী কন্যা সুধাংশুবালা কুতুবপুরের বামুনবাড়িতে এলেন গৃহবধূ হয়ে।

কিছুদিনের মধ্যেই দিনাজপুর ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডে ওভারসিয়ারের চাকুরী গ্রহণ করলেন নলিনীকান্ত। এবং দিনাজপুর থেকেই চেষ্টা করে রাণী রাসমণি এস্টেটের সুপারভাইজার পদ প্রাপ্ত হলেন। কর্মক্ষেত্র হলো নারায়ণপুর কাছারী। নববিবাহিতা স্ত্রীকে নিয়ে এলেন। শুরু হলো দাম্পত্যজীবন। কয়েকমাস সপরিবারে বাস করে স্ত্রীকে

রেখে এলেন কুতুবপুরে। আনন্দমধুর দাম্পত্যজীবনের স্মৃতিচারণ করে দিন অতিক্রান্ত হতে লাগলো নলিনীকান্তের। সামনেই পূজা। আর কটা দিনই বা বাকী! দেশে যাবেন। মিলিত হবেন পত্নীর সঙ্গে।

তারপরই যেন কিভাবে এক মহাপ্রলয় ঘটে গেল নলিনীকান্তের জীবনে। কেন? কার ইচ্ছায় নলিনীকান্তই কি জানেন? ভোগী সংসারী নলিনীকান্ত নিজের ইচ্ছায় নয়, কার ইঙ্গিতে কোন্ শক্তির প্রেরণায় ত্যাগী সন্ন্যাসী মহাত্মা নলিনীকান্তে রূপান্তরিত হলেন।

সন্ন্যাসজীবনের পূর্বে এবং পরবর্তীকালেও চরম কঠোরতার মধ্য দিয়ে নলিনীকান্তের জীবন অতিবাহিত হয়েছে। গুরু সচ্চিদানন্দ সরস্বতীর পুষ্কর আশ্রমের দিনগুলি ছিল নলিনীকান্তের জীবনের কঠোরতম অধ্যায়। কাঠ কাটা, বাসন-মাজা, গরুর ঘাস কাটা, রান্না করা আরও কত কি। খাদ্য ছিল ভূষির রুটি আর খাট্টা। আর ছিল গুরু সচ্চিদানন্দেব অশ্লীল গালাগালি ও গঞ্জনা। ধীরে ধীরে আশ্রমের কঠোরতায় নিজেকে অভ্যস্ত করে ফেললেন নলিনীকান্ত। অসীম ধৈর্য ও সহনশীলতাই নলিনীকান্তকে সাধনাব চরম শিখরে উন্নীত করতে সহায়তা করেছিল।

আশ্রমজীবন সম্বন্ধে নলিনীকান্ত বলছেন, 'আমি সচ্চিদানন্দকে ভালবেসেছিলাম। তিনিও আমাকে ভালবাসতেন। তাই তাঁর অকথ্য অত্যাচার সহ্য করতাম। শিষ্যদের মধ্যে আমি ছিলাম ব্রহ্মচারী। সুতরাং আশ্রমজীবনের শেষের দিকে আমাকেই রন্ধন করতে হতো। একদিন উনুনে হাঁড়ি চাপিয়ে দিয়ে অন্তরাল হতে তাঁর ব্রহ্মজ্যোতির্বিভাসিত মুখের দিকে অনিমেষলোচন তাকিয়ে বসে আছি। ভুলে গেছি রান্নার কথা। এদিকে ভাত পুড়ে গন্ধ বের হয়েছে।

তারপর আর কি। শুরু হলো গুরুজীর অকথ্য গালাগালি। তবে গুরুজী আমায় যেমন অকথ্য ভাষায় গাল দিতেন তেমনি আবার

খুব আদরও করতেন। এমন ব্রহ্মজ্ঞানী বৈদান্তিক, জ্ঞানসাধনায় সিদ্ধপুরুষ আর দেখলাম না।'

আশ্রমজীবনের কঠোরতার মধ্যে পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন নলিনীকান্তের প্রবীণ গুরুভাই ব্রহ্মানন্দ। তিনি নানাভাবে প্রবোধ দিয়ে সান্ত্বনা দিতেন নবীন সাধক নলিনীকান্তকে। মাঝে মাঝে বলতেন—'দেখ ভাই, সন্ন্যাস নিতে তুমি এখানে এসেছ, এ হচ্ছে জীবের জীবত্বের অবসান ঘটানো। গুরুদেবের এত শাসন গালাগালি সবকিছুরই উদ্দেশ্য তাই। নির্যাতন ও কঠোর পরীক্ষার, মান-অভিমানের সংস্কার তিনি সামূলে উৎপাটন করতেই তো চাচ্ছেন। সহ্য করো। ধীরে ধীরে বুঝতে পারবে গুরুদেব তোমাকে কি গভীর ভাবেই না ভালবাসেন।'

সত্য সত্যই সচ্চিদানন্দ সরস্বতী নলিনীকান্তের সহনশীলতায় মুগ্ধ হয়ে কিছুদিনের মধ্যেই তার সঙ্গে স্নেহার্দ্র কণ্ঠে কথা বলতে শুরু করলেন। হিন্দু দর্শনশাস্ত্র পাঠের ব্যবস্থা করে দিলেন। বেদান্তোক্ত সাধন চতুষ্টয়ের সাধনাদি করবারও অনুপ্রেরণা দিতে লাগলেন। এবং নলিনীকান্তও লক্ষ্য করলেন আশ্রমজীবনের কঠোরতায় যত বেশী অভ্যস্ত হয়ে উঠছেন ততই যেন সচ্চিদানন্দের রুক্ষতা কমে যাচ্ছে। পূর্বের সে রুদ্রমূর্তিও আর নেই। সিদ্ধ মহাপুরুষের সেই করুণাময় কল্যাণময় রূপটি যেন তার চোখের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে। সচ্চিদানন্দ সরস্বতী শুষ্ক বৈদান্তিক নন, যেন প্রাণচাঞ্চল্যময় কোমল প্রাণ এক দেবমানব। মহামানব। মহাপুরুষ সচ্চিদানন্দ সরস্বতী।

সে অনেকদিনের কথা। ইংরেজের সঙ্গে সংঘর্ষ বেধেছে কাবুলের। ভারতীয় সেনাবাহিনী নিয়ে অভিযান পরিচালনা করছেন লর্ড অকল্যাণ্ড। পেশোয়ারের অদূরে পড়েছে সেনাদলের ছাউনি। চারিদিকে সতর্ক পাহারা। প্রতিরক্ষার সুব্যবস্থা। তখন পাহাড়ের গায়ে সমতলভূমিতে সান্ধ্য অন্ধকার এসেছে নেমে। এক হাবিলদার অকস্মাৎ দেখলেন দূর পাহাড় হতে একটি আলোকবর্তিকা। কে যেন আন্দো-

লিত করছে। এই জনমানবশূন্য নির্জন পাহাড়ে শত্রুপক্ষের লোক ছাড়া আর কে হতে পারে? সমস্ত ছাউনিতে পড়ে গেল চাঞ্চল্য। অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে কয়েকজন সঙ্গীসহ ভারতীয় হাবিলদার রওনা হলেন আলোকবর্তিকার অনুসন্ধানে। কিন্তু নিকটবর্তী হয়ে কিছুই দেখতে পেলেন না। সবকিছুই যেন কোন্ রহস্যলোকে হয়ে গেল অন্তর্ধান। আলেয়া মনে করে ফিরে এলেন। পরদিন সান্ধ্য অন্ধকারে আবার সেই আলোকবর্তিকা হাবিলদারের দৃষ্টির সম্মুখে হয়ে উঠলো উদ্ভাসিত। কিসের আকর্ষণে যেন হাবিলদারের দেহমন চঞ্চল হয়ে উঠলো। তিনি একাকীই বন্দুক ঘাড়ে করে যাত্রা করলেন রহস্যালোকের রহস্য উদ্‌ঘাটন করবার মানসে। এবারে আর আলোকবর্তিকাটি অদৃশ্য হলো না। কিছু সময় পর নির্দিষ্টস্থানে এসে পৌঁছলেন। বিস্মিত ও অভিভূত হয়ে দেখলেন জটাজুটশোভিত শুভ্রকান্তি এক মহাপুরুষ। হাতে আলোকবর্তিকা নিয়ে যেন তারই অপেক্ষায় দণ্ডায়মান রয়েছেন। প্রথম দর্শনেই হাবিলদার তার সমস্ত শক্তি হারিয়ে অসহায়ের মত মহাপুরুষের পায়ে মাথা লুটিয়ে প্রণাম করলেন। সহাস্যবদনে মহাপুরুষ বললেন—'এসো বেটা। আমি তোমাকেই ডাকছি। তোমাকে একাকী এই পর্বতগুহায় আনবার জন্যই আমার এই আলোকসঙ্কেত। আমি জরাগ্রস্ত। মরদেহ ত্যাগ করবো। তার পূর্বে তোমাকে সন্ন্যাসীর দীক্ষা দিয়ে যাবো। তোমাকে সৈনিকবৃত্তি এখনই ত্যাগ করতে হবে।'

পাহাড়ের উপরে এক সমতল স্থানে গুহাটি অবস্থিত। গুহার সম্মুখভাগ ফলফুলশোভিত তরুরাজিদ্বারা সুশোভিত। পাশেই একটি স্নিগ্ধ ঝরণার সুশীতল জলস্রোত প্রবাহাকারে বয়ে চলেছে। অদূরে নানা ভঙ্গীতে গিরিশৃঙ্গসমূহ মস্তক উত্তোলন করে দণ্ডায়মান। এমনই এক পরিবেশে হতবাক্ হয়ে হাবিলদার যোগীবরের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। প্রত্যুত্তর করবার ভাষাও পেলেন না খুঁজে। যোগীবরের আদেশ মাথা পেতে বরণ করে নেবার জন্যই যেন তিনি

ছাউনি থেকে রাত্রির অন্ধকারে একাকী এসেছেন ছুটে। এই হাবিলদার—সৈনিক হলেন উত্তরকালের সিদ্ধ যোগী সচ্চিদানন্দ সরস্বতী। স্বামী নিগমানন্দ পরমহংসের দীক্ষাগুরু।

১৩০৯ সালের ১১ই ভাদ্র সন্ন্যাসীর দীক্ষা গ্রহণ করলেন নলিনী-কান্ত। তারপর এক শুভদিনে গুরু সমভিব্যাহারে তীর্থ পরিক্রমায় হলেন বহির্গত। গুরু শিষ্য চলেছেন বদ্রিকাশ্রমের পথে। পুষ্কর থেকে এলেন মুসৌরীতে। মুসৌরী থেকে আবার পথপরিক্রমা হলো শুরু। পথ দুর্গম, পাহাড়-জঙ্গলে পূর্ণ। কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নেই। অনির্বচনীয় আনন্দে বিভোর হয়ে পথ চলেছেন তরুণ সন্ন্যাসী নিগমানন্দ।

অবশেষে হিমালয়ের দুর্গম পথ অতিক্রম করে গুরু শিষ্য এসে উপস্থিত হলেন চির-তুহিনাবৃত পরম পবিত্র ভূমি বদরিকাশ্রমে। বদরিকাশ্রমের নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দর্শন করে মুগ্ধ হলেন নবীন সন্ন্যাসী। হৃদয়তন্ত্রীতে এক অপূর্ব রাগিণী যেন উঠলো বেজে। ধ্যানমগ্ন হলেন যোগীবর। 'অব্যক্ত, অচিন্ত্য, অনির্বচনীয় অবস্থা।'

আবার যাত্রা হলো শুরু। ভিন্ন পথে। মানসসরোবর অভি-মুখে। দুর্গম বনাকীর্ণ পথ। হিমালয়ের নির্জন অরণ্যানী শৈলমালা ঝরণার উপলাকীর্ণ তীর আর বিচিত্র সব বন্যপুষ্পের শোভা মানুষের মনকে করে তোলে উদাস। নবীন সন্ন্যাসী নিগমানন্দের মনেও সৃষ্টি হলো উদাস চিন্তার। সাধনার লীলাভূমি হিমালয়ের পথ পরিক্রমা সাঙ্গ করে গুরু সচ্চিদানন্দ আর শিষ্য নিগমানন্দ অবশেষে এসে উপস্থিত হলেন মানসসরোবরে। প্রকৃতির অপরূপ বিস্ময় সিদ্ধভূমি মানসসরোবরে এসে নবীন সন্ন্যাসী নিগমানন্দ অব্যক্ত অনির্বচনীয়ভাবে হলেন বিভোর। অমৃতের আনন্দধারায় যেন তাঁর দেহমন হয়ে উঠলো প্লাবিত।

এই পবিত্র ভূমিতেই নিগমানন্দ কঠোর যোগসাধনায় নিমগ্ন হলেন গুরুর নির্দেশে।

তারপর এক শুভদিনে আবার যাত্রা হলো পুষ্কর আশ্রম অভিমুখে। এবং এই উত্তরাখণ্ড পরিক্রমার সময়ই হিমাদ্রির নিভৃত নিলয়ে পরম যোগিনী গৌরীমার সঙ্গে পরিচিত হলেন তরুণ সন্ন্যাসী নিগমানন্দ। সন্ন্যাসিনী গৌরীমা নিগমানন্দের দিকে দৃষ্টিপাত করেই সচ্চিদানন্দ সরস্বতীকে বললেন,—'তোমরা এই শিষ্যটি যেদিন উচ্চ-তম সাধনার স্তরে এসে যাবে সেদিন আমার কাছে পাঠিয়ে দিও।'

পুষ্কর আশ্রমে পৌঁছে কিছুদিন বিশ্রাম নিয়ে আবার তীর্থ পর্যটনে বহির্গত হলেন নিগমানন্দ। গুরুর নির্দেশে একাকীই যাত্রা করলেন। শ্রীক্ষেত্র ও দক্ষিণাপথের সমুদয় তীর্থস্থান পরিভ্রমণ করে উপনীত হলেন রামেশ্বরধামে। শ্রীরামচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত বলে দেবতার নাম রামেশ্বর মহাদেব। রামেশ্বরের মন্দির যেমন বিরাট তেমনই সুদৃশ্য। স্থাপত্যকলাও অপূর্ব। দাক্ষিণাত্যের অপূর্ব কারুকলা শ্রীমণ্ডিত প্রাচীন বিশাল মন্দির আর দেববিগ্রহ দর্শন করে মুগ্ধ ও অভিভূত হলেন নিগমানন্দ। হৃদয়মন আনন্দে আপ্লুত হলো। অবশেষে রামেশ্বর থেকে পদব্রজে ভারতের পশ্চিম সাগরের উপকূল দিয়ে দ্বারকাধামের পথে হলেন অগ্রসর। দ্বারকায় এসে উঠলেন সারদামঠে। এখানে এক বিচিত্র ঘটনার সম্মুখীন হলেন তরুণ সন্ন্যাসী।

মঠে কোন মোহন্ত নেই। এক বৃদ্ধা যোগিনীর হাতে মঠের কর্মভার ন্যস্ত। অল্পদিনের মধ্যেই নিগমানন্দ বৃদ্ধা যোগিনীর স্নেহ-পাত্র হয়ে উঠলেন। এবং নবীন সন্ন্যাসী নিগমানন্দকেই মঠের মোহন্তের পদে অভিষিক্ত করবেন বলে স্থির করলেন মাতৃস্বরূপা সেই বৃদ্ধা।

ইতিমধ্যে অকস্মাৎ একদিন আবির্ভাব হলো ত্রিশূলধারিণী এক ভৈরবীর। পূর্ণ যৌবনা অপরূপা। বাঙালী রমণী। পূর্বাশ্রমের নিবাস যশোহর জেলায়। প্রিয়দর্শন নবীন সন্ন্যাসী নিগমানন্দকে দর্শন করেই মুগ্ধ হলেন যুবতী তাপসিকা। নানাভাবে প্রলুব্ধ করতে

লাগলেন। নিগমানন্দও ভৈরবীর যৌবন-বিধুর দেহের দিকে তাকিয়ে হলেন বিচলিত। মঠের বৃদ্ধা সন্ন্যাসিনীর মধ্যস্থতায় বিবাহের দিনও স্থির হলো। শৈব বিবাহ। নিগমানন্দও মনে মনে ভাবলেন মঠের মোহন্ত ত মনোনীত হয়েছেন, তার উপর ভৈরবীকে সহধর্মিণীরূপে গ্রহণ করে নূতনভাবে ধর্মাচরণ করাতেই বা ক্ষতি কি ? এখন থেকে দিবসের কল্পনায় আর নিশীথের স্বপ্নে রূপবতী ভৈরবীকেই দেখেন তিনি।

বিবাহের পূর্বদিন গভীর নিশীথে বিচিত্র এক স্বপ্ন দেখলেন সাধক নিগমানন্দ।

উৎসব জেগেছে শত শত দীপের আলোকে, বাঁশির মধুর স্বরে আর পুষ্পসজ্জার সমারোহে। বিবাহের লগ্ন এগিয়ে আসছে। নানা অলংকারে, মাল্যে, চন্দনে আর তিলকে আরও সুন্দর হয়ে বসে আছে রূপবতী মেয়ে ভৈরবী, একটি সোনার পিঁড়ির উপর। স্তবকিত মেঘমালার মত কমনীয় কান্তি নিয়ে। পুরোহিতও প্রস্তুত হয়ে আছেন। বরবেশে নববধূর পাশে এসে বসলেন নিগমানন্দ স্বয়ং। কিন্তু কিসের এক বেদনায় এই শুভলগ্নেও নিগমানন্দের মন হয়ে উঠলো বিচলিত। অকস্মাৎ দেখলেন নববধূ নয়, পার্শ্বে বসে স্বয়ং গুরুদেব। তীব্র কঠিন চোখের দৃষ্টি। তারপর সে মূর্তিও অন্তর্হিত হলো। পরমুহূর্তেই শুনতে পেলেন—গুরু মহারাজ সচ্চিদানন্দের সাড়ে চার সের ওজনের চিম্‌টার আওয়াজ। আর রুক্ষ স্বরের কণ্ঠ-ধ্বনি। কোথায় মিলিয়ে গেল বাঁশির সুমধুর স্বরধ্বনি। আবার দেখতে পেলেন রূপবতী ভৈরবীর দেহটি এতকাল মাখনের মত গলে গলে মাটিতে পড়ছে। তার পরই কঙ্কাল মূর্তিটি তাঁর দৃষ্টির সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। এবং সেই বীভৎস নরকঙ্কাল দুই হাত প্রসারিত করে যুবক নিগমানন্দকে আলিঙ্গন করবার জন্য অগ্রসর হচ্ছে।

ঘৃণামিশ্রিত ভয়ে চীৎকার করে উঠলেন নিগমানন্দ। অকস্মাৎ

ঘুম ভেঙে গেল। সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানচক্ষুও উন্মীলিত হলো তাঁর। আর এক মুহূর্তও দেরি না করে লোটা কম্বল নিয়ে ছুটে বেরিয়ে এলেন মঠ থেকে সেই নিশীথ রাত্রিতে। এইভাবে সন্ন্যাসীজীবনের সেই চরম বিপদের মুহূর্তটিও গুরু কৃপাবলে অতিক্রম করলেন সাধক নিগমানন্দ।

উত্তরকালে স্বামী নিগমানন্দ বলেন, 'সদ্‌গুরু অনেক সময় স্বপ্নের মধ্য দিয়েই আশ্রিত শিষ্যকে দিক্‌নির্দেশ করে দেন। প্রকৃত কল্যাণের পথে চালিত করেন।'

আবার ফিরে এলেন পুষ্কর আশ্রমে গুরুর পদতলে সাধক নিগমানন্দ। গুরু সচ্চিদানন্দ সস্নেহে ডেকে বললেন, 'বেটা, আমার কাছ থেকে যা হবার তা তো তোর হয়ে গেছে। তোকে এবার পঞ্চকোষ বিবেকী কোন যোগী গুরুর অনুসন্ধান করে যোগ সাধনা করতে হবে।'

গুরু সচ্চিদানন্দের নিকট থেকে বিদায় নিয়ে আবার যোগী গুরু অনুসন্ধানে দেশ হতে দেশান্তরে পরিভ্রমণ করতে লাগলেন নিগমানন্দ। জামনগর, সাতবেল, সক্কর প্রভৃতি দেশের মধ্য দিয়ে করাচীতে এসে পৌঁছলেন। করাচী থেকে মরুতীর্থ হিংলাজের পথে যাত্রা করলেন। হিংলাজে দেবীর ব্রহ্মরন্ধ্র পতিত হয়েছিল। সমাধি অবস্থায় সে জ্যোতির্দর্শন হয়, এখানকার কূপ মধ্যে সেই রকম স্নিগ্ধ জ্যোতি দেখা যায়। কাবুল সীমান্তে এই পীঠস্থানে হিন্দু-মুসলমান-ফকির সকলেই আসেন। মহাতীর্থ হিংলাজ দর্শন করে, রাজপুতনার বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করতে লাগলেন। কোটা রাজ্যের এক অরণ্য অঞ্চল দিয়ে পথ চলছেন নিগমানন্দ। ধীরে ধীরে নেমে আসে সন্ধ্যার অন্ধকার। সারাদিন আহার জোটেনি। ক্ষুধায় কাতর যোগীবর। অকস্মাৎ এক পথচারিণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো। তিনি সস্নেহে বললেন,—'আরও কিছু পথ গেলে একটি ছোট কুটির দেখতে পাবে। আজ সেইখানেই বিশ্রাম নিও।' কিছুদূর অগ্রসর হয়ে

সত্যি সত্যই দেখতে পেলেন এক পর্ণকুটির। আর সেই পর্ণকুটির আলো করে বসে রয়েছেন একজন রূপসী রমণী। দুরধিগম্য অরণ্যানী প্রদেশে একাকী রমণীকে বিজন কুটিরে দেখে সাধক নিগমানন্দ কম বিস্মিত হননি। পরবর্তীকালে জানতে পেরেছিলেন, ইনি সামান্যা রমণী নন। যোগসিদ্ধা সন্ন্যাসিনী। বয়স ষাটেরও উপর। মাতৃরূপিণী সেই সন্ন্যাসিনীর সেবাশুশ্রূষায় সাধক নিগমানন্দের ক্ষুৎপিপাসা দূর হয়েছিল। অবশেষে যোগিনীর সহায়তায় ও নির্দেশে ফিরে এলেন কলকাতায়। এসে উঠলেন বড়বাজারের এক ধর্মশালায়। একদিন শুনলেন অ্যানি বেসান্ত কৃষ্ণনগরে বক্তৃতা করবেন পরলোকতত্ত্ব সম্বন্ধে। নিগমানন্দও কৃষ্ণনগরে চলে এলেন। উঠলেন স্থানীয় উকিল পরমেশ্বর লাহিড়ীর গৃহে। তারপর অ্যানি বেসান্তের সঙ্গে যোগাযোগ করে পরলোকতত্ত্ব সম্বন্ধে গভীর চিন্তাপূর্ণ আলোচনা করলেন। যোগীবর পরলোক সম্বন্ধে যেন নূতনভাবে আলোকপাত করলেন। কৃষ্ণনগরে বাঙালী সাধু নিগমানন্দের নাম ছড়িয়ে পড়লো। লোকসমাগম হতে লাগলো। কিন্তু নিগমানন্দ তখনও পর্যন্ত গুপ্তভাবে যোগসাধনায় মগ্ন আছেন। আত্মপ্রকাশের তখনও যে সময় হয়নি। তাইতো অকস্মাৎ একদিন কৃষ্ণনগর ছেড়ে রওনা হলেন সুদূর আসামের পথে। কামাখ্যা দর্শন অভিলাষে। যোনিপীঠ কামাখ্যা। শক্তিসাধকের লীলাভূমি। পুণ্যভূমি কামাখ্যা দর্শন করে একদল সাধুর সঙ্গে পরশুরাম কুণ্ডের দিকে রওনা হলেন। ব্রহ্মপুত্রের তীরে তীরে পথ। বনাকীর্ণ শ্বাপদসঙ্কুল দুর্গম পথ অতিক্রম করে উপনীত হলেন পরশুরাম কুণ্ডে। স্নান ও দর্শনাদি করে আবার যাত্রা করলেন দুর্গম পথে। অকস্মাৎ পথিমধ্যে কঠিন আমাশয় রোগে আক্রান্ত হলেন। সঙ্গী সাধুরা তাঁকে পরিত্যাগ করে চলে গেলেন। নিগমানন্দ ব্রহ্মকুণ্ডের অনতিদূরে পার্বত্যজাতির এক বস্তিতে এসে নিলেন আশ্রয়। তাদের সেবা ও শুশ্রূষায় এক মাসের মধ্যেই সুস্থ হয়ে উঠলেন।

সুস্থদেহে নিগমানন্দ আবার শুরু করলেন পথপরিক্রমা। অরণ্য-প্রদেশের অবর্ণনীয় শোভা দেখতে দেখতে পথ চলেছেন। অতুলনীয় বনসৌন্দর্য তাঁর মনকে করে তুললো উদাস। অনির্বচনীয়ভাবে বিভোর হয়ে চলতে চলতে পথ হারিয়ে ফেললেন। শ্বাপদসঙ্কুল গভীর সেই অরণ্যে ধীরে ধীরে ঘনিয়ে এলো রাত্রির অন্ধকার। উপায়ান্তর না দেখে এক উচ্চ বৃক্ষকোটরে আশ্রয় নিলেন পথিক নিগমানন্দ।

আবার সেই রাত্রির হলো অবসান। প্রভাতসূর্যের স্বর্ণকিরণ এসে পড়ে প্রকৃতির সেই অপূর্ব নিভৃত সৌন্দর্যভূমিতে। বৃক্ষকোটর হতে নিগমানন্দ বিস্মিত হয়ে দেখেন এক অভাবনীয় দৃশ্য। এক শুভ্রকান্তি দীর্ঘাকৃতি সন্ন্যাসী তাঁরই বৃক্ষটির নিম্নে ধুনি জ্বেলে বসে নিবিষ্ট মনে গাঁজা সাজছেন। প্রথম দর্শনেই মনে হয় একজন মহাপুরুষ। কে এই মহাপুরুষ? তিনি যে গুরুর অনুসন্ধান করছেন ইনিই কি সেই যোগীগুরু? বিস্ময় ও কৌতূহল নিয়ে বৃক্ষ হতে অবতরণ করলেন নিগমানন্দ।

আরও বিস্মিত হয়ে দেখলেন কোনও দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই যোগীবরের। যেন ধ্যানমগ্ন। নীরবে গাঁজার কল্‌কেতে কয়েকটি টান দিয়ে গম্ভীরভাবে হস্ত প্রসারিত করে নিগমানন্দের সম্মুখে ধরলেন। ঠিক যেন গুরু প্রসাদ করে দিলেন শিষ্যকে। নিগমানন্দের প্রত্যাখ্যান করবারও সাহস হলো না। যন্ত্রচালিতের মত কল্‌কেটি হাতে নিয়ে প্রসাদ গ্রহণ করে আবার ফিরিয়ে দিলেন সেই অপরিচিত মহাপুরুষকে।

এবারে যোগীবরের যেন ধ্যান ভঙ্গ হলো। ধুনির আগুন নিভিয়ে উঠে দাঁড়ালেন এবং ইঙ্গিতে অনুসরণ করতে বললেন নিগমানন্দকে। মন্ত্রমুগ্ধের মত অনুসরণ করলেন তরুণ সন্ন্যাসী সেই মহাপুরুষকে। কিছু সময় পথ চলার পর একটি ক্ষুদ্র পাহাড়ের সামনে এসে থামলেন যোগীবর। নিকটেই একটি স্নিগ্ধ ঝরণার সুশীতল জলস্রোত প্রবাহা-

কারে বয়ে চলেছে। প্রাকৃতিক পরিবেশটিও মনোরম। প্রকৃতির এই নিভৃত সৌন্দর্যভূমিতে মহাপুরুষকে দর্শন করে আর তাঁর সান্নিধ্য লাভ করে মুগ্ধ ও অভিভূত হলেন তরুণ সন্ন্যাসী নিগমানন্দ।

নিগমানন্দের ভাষায়, 'এখানে এসে তিনি আমার দিকে তাকালেন। কি সুন্দর মূর্তি! উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, বিশাল বক্ষস্থল, প্রশস্ত ললাট, ঘনকৃষ্ণ ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, লম্বা আকর্ণ বিস্তৃত চোখ। চোখে মুখে যেন জ্যোতির ছটা বেরুচ্ছে। দেখে বিস্মিত ও আনন্দিত হলাম, মনপ্রাণ ভক্তিতে আপ্লুত হলো। কখন জানি না কেমন করে আপনা হতে শরীর তাঁর চরণে লুটিয়ে পড়লো।······তিনি আমায় সস্নেহে হাত ধরে উঠিয়ে মধুর স্বরে বললেন, 'বৎস, সহসা রাত্রি শেষে আমাকে গাছতলায় দেখে আর তোমাকে আমার সঙ্গে আসতে বলায়, বোধহয় আশ্চর্যান্বিত হয়েছ, ভয়ও পেয়েছ! আমি কিন্তু আগেই জেনেছিলাম তুমি কে? কি জন্য ঘুরছো, তোমার অভাব কি, —কি জন্য গাছের ওপর ছিলে! আমার কাছেই তোমার মনোবাসনা সিদ্ধ হবে তাই তোমাকে নিয়ে আসবার জন্য আমি ঐ গাছতলায় গিয়ে বসেছিলাম।'

স্বামী নিগমানন্দ জানলেন চিনলেন তাঁর ঈশ্বরনির্দিষ্ট যোগীগুরু সুমেরু দাস মহারাজকে। আর অলৌকিকভাবে যোগাযোগের কথা চিন্তা করে অভিভূত হলেন।

পাহাড়ের উপর আরও খানিকটা উঠে গিয়ে একটি মনোরম উপত্যকায় এসে উপস্থিত হলেন। এবারে মহাপুরুষ একটি বিশেষ স্থানে এসে থামলেন এবং কৌশলে একটি প্রস্তরখণ্ড সরালেন। দেখা গেল একটি গহ্বর। গুপ্ত গহ্বর। উভয়ে প্রবেশ করলেন সেই গুহাভ্যন্তরে। নিগমানন্দ দেখলেন অভ্যন্তরে দুইটি প্রকোষ্ঠ। একটিতে দণ্ড, কমণ্ডলু ও দুইটি আসন রক্ষিত। অপরটিতে স্তরে স্তরে সাজানো তালপত্রে লিখিত অসংখ্য পুঁথি। নিগমানন্দ আরও শুনলেন গুরুপরম্পরায় এগুলি প্রাপ্ত হয়েছেন সুমেরুদাস মহারাজ।

যোগীবর সুমেরুদাস মহারাজের পূর্বাশ্রমের বাস পাঞ্জাবে। মহারাজ রণজিৎ সিংহের সভাসদ ছিলেন। এক সময়ে প্রিন্স দলীপ সিংহের সঙ্গে তিনি ইংল্যাণ্ড গমন করেন। কোনও কারণে তাঁর প্রতি বিরক্ত হয়ে সুমেরুদাস দলীপ সিংহের সঙ্গ ত্যাগ করে একাকী দেশ পর্যটনে বহির্গত হন। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত পরিভ্রমণ করে তিব্বতে আসেন। এবং এই তিব্বতেই এক সিদ্ধযোগীর কৃপাদৃষ্টি তাঁর উপর পতিত হয় এবং তাঁর জীবনে আমূল পরিবর্তন ঘটে যায়। সাধনার জীবন হয় শুরু। উত্তরকালে তিনি তাঁর সাধনালব্ধ ফল তরুণ সন্ন্যাসী নিগমানন্দকে দিয়ে যেতে চান। তাইতো দিনের পর দিন ধরে গূঢ় সাধনপ্রণালী শিক্ষা দিতে লাগলেন তরুণ সন্ন্যাসী নিগমানন্দকে। সুদীর্ঘ তিন মাস ধরে চললো যোগশাস্ত্র পাঠ আর যৌগিক প্রক্রিয়ার শিক্ষানবিশি যোগীগুরু সুমেরুদাসের নিকট। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই প্রতিভাধর সাধক নিগমানন্দ সব কিছুই আয়ত্ত করে ফেললেন।

অবশেষে একদিন সন্তুষ্টচিত্তে মহাপুরুষ নিগমানন্দকে সস্নেহে বললেন,—'বেটা, এখন তুই লোকালয়ে গিয়ে রাজযোগ সাধনায় রত হয়ে পড়। এ সাধনায় ঘি-দুধ খেতে হয়। পুষ্টিকর আহার্য না হলে চলে না। এর জন্য প্রয়োজন লোকালয় আর গৃহী ভক্তের সহায়তা। তা না হলে কাজ হবে না। এখানকার জঙ্গলের কচুসেদ্ধ খেয়ে এ যোগসাধন হয় না বেটা।'

অবশেষে এক শুভদিনে গুরু সুমেরুদাসের নির্দেশে নিগমানন্দ মেদিনীপুরের পথে-যাত্রা করালন। মেদিনীপুর জেলার হরিপুর গ্রামের এক দেবালয়ে এসে নিলেন আশ্রয়। এখানেও এক বিচিত্র অলৌকিক ঘটনা ঘটলো।

প্রত্যুষেই এক সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক ব্যাকুল হয়ে ছুটে এসে নিগমানন্দের চরণধূলি মাথায় নিয়ে বললেন, চলুন আমার সঙ্গে। আমার গৃহে। আপনিই সেই সন্ন্যাসী। তারপর বললেন স্বপ্নবৃত্তান্ত।

রাত্রিতে স্বপ্ন দেখেছেন, দীর্ঘকায় গৌরকান্তি এক মহাপুরুষ বলছেন, —'তোদের দেবালয়ে এক সাধু রাত্রি যাপন করছে। যোগসাধনার জন্য তার সাহায্যের প্রয়োজন। তুই যথাসম্ভব সাহায্য কর। তোর কল্যাণে হবে।'

নিগমানন্দ মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন। বুঝলেন গুরু সুমেরু-দাসই এই অলৌকিক লীলা করেছেন।

এই সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক হলেন সারদাপ্রসাদ মজুমদার। সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ। দেবদ্বিজে ভক্তিপরায়ণ। অর্থবান মানুষ। হরিপুর গ্রামের জমিদার। সারদাপ্রসাদ গৃহের পশ্চাতের বাগানে কুটির নির্মাণ করে দিলেন। এবং যোগসাধনার প্রয়োজনীয় উপকরণাদিরও ব্যবস্থা করে দিলেন।

নিগমানন্দও নিবিষ্ট মনে যোগসাধনায় মনোনিবেশ করলেন। কিন্তু গুপ্তভাবে বেশীদিন থাকতে পারলেন না। দিনে দিনে নবাগত সন্ন্যাসীর আগমনবার্তা চতুর্দিকে প্রচারিত হয়ে পড়লো। লোক সমাগম হতে লাগলো। গুপ্তভাবে সাধনার বিঘ্ন সৃষ্টি হলো। অকস্মাৎ একদিন হরিপুর গ্রাম ছেড়ে আসামের পথে রওনা হলেন। যোগীবর। আসামের বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করে কামাখ্যা যাওয়ার মানসে। গৌহাটী শহরে এসে উপস্থিত হলেন। রাস্তা থেকে এক সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক গৃহে আমন্ত্রণ করলেন। এবং আধ্যাত্মিক আলোচনার মধ্য দিয়ে তরুণ সন্ন্যাসীর শাস্ত্রজ্ঞানের পাণ্ডিত্য ও অনুভূতিলব্ধ জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ ও অভিভূত হলেন। ইনিই হলেন উত্তর-কালের ভক্ত শিষ্য যজ্ঞেশ্বর বিশ্বাস। গৌহাটীর অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার। সাদরে স্থান দিলেন স্বামী নিগমানন্দকে আপন আলয়ে। ভক্তিমতী স্ত্রী সরযূদেবীও সেবাযত্ন করতে লাগলেন। সন্ন্যাসী নিগমানন্দকে। গুপ্তভাবে থেকে রাজযোগ সাধনায় মনো-নিবেশ করলেন নিগমানন্দ। এবং অতি দ্রুত তাঁর সর্বাভীষ্ট সিদ্ধি লাভ হলো। ধীরে ধীরে যোগীবর আনন্দময় কোষে উপনীত হলেন।

এক তন্ময়ভাবে হলেন মগ্ন। মনের সকল রুদ্ধ দুয়ার গেল খুলে। আনন্দ আনন্দ আর আনন্দ। এ বিশ্বভুবন আনন্দময়। সমস্ত জগৎটা যেন কি এক আনন্দে পূর্ণ ও চৈতন্যময়। সে আনন্দের শেষ নেই। সীমাহীন অপার আনন্দ। সে আনন্দের ছটায় চারিদিক উদ্ভাসিত। নিশ্চল। নির্বিকল্প। নিরঞ্জন। সাতদিন এইভাবে সমাধিস্থ হয়ে রইলেন সাধক নিগমানন্দ। রাজযোগের চরমাবস্থায় পরমাত্মদর্শন ও পরমাত্মার সঙ্গে যোগাত্মা হয়ে রইলেন।

যোগীবরের এই অনির্বচনীয় মূর্তি নয়নগোচর করে মুগ্ধ বিস্মিত ও অভিভূত হলেন যজ্ঞেশ্বরবাবু ও স্ত্রী সরযু দেবী।

স্বামী নিগমানন্দ বলেন, 'সাধনা সম্পূর্ণ বহিঃসম্বন্ধশূন্য ও আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াদি বর্জিত হলে ভিতরের শক্তি অতি দ্রুত জাগ্রত হয়।

বাহির হতে কোন শক্তি আসবে না। অন্তরেই শক্তি। সাধনার দ্বারা ভিতরের শক্তিকে জাগ্রত করা। আনন্দের উৎস যে ভিতরে। ভগবানের সাড়াও হৃদয়ের ভিতর দিয়ে'।

সিদ্ধমনোরথ হয়ে নূতন জগতের আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে স্বামী নিগমানন্দ গৌহাটী থেকে যাত্রা করলেন এলাহাবাদের পথে। সাধু সম্মেলনে। কুম্ভমেলা উপলক্ষে। মেলাক্ষেত্রে পৌঁছে দীক্ষাগুরু সচ্চিদানন্দ মহারাজের দর্শনলাভের জন্য ব্যাকুল হলেন নিগমানন্দ। এক প্রান্তে দেখলেন বৈদান্তিক সাধুদের মেলা বসেছে। অসংখ্য সাধু জমায়েত হয়ে ধর্মালোচনা করছেন শৃঙ্গেরী মঠের মোহন্ত জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্যকে ঘিরে। সচ্চিদানন্দ মহারাজও সেখানে সমাসীন। অনেক দিন পর গুরুকে পেয়ে আকুল হয়ে ছুটে গিয়ে গুরুর চরণধূলি মাথায় নিলেন। তারপর শঙ্করাচার্যকেও সশ্রদ্ধভাবে প্রণাম করলেন। অকস্মাৎ অভাবনীয় এই ত্রুটিপূর্ণ দৃশ্য নয়নগোচর করে অন্যান্য সাধুরা রুষ্ট হলেন কারণ প্রথমে জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্যকে সম্মান না দেখানো অন্যায়সূচক কার্য বলে তাঁরা মনে করলেন। এবং বাদানুবাদের সৃষ্টি হলো। তখন নির্ভীক তরুণ সন্ন্যাসী নিগমানন্দ যুক্তিপূ

শাস্ত্র বাক্য দ্বারা অন্যান্য রুষ্ট সাধুদের যুক্তিকে খণ্ডন করলেন। নিগমানন্দ বললেন,

মন্নাথঃ শ্রীজগন্নাথো মদ্‌গুরুঃ শ্রীজগদ্‌গুরুঃ।
মদাত্মা সর্বভূতাত্মা তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ॥

মোহন্তজী আর তাঁর গুরু এবং পরমাত্মা সবই তো অভেদ। যদি অভেদ না হয় 'অনবস্থা' দোষ এসে পড়ে। অদ্বৈতবাদ নষ্ট হয়ে যায়।

জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্য তরুণ সন্ন্যাসীর যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা শ্রবণ করে সন্তুষ্ট হলেন। এবং আধ্যাত্মিক আরও কয়েকটি প্রশ্ন করে সদ্ উত্তর পেয়ে মুগ্ধ হলেন। অবশেষে সচ্চিদানন্দ মহারাজকে বললেন, 'এ বাচ্চা পরমহংস, কাহে এস্‌কো দণ্ডী রাখা হ্যায়।' এ তো পরমহংস হওয়ার উপযুক্ত একে দণ্ডী সন্ন্যাসী করে রেখেছো কেন?

অবশেষে প্রয়াগের মহাতীর্থে গুরু সচ্চিদানন্দের নির্দেশে দণ্ডী জলে নিক্ষেপ করলেন। স্বামী নিগমানন্দ হলেন, স্বামী নিগমানন্দ পরমহংস। গুরু সচ্চিদানন্দ পুষ্কর আশ্রমের মোহন্তের পদে অভিষিক্ত করবার ইচ্ছাও জানালেন। কিন্তু গুরুর ইচ্ছা পূর্ণ করতে সম্মত হলেন না নিগমানন্দ পরমহংস। কুম্ভমেলা সমাপনান্তে গুরুর নিকট হতে বিদায় নিয়ে কাশীধামের পথে রওনা হলেন। ঘুরতে ঘুরতে ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত হয়ে আসনস্থ হয়ে বসলেন দশাশ্বমেধ ঘাটে। মনে মনে ভাবলেন, অন্নপূর্ণার স্থান, এখানে তো কেউ অভুক্ত থাকে না। দেখা যাক্ মা অন্নপূর্ণার লীলাখেলা। ধ্যানস্থ হলেন যোগীবর। অকস্মাৎ এক বৃদ্ধা এসে এক টৌক্‌রী খাবার দিয়ে বললেন, 'বাবা, খাবারটি রাখো। আমি এখনই স্নান সেরে আসছি।'

যখন ধ্যান ভঙ্গ হলো তখন রাত্রি প্রায় আটটা। কোথায় বৃদ্ধা? খাবারের টৌক্‌রীটি ঠিকই রয়েছে। আর দ্বিধা না করে খাবারগুলি খেয়ে গঙ্গার জল পান করলেন। দেহমন তৃপ্ত হলো। কিন্তু মনের কোণে কোথায় যেন সন্দিগ্ধতা উঁকিঝুঁকি দিতে লাগলো।

রাত্রিতে বিচিত্র এক স্বপ্ন দেখলেন,

মা অন্নপূর্ণা মৃদু হেসে রহস্য করে বলছেন,

—'কেমন বাবা, এবারে বিশ্বাস হলো তো? আমার কাশীতে কেউ কখনও অভুক্ত থাকতে পারে না।'

প্রত্যুত্তরে নিগমানন্দ বললেন, কই মা—তুমি তো ওগুলো দেও নি? যিনি দিয়েছেন তিনি তো একজন বৃদ্ধা। মানবী।

মৃদু হেসে সস্নেহে মা আবার বললেন,

কেন বাবা, যিনি নির্গুণ তিনি কি সগুণে নামতে পারেন না? অসীম কি সীমার মাঝে আসতে পারে না? নিরাকার যে কোন আকার নিতে পারে। বাধা কোথায়? বাবা, তোমার সাধনা এখনও সম্পূর্ণ হয়নি। প্রেমের সাধনায় অগ্রসর হয়ে লীলারহস্য আয়ত্ত করতে সচেষ্ট হও।

বৈদান্তিক সন্ন্যাসীর শিষ্য নিগমানন্দ। এই তত্ত্বটিকে ঠিক মনে-প্রাণে গ্রহণ করতে পারলেন না। সন্দিগ্ধতা নিয়েই ঘুম ভাঙলো। সাধনা সম্পূর্ণ হয়নি এই চিন্তাই তাঁকে পেয়ে বসলো। সাধন-জীবনের পূর্ণতা প্রাপ্তির জন্য অস্থির হয়ে উঠলেন।

অকস্মাৎ মনে এলো হিমালয়ের নিভৃতের সন্ন্যাসিনী গৌরী মাতাজীর কথা। আর দ্বিধা না করে আকুল হয়ে ছুটে চললেন উত্তরাখণ্ডের পথে গৌরীমাতাজীর আশ্রমাভিমুখে।

অবশেষে হিমালয়ের নিভৃতে গৌরীমাতাজীর আশ্রমে সুদীর্ঘদিন অবস্থান করে প্রেমময়ী ভাবের সাধনায় মগ্ন হলেন বৈদান্তিক নিগমানন্দ পরমহংস। গৌরীমাতাজীর শিক্ষায় ও কৃপাস্পর্শে তাঁর হৃদয়তন্ত্রী সুমধুর তারে উঠলো বেজে। আনন্দ ও প্রেমের বন্যা প্রবাহিত হয়ে চললো যোগীবরের অন্তরতম প্রদেশে। উত্তরকালে নিগমানন্দ কর্মযোগীরূপে আত্মপ্রকাশ করলেও তাঁর অন্তরের অন্তস্তলে প্রেমাশ্রিত সাধনাটিও বয়ে চলে সাবলীল ধারায়। এবং সন্ন্যাস জীবনের এক নূতনতর অধ্যায় দেয় উন্মোচিত করে। সাধন-জীবন

মাধুর্য-কৃপালীলাও যোগৈশ্বর্যে ভরপুর হয়ে ওঠে। বিভিন্ন সাধনার দ্বারা সকল তত্ত্বরাশি অবগত হলেন। তন্ত্রের সঙ্গে জ্ঞান-শাস্ত্রের সামঞ্জস্য সূত্র উপলব্ধি করলেন। তন্ত্রের শক্তিবাদে ও ভক্তিশাস্ত্রের ভাবতত্ত্বের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হৃদয়ঙ্গম করে রচনা করলেন, যোগীগুরু,' 'জ্ঞানীগুরু,' তান্ত্রিকগুরু,' গ্রন্থত্রয়। ধীরে ধীরে স্বামী নিগমানন্দের সাধনার যশঃসৌরভ জনসমাজে প্রচারিত হলো।

হিমালয়ের নিভৃত ভূমি থেকে তিনি চলে এলেন আসামে। গুরু সচ্চিদানন্দ সমভিব্যাহারে কামাখ্যা দর্শন করলেন। গৌহাটিতে এসে উঠলেন ভক্ত যজ্ঞেশ্বর বিশ্বাসের গৃহে। যজ্ঞেশ্বর বিশ্বাস ও স্ত্রী সরযূবালা দীক্ষা গ্রহণ করলেন নিগমানন্দের নিকট হতে। গুরুকে বিদায় দিয়ে শিষ্যদ্বয়ের নিকট হতে বিদায় নিয়ে চলে এলেন গারো হাজংদের মধ্যে। পার্বত্য প্রদেশের নিভৃতে বৃহৎ বিল্ববৃক্ষের নিম্নে পর্ণকুটির নির্মাণ করে অবস্থান করতে লাগলেন। অশিক্ষিত দরিদ্র পার্বত্যজাতিদের মধ্যে জ্ঞানের আলো প্রজ্বলিত করবার মানসে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে শিক্ষাগুরুরূপে আত্মপ্রকাশ করলেন। দরিদ্র নারায়ণের সেবায় আত্মনিয়োগ করলেন। জোড়হাটে প্রতিষ্ঠা করলেন 'শান্তি আশ্রম'। উত্তরকালে এই আশ্রম, 'আসাম বঙ্গীয় সারস্বত মঠে' রূপান্তরিত হয়। ধীরে ধীরে শক্তিমান সাধকের সংগঠন ক্ষমতাবলে দিকে দিকে আশ্রম হতে লাগলো।

গ্রন্থ রচনা ও 'আর্য দর্পণ' মাসিক পত্রিকার মাধ্যমে আধ্যাত্মিক ভাবধারা জনসমাজের মধ্যে পরিবেশন করতে লাগলেন। ত্যাগেই আনন্দ। ভোগমুখী মানুষকে নিবৃত্তিমুখী করবার জন্যই আশ্রম প্রতিষ্ঠা। প্রতিষ্ঠালাভের জন্য নয়। স্বামী নিগমানন্দ বিশেষ কোন মতবাদী নন। সব মতই তাঁর মত। শক্তিবাদ, ব্রহ্মবাদ, পরমতত্ত্ববাদ, ভক্তবাদ, দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদ প্রত্যেক মতবাদেই তিনি বিশ্বাসী। বিভিন্ন মতের স্বরূপ তিনি দর্শন করেছেন। তাইতো তিনি বললেন, ভগবদ্ অন্বেষণের কোনও ধরাবাঁধা পথ নেই। ভগবানের সাড়াও

হৃদয়ের ভিতর দিয়ে। সুতরাং অন্তরের শক্তিকে জাগ্রত করাই হলো সাধনা। তখন স্বদেশী যুগ তাঁর সংস্কারমুক্ত বাণী শুনে যুবকরাও আকৃষ্ট হয়ে আশ্রমে যাতায়াত করতে লাগলো। মনুষ্যত্ব বিকাশের অনুপ্রেরণা লাভ করলো তারা। তখন তিনি কুমিল্লায় আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছেন। কুমিল্লার দুর্গাপুরের জমিদার ভক্ত চন্দ্রকান্ত সেনগুপ্ত আহ্বান করে নিয়ে এসেছেন। যুবক সম্প্রদায়ের আশ্রমে আনাগোনা দেখে—গোয়েন্দা পুলিসও যাতায়াত আরম্ভ করলেন আশ্রমে। স্বামী নিগমানন্দের কার্যকলাপের ওপর প্রতিনিয়ত দৃষ্টি রাখতে গিয়ে প্রভাবিত হয়ে পড়লেন পুলিস অফিসারদ্বয়। যোগৈশ্বর্য দর্শন করে অভিভূত হলেন ইন্সপেক্টর শশিভূষণ ভট্টাচার্য ও বিমলাচরণ চক্রবর্তী। যোগীবরের সংস্পর্শে এসে উভয়েই ভক্ত ও শিষ্য হলেন।

আসাম থেকে বাংলাদেশে এসে পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে পরিভ্রমণ করতে করতে ময়মনসিংহের বেরিয়াচলে কংসনদীর তীরে শ্মশান-কালীর মন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করলেন স্বামী নিগমানন্দ। এই স্থানে বহু দুঃস্থ লোকের সেবা করে কর্মযোগীরূপে আত্মপ্রকাশ করলেন। এইখানেই নায়েব উমাচরণ সরকার ও ভক্তিমতী স্ত্রী হেমলতা নিগমানন্দের অনুগত ভক্ত হয়ে পড়েন। পরবর্তীকালে এই হেমলতা দেবীকে তান্ত্রিক সন্ন্যাসীর দীক্ষা দিয়ে সন্ন্যাস নাম প্রদান করেন—'যোগমায়া'। তিনি আজীবন নিগমানন্দের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। ময়মনসিংহ এবং কুমিল্লার লীলা সাঙ্গ করে এসে উপস্থিত হলেন ঢাকা শহরে।

ভক্ত জমিদার নরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীই যোগী নিগমানন্দকে ঢাকায় নিয়ে এলেন। ঢাকার ফরিদাবাদ অঞ্চলে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন ভক্তশিষ্য ডাক্তার নৃপেন্দ্রনাথ রায়। ঢাকায় অবস্থানকালে স্বামী নিগমানন্দ কয়েকখানি গ্রন্থও রচনা করেন। অবশেষে কলিকাতা, হালিশহর ও পুরীতেও সারস্বত মঠ প্রতিষ্ঠা করলেন। শুধু আসাম বাংলা উড়িষ্যায়ই নয়, পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতের বহু

অঞ্চলেও স্বামী নিগমানন্দের প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হতে লাগলো এবং সাধনার যশঃসৌরভ দূর-দূরান্ত পর্যন্ত বিকীর্ণ হয়ে পড়লো।

মধ্যপ্রদেশের বাস্তারের রাজা অকস্মাৎ যোগসিদ্ধ গুরুলাভের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। বহু অনুসন্ধান করেও যখন গুরুলাভ হলো না, তখন একদিন দন্তিকেশ্বরের দেবীমন্দিরে ধর্না দিয়ে পড়লেন। ভক্তের আকুলতা দেখে দেবী সন্তুষ্ট হলেন। দৈববাণীর মত রাজার কর্ণগোচর হলো—'বৎস, তোমার গুরু বাংলার মহাসাধক নিগমানন্দ সরস্বতী। তাঁর কৃপালাভের জন্য সচেষ্ট হও।'

সুদূর মধ্যপ্রদেশে তখনও নিগমানন্দের নাম প্রচারিত হয় নি। কে এই মহাপুরুষ? বাস্তাররাজ অবশেষে বাংলাদেশে লোক পাঠিয়ে স্বামীজীর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করলেন। তারপর এক শুভ দিনে যাত্রা করলেন বাংলাদেশের পথে।

যোগসিদ্ধ মহাপুরুষ নিগমানন্দের চরণোপান্তে এসে উপস্থিত হলেন। এবং নিগমানন্দের কৃপাস্পর্শে বাস্তাররাজ অধ্যাত্মজীবনে উন্নতিলাভ করলেন। তাঁর অভীষ্ট হলো সিদ্ধ। সমগ্র মধ্যভারতে নিগমানন্দের সাধনার যশঃসৌরভ বিকীর্ণ হলো।

ইন্দোরের রাজকর্মচারী শ্রীপাঠক। অধ্যাত্মজীবন লাভের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন। কোনও সিদ্ধযোগী মহাপুরুষের কৃপালাভের আকাঙ্ক্ষা তীব্র হয়ে উঠলো মনে। নদীতীরে বসে একাগ্র চিত্তে ভাবছেন,—'আমার জীবনে কি কোনও মহাপুরুষের শুভাগমন হবে না?' যোগীর মত ধ্যানস্থ হয়ে বসে আছেন। অকস্মাৎ অলৌকিক-ভাবে এক দিব্যমূর্তি নয়নগোচর করলেন। ধীরে ধীরে আবার মূর্তিটি অদৃশ্য হয়ে গেলো। একসময় যেন চেতনা হারিয়ে ফেলেছিলেন। এবার মনোজগতে শুরু হলো তীব্র আলোড়নের। কে এই মহাপুরুষ? ব্যাকুল হয়ে উঠলেন এই মহাপুরুষের দর্শনলাভ ও মুখনিঃসৃত বাণী শ্রবণ করবার জন্য। দিনে দিনে দর্শনলাভের আকাঙ্ক্ষার তীব্রতা

আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হলো। অবশেষে একদিন ঐ নদীতীরেই দৈববাণীর মত কর্ণগোচর হলো যোগীবরের নাম—নিগমানন্দ পরমহংস। তার পর সাধুসন্তদের মহলে অনুসন্ধান করে মুমুক্ষু ব্যক্তি নিগমানন্দের চরণে আশ্রয়লাভ করে পরম শান্তিলাভ করলেন। উত্তরকালে অধ্যাত্মজীবনে অনেক উন্নতিলাভ করেছিলেন শ্রীপাঠক।

শুধুমাত্র অধ্যাত্মসাধনার পথেই নয় সাংসারিক জীবনের নানা দুঃখ ও বিপদের দিনেও সাধারণ গৃহস্থ মানুষকে আশ্রয় দিয়েছেন। ত্রিপুরার একটি ক্ষুদ্র পল্লীর সাধারণ মানুষ অশ্বিনীকুমার। দরিদ্র কিন্তু স্বামীজীর একনিষ্ঠ ভক্ত। সেই ভক্তপ্রাণ মানুষটি অকস্মাৎ যখন ইহলীলা সংবরণ করলো তখন ক্ষুদ্র দুঃস্থ পরিবারটি মাতা, পত্নী ও বালক পুত্রের অসহায় অবস্থা। শোকভারাক্রান্ত হৃদয়ে কুটিরের কোণে স্থাপিত স্বামীজীর চিত্রটিকে সন্ধ্যায় সকলে মিলে প্রণতি জানায়। একদিন অশ্বিনীর মা ভাবলেন এমন দুঃখের দিনেও ঠাকুর শুধু মাত্র নীরব দর্শক হয়ে আছেন। কোন মঙ্গলই ত করলেন না। এ ছবি আর পূজা করে লাভ কি। পুকুরের জলে বিসর্জন দিয়ে দেবো। এবং সত্য সত্যই একদিন বিসর্জন দিতে চলেছেন এমন সময় দেখলেন সম্মুখে দণ্ডায়মান স্বয়ং স্বামী নিগমানন্দ। শুধু পটে আঁকা ছবি নয়। জীবন্ত ঠাকুর। প্রাণের ঠাকুর তার ক্ষুদ্র কুটিরে। করুণ কণ্ঠে বলছেন, 'চল মা ঘরে যাই। আমিই তোমার ছেলে। তোমায় মা বলে ডাকবো। অশ্বিনীর জন্য আর চোখের জল ফেলো না। অশ্বিনী তো আমার কাছেই আছে।' অশ্বিনীর মা, স্ত্রী ও পুত্র বিস্মিত ও অভিভূত হয়ে ঠাকুরের চরণে লুটিয়ে পড়লো।

অন্তর্ধানের পর সকলের হুঁশ হলো। ঠাকুর অলৌকিকভাবে তাদের গৃহে এসেছিলেন। এবং সবাবস্থায়ই ঠাকুরের কৃপা তাদের উপর বর্ষিত হচ্ছে। আরও বহু ব্যাপারে এই অখ্যাত অজ্ঞাত ক্ষুদ্র পরিবারটির উপর ঠাকুরের কৃপা বর্ষিত হয়। আশ্রিত ভক্তশিষ্যকে কৃপা করতে তিনি ধনী দরিদ্রের ভেদাভেদের চিন্তা করতেন না।

তিনি দেখতেন অন্তর। অন্তরের পূজা গ্রহণ করতেন। স্বামী নিগমানন্দ বলেন, 'আমি অবতার-টবতার নই, সাধারণ মানুষ। ভগবানকে জেনেছি। সত্যলাভ করেছি, ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছে। ব্যক্তিত্ব ধ্বংস হওয়ায় আমার ভেতর দিয়ে জগদ্‌গুরুর ইচ্ছাই লীলায়িত হয়ে উঠছে, আমাকে তোমরা জগদ্‌গুরু বলে জেনে রেখো। আমি সাধনা দ্বারা নিজে মুক্ত হয়েছি, তোমাদেরও মুক্তির পথ দেখিয়ে দেবো—এই আমার কাজ।'

মহাসাধক স্বামী নিগমানন্দ এইভাবে পৃথিবীর মাটিতে ভক্তসনে লীলা করে ১৩৪২ সালের এক শুভ দিনে ধীরে মহাসমাধিতে নিমগ্ন হলেন। কলকাতার বিডন স্ট্রীটের গৃহে মহাপুরুষের শয্যা ঘিরে ভক্ত ও শিষ্যবৃন্দ শোকভারাক্রান্ত স্তম্ভিতহৃদয়ে মহাসমাধির প্রতীক্ষা করছেন। বেলা তখন ১২টা। শয্যার উপর স্থিরভাবে উঠে বসলেন যোগীবর। আসনস্থ। ঠাকুরের মহাসমাধির মহালগ্নটি আসন্ন বুঝতে পেরে—অশ্রুপূর্ণ নয়নে ভক্তশিষ্য ভুবন ব্রহ্মচারী চীৎকার করে ডাকলেন, ঠাকুর! ঠাকুর! মুদ্রিত নেত্রে ঠাকুর শেষ কথা বললেন,—আর কেন ডাক। আমায় ডুবে যেতে দাও।

দৃষ্টি স্থির। বদন মৃদুহাস্যে অনুরঞ্জিত। মহাপুরুষ মহাসমাধিতে নিমগ্ন হলেন।

নয়নে নয়নে অঝোরে বইতে লাগলো শ্রাবণের ধারা। বিশ্ব-প্রকৃতিও যেন আকুল হয়ে উঠলো মহাপুরুষের বিয়োগব্যথায়।

যোগীবরের দেহ হালিশহরের গঙ্গাতীরে সারস্বত মঠে সমাধিস্থ করা হলো। যেন গঙ্গার বুকের শীতল বাতাস পেয়ে পথশ্রান্ত চির-পথিক স্বামী নিগমানন্দ ধরিত্রীমাতার কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছেন। আজও রয়েছে সেই সমাধিমন্দির। ভক্তবৃন্দ ফুল নিবেদন করে জানায় অন্তরের শ্রদ্ধা।

আচার্য ঠাকুর শ্রীনিবাস

ধীরে ধীরে মন্থরগতিতে একটি গো-শকট চলেছে গৌড়ের দিকে।

বহন করে নিয়ে চলেছে একটি কাষ্ঠপেটিকা। অস্ত্র-সজ্জিত, কোন প্রহরী নেই। আছে কটিবস্ত্র সম্বল কতগুলি দীন মানুষ। পেটিকাটিকে দেখেই বীর হাম্বীরের চোখের দৃষ্টি তার উজ্জ্বল তরবারীর মতই ঝক্-ঝক্ করে উঠলো। মনে পড়লো জ্যোতিষীর ভবিষ্যদ্বাণী,—'আর সাত দিন পরে কৃষ্ণপক্ষের নবমীর চাঁদ যখন শেষ রাত্রির অন্ধকার দূর করবার জন্য ফুটে উঠবে আকাশে ঠিক সেই সময় এই রাজ্যেরই কোন পথ দিয়ে দুর্লভ রত্নে পরিপূর্ণ একটি পেটিকা পার হয়ে যাবে।' আর দ্বিধা না করে বীর হাম্বীরের সশস্ত্র অনুচরদল ঝাঁপিয়ে পড়লো গো-শকটের উপর। তারপর বিনা বাধায় পেটিকাটিকে তুলে নিয়ে নিমেষের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। গো-শকটের যাত্রীরা ভীত ও হতবাক্ হয়ে তাকিয়ে থাকেন জ্যোৎস্নালোকিত এক প্রহেলিকার মত সেই জনশূন্য প্রান্তরের দিকে। খেতুরীর সন্নিকটে গোপালপুর গ্রামের এক নির্জন পথে রাত্রির শেষ যামে ঘটেছিল এই ঘটনা।

বড়ই করুণ হৃদয়বিদারক ছিল সে ঘটনা। জানেন না বীর হাম্বীর কোন্ দুর্লভ রত্নে পরিপূর্ণ ছিল সেই রত্নপেটিকা। হীরা জহরত নয় মরকত মণি মাণিক্য নয়, প্রবালও নয়। কতগুলি পুঁথি আর ভূর্জ-পত্রের স্তূপে পূর্ণ ছিল রত্নপেটিকা। হ্যাঁ, রত্নপেটিকাই বটে, রূপ-সনাতন, জীব গোস্বামী, কবি কৃষ্ণদাস ও শ্রীধামের বৈষ্ণবাচার্যদের

রচিত অমূল্য গ্রন্থরাজি ছিল ঐ কাষ্ঠপেটিকাটিতে। সে যাই হোক, পেটিকাটির প্রহরারত দীন মানুষগুলি ব্যথিত ও দুঃখিত চিত্তে সে রাত্রির শেষ যামটুকু পথিপার্শ্বের বৃক্ষতলেই অতিক্রান্ত করলেন। অরুণোদয়ের সাথে সাথে তাঁরা বিভিন্ন দিকে চলে গেলেন পেটিকাটির অনুসন্ধানে।

আর একটি সন্ধ্যা।

বনবিষ্ণুপুরের রাজভবনের সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন এক দীন ব্রাহ্মণ। শুনতে পেলেন সুস্বর কণ্ঠের ভাগবত পাঠ। পণ্ডিত ব্যাস ভাগবত পাঠ করছেন। রাজা বীর হাম্বীর রাজমহিষী সুলক্ষণা দেবী আর ধর্মপ্রাণ প্রজাবৃন্দরা হলেন শ্রোতা। ভবনদ্বারে অপেক্ষমাণ দীন সন্ন্যাসী ধীরে ধীরে এগিয়ে এলেন তারপর সভাজনতার এক পার্শ্বে উপবেশন করে শুনতে লাগলেন ভাগবত পাঠ।

পণ্ডিতপ্রবর তখন রাস পঞ্চাধ্যায়ের শ্লোকগুলির ব্যাখ্যা করছিলেন। অকস্মাৎ অনাহূত সেই ব্রাহ্মণের কণ্ঠ হতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিঃসৃত হলো প্রতিবাদধ্বনি···ভুল ভুল···ভ্রান্ত ব্যাখ্যা। সকলের দৃষ্টি নিবদ্ধ হলো সেই ব্রাহ্মণের প্রতি। অপরিচিত ব্রাহ্মণের জীর্ণ মলিন বেশ, রুক্ষ অবিন্যস্ত কেশরাশি আর ক্ষীণ দেহের দিকে অবজ্ঞামিশ্রিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে সে প্রতিবাদকে উপেক্ষা করলেন পণ্ডিত ব্যাস চক্রবর্তী। কিন্তু রাজা বীর হাম্বীর উপেক্ষা করতে পারলেন না। তাঁর মন ঐ ক্ষীণ ও মলিন বেশধারী ব্রাহ্মণকে সাধারণ দীন মানুষ বলে কিছুতেই চাইলো না স্বীকার করতে। লক্ষ্য করলেন রাজা জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের তেজোময় দীপ্তি আর ভগবৎ প্রেমের সুকোমল মাধুর্যের সংমিশ্রণে যেন এক অপূর্ব শ্রী ধারণ করে রয়েছে ঐ দীন মানুষটির মুখমণ্ডল। সেই দীন মানুষটির মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে রাজা আহ্বান করলেন সঠিক ব্যাখ্যা করবার জন্য। পণ্ডিত ব্যাস চক্রবর্তীও বিদ্রূপের হাসি হেসে সে আহ্বানে সম্মতি জ্ঞাপন করলেন। সভাজনতার মানুষগুলি কয়েকমুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হয়ে

দেখতে লাগলেন সেই অভিনব ব্যাপার। উপেক্ষা করতে পারলেন না সেই আহ্বানকে দীন সন্ন্যাসী। ধীরে ধীরে গিয়ে উপবেশন করলেন ভাগবত পাঠকের আসনে। শুরু হলো ভাগবত পাঠ। সুস্বর ও সুললিত কণ্ঠের বিশুদ্ধ উচ্চারণ আর তার মনোমুগ্ধকর সরস সরল ব্যাখ্যা। ভক্তকণ্ঠ হতে উৎসারিত পদামৃতলহরী যেন সভাজনতার হৃদয় প্লাবিত করে নিয়ে চললো কোন্ এক পরম পরিতৃপ্তির জগতের দিকে। মুগ্ধ বিস্মিত ও অভিভূত হয়ে পণ্ডিত ব্যাস চক্রবর্তী মাথা লুটিয়ে প্রণাম করলেন দীন ব্রাহ্মণকে। সন্ন্যাসীকে। বিহ্বল হয়ে প্রণাম করলো সভাজনতার ধর্মপ্রাণ মানুষেরা। রাজা বীর হাম্বীর ও রাণী সুলক্ষণা দেবীও মুগ্ধচিত্তে পদধূলি গ্রহণ করলেন ব্রাহ্মণের এবং রাজ অতিথিরূপে গ্রহণ করে হলেন ধন্য।

ইনিই হলেন পরম বৈষ্ণব শ্রীনিবাস। চৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীক্ষেত্রে একদিন যে নাম উচ্চারণ করে ব্যাকুল কণ্ঠে নিকটে আহ্বান করে-ছিলেন, তাঁর জন্মগ্রহণের পূর্বেই। শ্রীজীব গোস্বামী যাকে উপাধি দিয়েছিলেন, 'আচার্য ঠাকুর'। শ্রীনিবাস আচার্য ঠাকুর।

আচার্য প্রভু এবারে নিবেদন করলেন তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য। এবং রত্নপেটিকা লুণ্ঠনের ইতিবৃত্ত। ব্যথিত ও লজ্জিত হলেন বীর হাম্বীর। তিনিই যে স্বয়ং সেই লুণ্ঠনকারী এবং নিজের মূঢ়তা স্বীকার করে আত্মসমর্পণ করলেন আচার্য প্রভুর চরণে। ভক্তি বিগলিত অশ্রুধারায় সিক্ত হলো ঠাকুরের চরণযুগল। অমূল্য গ্রন্থরাজি ফিরে পাওয়ার আনন্দে বিহ্বল হয়ে আলিঙ্গনাবদ্ধ হলেন বীর হাম্বীরের সঙ্গে আচার্য প্রভু। বনবিষ্ণুপুরের দস্যু রাজা বীর হাম্বীরের জীবনে হলো আমূল পরিবর্তন। অবশেষে এক শুভদিনে দীক্ষা দিলেন রাজা ও রাণীকে। অপরিচিত দীন ব্রাহ্মণ হলেন রাজগুরু। আর এই রাজগুরু পরম বৈষ্ণব শ্রীনিবাস আচার্য ঠাকুরের সাহচর্যে এসে দস্যুরাজ হলেন বৈষ্ণব হরিচরণ দাস। রত্ন লুট করতে গিয়ে অমৃত পেয়ে গেলেন রাজা বীর হাম্বীর। তৃপ্ত হলো জীবন। মিটে গেল

রক্ত তৃষ্ণার জ্বালা। পরবর্তী জীবনে বীর হাম্বীর বৈষ্ণবধর্ম প্রচার ও প্রসারের কার্যে আপন অর্থভাণ্ডার করে দিয়েছিলেন উন্মুক্ত।

পণ্ডিত ব্যাস চক্রবর্তী ও রাজভবনের পথপরিদর্শক ধর্মপ্রাণ শ্রীকৃষ্ণবল্লভ আর রাজার শিক্ষাগুরু রামচন্দ্রও গুরুরূপে বরণ করলেন শ্রীনিবাস আচার্য ঠাকুরকে। আর আত্মনিয়োগ করলেন বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের কাজে। অল্প দিনের মধ্যেই বিষ্ণুপুর রাজ্য ভগবৎ নাম গুণ-গানের মধুর ঝঙ্কারে হয়ে উঠলো মুখরিত। মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের প্রেমধর্ম বাংলার প্রতি ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়ার কাজে ব্রতী হলেন শ্রীনিবাস আচার্য ঠাকুর।

মহাপ্রভু চৈতন্যদেব শ্রীনিবাসের জন্মগ্রহণের পূর্বেই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, 'আমার বিশুদ্ধ প্রেমমূর্তি পরিগ্রহ করে চাকন্দিগ্রামে আবির্ভূত হবে শ্রীনিবাস। প্রেম এবং ভক্তিশাস্ত্র প্রচার করে সে সমগ্র দেশকে প্রেমের বন্যায় নিমজ্জিত করবে।' পরবর্তীকালে মহাজনগণ এই শ্রীনিবাসকে ভক্তাবতার ভগবান শ্রীগৌরসুন্দরের এক অন্তরঙ্গ ভক্ত বলেই ক্ষান্ত হন নি, এঁকে প্রেমপুরুষোত্তম শ্রীগৌর সুন্দরের অভিন্ন প্রকাশ বলে কীর্তন করেছেন।

১৪৪১ শকে চাকন্দি গ্রামে শুভ বৈশাখী পূর্ণিমার দিনে রোহিণী নক্ষত্রে সত্য সত্যই চম্পক বর্ণ এক পরম রূপবান্ শিশু করলেন জন্ম-গ্রহণ। জননী লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবী আর পিতা হলেন গঙ্গাধর ভট্টাচার্য। নাম সংকীর্তনের ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠলো ভট্টাচার্য গৃহ। নবজাত অপরূপ শিশুকে ঘিরে আনন্দোৎসবে মেতে উঠলো সমস্ত গ্রাম। গঙ্গাধর ভট্টাচার্য পরম বৈষ্ণব। গৌর অন্ত প্রাণ। শ্রীগৌরের দর্শনের জন্য মাঝে মাঝে তিনি উন্মত্তপ্রায় হয়ে যেতেন। শ্রীগৌর-সুন্দরের সন্ন্যাস গ্রহণের কথা শুনে গঙ্গাধর ভট্টাচার্য ব্যাকুল হয়ে ছুটে এসেছিলেন কেশব ভারতীর আশ্রমে। কাটোয়াতে। চৈতন্যভাবে বিভোর হয়ে শ্রীচৈতন্যেরই পদতলে মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। আর মন্ত্রোচ্চারণের ধ্বনির মত মুখ হতে নিঃসৃত হতে লাগলো চৈতন্য নাম।

সেই দিন হতে গ্রামের লোকে, আর গঙ্গাধর বলতো না। বলতো চৈতন্যদাস। মাজিগ্রামের ধর্মপ্রাণ মানুষ বলরাম আচার্য দীন ব্রাহ্মণ চৈতন্যদাসের স্বভাবগুণে মুগ্ধ হয়ে নিজ কন্যা লক্ষ্মীপ্রিয়াকে সমর্পণ করলেন তার হাতে। বিবাহকার্য সুসম্পন্ন হওয়ার পর চাকন্দি গ্রামেই বাস করতে লাগলেন চৈতন্যদাস। রূপবতী বধূ লক্ষ্মীপ্রিয়া। সংসার পাতলেন বটে তবে সন্তানাদি না হওয়ায় সংসার জমলো না। আর মাঝে মাঝেই চৈতন্যদর্শন-মানসে উন্মত্ত হয়ে যান চৈতন্যদাস। মহাপ্রভু তখন নীলাচলে। অবশেষে একদিন চৈতন্যদাস স্ত্রী লক্ষ্মীপ্রিয়াসহ যাত্রা করলেন নীলাচলের পথে। দুস্তর দুর্গম পথ অতিক্রম করে শ্রীক্ষেত্রে পৌঁছে দর্শন করলেন জগন্নাথদেবকে। তারপর মহাপ্রভুর কুটিরে এসে উপস্থিত হলে প্রভুর শ্রীঅঙ্গ সেবক গোবিন্দ এসে বললেন, 'তোমাদের মনোরথ প্রভুর গোচর হয়েছে। অনতিকাল মধ্যেই তোমরা এক অমূল্য পুত্ররত্ন লাভ করবে। প্রভুর বিশুদ্ধ প্রেম ধারণ করে সেই পুত্র আবির্ভূত হবে।' মহাপ্রভুর অভাবনীয় বাণী শুনে অভিভূত হলেন উভয়ে। ভাবোন্মাদে উন্মত্ত হয়ে গৌরকীর্তনে মেতে উঠলেন চৈতন্যদাস। এইভাবে শ্রীক্ষেত্রে মহাপ্রভুর চরণ আশ্রয় করে রইলেন কিছুদিন। অবশেষে মহাপ্রভুর আদেশে এক শুভদিনে যাত্রা করলেন দেশাভিমুখে। দেশে ফিরেও চৈতন্যদাসের ভাবের হলো না কোন পরিবর্তন দিবারাত্র মেতে থাকেন হরিসংকীর্তনে। গৌরকীর্তনে। এমনই এক ভাগবত পরিবেশে দিনে দিনে বেড়ে ওঠে নবজাত শিশু। ভবিষ্যতের আচার্য প্রভু। অপূর্ব শ্রীসম্পন্ন মাধুর্যময় মূর্তি নয়নগোচর করে চৈতন্যদাস পুত্রের নাম রাখলেন শ্রীনিবাস। এ নাম শুনে গৌরপরিকরেরা মৃদু মৃদু হাসেন আর বলেন সবই শ্রীগৌরসুন্দরের ইচ্ছা।

চঞ্চল শিশুর চঞ্চল মন। কিন্তু গৌর নাম শুনলেই শিশু শান্ত হয়ে যায়, মুখমণ্ডলে ফুটে ওঠে উদাসীনতার অভিব্যক্তি। ছোট্ট শিশুর

ভাবগম্ভীর সেই মূর্তি নয়নগোচর করে আশ্চর্যান্বিত হন পিতা মাতা। আর মুগ্ধ হন গ্রামবাসীরা।

দিনে দিনে শিশু বড় হয়ে ওঠে। বছরের পর বছর চলে যায় আবার আসে নূতন বছর। শুরু হলো শিক্ষা। শৈশবের শিক্ষা। পরমপণ্ডিত ধনঞ্জয় বাচস্পতি হলেন শিক্ষক। পরম রূপলাবণ্যময় বালককে ছাত্ররূপে লাভ করে বাচস্পতি মহাশয়ও আনন্দিত হলেন। আর বিদ্যাদেবী স্বয়ং আবির্ভূত হয়ে আশিস্ প্রদান করলেন বালক-রূপী শ্রীনিবাস আচার্য ঠাকুরকে।

অসাধারণ মেধা ও অধ্যবসায়ের ফলে শ্রীনিবাস অতি অল্পকালের মধ্যেই ব্যাকরণ, কোষ; অলঙ্কার, কাব্য ও যাবতীয় দর্শনশাস্ত্রে হয়ে উঠলেন অদ্বিতীয় পণ্ডিত। পাণ্ডিত্যের তেজোময় দীপ্তির সঙ্গে ভগবৎ প্রেমের সুকোমল মাধুর্যের সংমিশ্রণে শ্রী নিবাসের চরিত্রটি এক অপরূপ মহিমায় হয়ে উঠলো মহিমান্বিত। উপনয়নের সময় মুণ্ডিত মস্তক গৈরিক বসন ভিক্ষার ঝোলা আর দণ্ড ধারণ করে শ্রীনিবাস ব্রহ্মচারী বেশে যখন এসে দাঁড়ালেন, নয়নাভিরাম সেই সৌন্দর্য দর্শনে মুগ্ধ ও অভিভূত হলেন পিতা মাতা। গ্রামবাসীরা। আর গৌর পরিকরেরা। একমাত্র শ্রীগৌরসুন্দরের ছিল এমন রূপ। শ্রীগৌর-সুন্দর তখন নীলাচলে কৃষ্ণপ্রমোন্মাদনায় উন্মত্ত। আর চাকন্দি গ্রামের এই অপরূপ ব্রহ্মচারী বালক তখন গৌরসুন্দরের দর্শনের পিপাসায় ব্যাকুল। তাইতো গৌরসুন্দর বললেন,

'মোর শক্তিতে জন্ম ইহার করিলা প্রকাশ।
প্রেম রূপে জন্ম হৈল নাম শ্রীনিবাস॥'

শ্রীনিবাসের সুললিত পরিপুষ্ট অঙ্গ নবযৌবনের উন্মেষে ঝলমল করছে। জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের প্রতিভায় মুখমণ্ডলে গাম্ভীর্যের অভি-ব্যক্তি, তার উপর প্রেমানুরাগের অঞ্জন লেগে নয়নদ্বয় ঈষৎ রক্তিম ও সজল। চলেছেন সাজিগ্রামের পথে। গৌর চিন্তায় বিভোর। পথে অকস্মাৎ সাক্ষাৎ হলো নরহরি সরকার ঠাকুরের সঙ্গে। শ্রীখণ্ড নিবাসী

আকুমার ব্রহ্মচারী সুপণ্ডিত ও ভক্তিরসজ্ঞ এই নরহরি ঠাকুর। মহাপ্রভুর সঙ্গে নিরন্তর থেকে সেবা করতেন। চামর-ব্যাজনই নরহরির সেবা ছিল। 'নরহরি চামর ঢুলায়।' নরহরি ঠাকুর চলেছেন গঙ্গাস্নানে। পথে নয়নাভিরাম শ্রীনিবাসকে দর্শন করে মুগ্ধ হলেন। শ্রীনিবাসের মধ্যে গৌরসুন্দরকে পেলেন খুঁজে। উভয়ে আলিঙ্গনাবদ্ধ হলেন। শ্রীনিবাসও তৃপ্ত হলেন নরহরি ঠাকুরকে পেয়ে। অবশেষে শুরু হলো গৌরপ্রসঙ্গ। এবং এই মিলনের পর হতেই শ্রীনিবাসের জীবনের গতি হলো পরিবর্তিত। সাজিগ্রাম থেকে ফিরে এলেন চাকন্দিতে। ভিন্ন এক মূর্তিতে। প্রেমোম্মাদ দশা উপস্থিত হলো। গৌরসুন্দরের প্রেমে উন্মত্তপ্রায়। অকস্মাৎ পিতৃদেব ইহধাম পরিত্যাগ করে চলে গেলেন। অপরিণত বয়সে পিতাকে হারিয়ে কিংকর্তব্য-বিমূঢ় হয়ে পড়লেন শ্রীনিবাস। তখনও মাতামহ বলরাম আচার্য জীবিত। সুতরাং মাতাসহ এসে উঠলেন সাজিগ্রামে। মাতুলালয়ে। ফাল্গুন মাসে। কিন্তু নিজের মনের কোনও পরিবর্তন হলো না। প্রেমোম্মাদ দশা দিনে দিনে আরও হলো বৃদ্ধিপ্রাপ্ত। মাতার ইচ্ছা অন্যরূপ। কিন্তু মাতার কোন ইচ্ছাই তখনও পূরণ করলেন না শ্রীনিবাস।

আর একটি নূতন দিন। তার চোখের সামনে আলোকিত হয়ে উঠলো। শকের মাঘ মাসের একটি দিন। গৌর দর্শনের পিপাসায় ব্যাকুল হয়ে ছুটে চললেন নীলাচলের পথে। সব বাধাকে ঠেলে ফেলে সম্মুখের পথে এগিয়ে চলেছেন শ্রীনিবাস। এক অপরূপ তপ্তকাঞ্চনময় দ্যুতিময় ব্রাহ্মণকুমার নয়নজলে ভাসতে ভাসতে চলেছেন নীলাচলের পথে। শ্রীগৌরসুন্দরের দর্শনাকাঙ্ক্ষায়। অকস্মাৎ নীলাচল প্রত্যাগত যাত্রিমুখে শুনলেন গৌরসুন্দরের দেহ সংবরণ লীলার সংবাদ। গৌর অন্তপ্রাণ শ্রীনিবাস ধৈর্য ধারণ করতে পারলেন না। চোখের জলে সিক্ত হলো পথের ধূলি। ধীরে ধীরে অবসন্নের মত সেই পথের ধূলির উপরেই উপবেশন করলেন।

শোকের গভীর তমিস্রায় গংভীরভাবে নিমর্জ্জিত হলেন। তাঁর জীবনের একমাত্র অবলম্বন শ্রীমন্মহাপ্রভুর অদর্শনে হৃদয় মথিত হলো। এবং নিজ জীবন বিসর্জন দেওয়াই মনস্থ করলেন। পথশ্রমে ক্লান্ত তন্দ্রাচ্ছন্ন শ্রীনিবাস এক অপূর্ব অলৌকিক দৃশ্য নয়নগোচর করলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু সপরিবারে বসে আছেন। আর গদাধর পণ্ডিত শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করছেন। গম্ভীরায়। নীলাচলে। কী গভীর ও স্নিগ্ধ শান্তি উদ্ভাসিত হয়ে রয়েছে গৌরসুন্দরের মুখমণ্ডল। অকস্মাৎ সেই সৌম্যমূর্তি জ্যোতির্ময় পুরুষ তাকে নিকটে আহ্বান করলেন এবং পরম স্নেহে বক্ষে করলেন ধারণ। স্বপ্ন ভঙ্গ হলো। কিন্তু অপার বিস্ময়ে তাঁর হৃদয় মন মথিত হতে লাগল। পরমানন্দের আস্বাদ পেয়ে পথশ্রমের ক্লান্তি ভুললেন শ্রীনিবাস। আবার শুরু হলো পদযাত্রা। পদক্ষেপ। দ্রুতপদক্ষেপ। নীলাচলের পথে। তারপর সেই শুভক্ষণ! শুভদিনটি! এসে উপস্থিত হলো। শ্রীক্ষেত্রে এসে পৌঁছলেন শ্রীনিবাস। জগন্নাথ দর্শন করে, এলেন যমেশ্বর টোটায়। ভূলুণ্ঠিত হয়ে প্রণাম করলেন গদাধর পণ্ডিতকে। গদাধর পণ্ডিতও তার পরিচয় পেয়ে বুকে জড়িয়ে ধরলেন পরম স্নেহে। এবং প্রতিদিন শ্রীনিবাসকেই ভাগবত পাঠ করে শোনাতে লাগলেন। শ্রীনিবাসকে পেয়ে গৌরসুন্দরের অভাব ভুললেন গদাধর পণ্ডিত। অবশেষে শ্রীনিবাস, সার্বভৌম ভট্টাচার্য, রায় রামানন্দ, পরমানন্দ পুরী, বাণীনাথ, শিখি মাইতি, শঙ্কর, গোবিন্দ, বক্রেশ্বর পণ্ডিত, গোপীনাথ আচার্য প্রভৃতি প্রভুর পরিকরগণের সঙ্গে হলেন মিলিত। সকলেই শ্রীনিবাসকে পরম স্নেহে গ্রহণ করলেন। শ্রীনিবাসের সাহচর্যে তাঁরা গৌরসুন্দরের অভাববোধ অনেকটা ভুললেন। এইভাবে সপ্তাহ মাস বৎসর অতিক্রান্ত হলো আবার এলো নূতন বছর। অবশেষে শ্রীক্ষেত্রের লীলা সাঙ্গ করে শ্রীনিবাস চলে এলেন গৌড়ে। গৌড় থেকে গৌর মণ্ডলে। গদাধর পণ্ডিতের নির্দেশে। নবদ্বীপে এসে মিলিত হলেন শ্রীবাস, দাস গদাধর ও মুরারি গুপ্তের সঙ্গে। শান্তিপুরে

এসে অলৌকিক দর্শন হলো। আজানুলম্বিত বাহুযুগল পরিশোভিত জ্যোতির্ময় দেহধারী অদ্বৈত মহাপ্রভুকে দর্শন করলেন। তিনি বললেন,—'প্রভু তোমার জন্য গোপাল ভট্টকে রেখেছেন। তুমি শ্রীধামে গিয়ে শ্রীজীবের নিকট ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করবে। গার্হস্থ্যধর্ম পালন করে প্রেমধর্ম প্রচার কববে।' পরমুহূর্তেই অন্তর্ধান হলেন মহাপুরুষ। তখন শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীঅদ্বৈত অপ্রকট হয়েছেন। শ্রীনিবাস খড়দহে এসে উঠলেন নিত্যানন্দ গৃহে। নিত্যানন্দ পুত্র গোস্বামী বীরভদ্র ও জননী জাহ্নবী দেবী পরম স্নেহে গ্রহণ করলেন শ্রীনিবাসকে। খানাকুল কৃষ্ণনগরে এসে মিলিত হলেন অভিরাম গোপাল গোস্বামীর সঙ্গে। ইনি 'অভিরাম ঠাকুর' নামে খ্যাত। শ্রীনিত্যানন্দ পারিষদ। শ্রীনিবাস অভিরাম ঠাকুরের নিকট হতে প্রেমধন লাভ করলেন। ইনি স্বপ্নাদেশে শ্রীশ্রীগোপীনাথ বিগ্রহকে মৃত্তিকামধ্য হতে উত্তোলনপূর্বক প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। খানাকুল-কৃষ্ণনগরে। অবশেষে শ্রীনিবাস ফিরে এলেন সাজিগ্রামে। প্রতিষ্ঠা করলেন বিদ্যালয়। এবং চৈতন্যের সরস ভক্তিবাদকে সুদৃঢ় দার্শনিক ভিত্তির উপর স্থাপন করে শিক্ষা বিস্তারে মনোনিবেশ করলেন। সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ না করলেও সন্ন্যাসীর মত জীবন যাপন করতে লাগলেন। এই সময়ে শ্রীরঘুনন্দন ও সরকার ঠাকুর শ্রীনিবাসকে গার্হস্থ্যজীবন অবলম্বন করে মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম প্রচারের জন্য অনুরোধ করলেন। এই অনুরোধের তাৎপর্য উপলব্ধি করে শ্রীনিবাস সেই অনুরোধের জীবনকে গ্রহণ করেছিলেন। সাজিগ্রামের গোপাল চক্রবর্তীর কন্যা দ্রৌপদীকে সহধর্মিণীরূপে বরণ করলেন। বৈশাখের কৃষ্ণা তৃতীয়া তিথিতে বিবাহকার্য সুসম্পন্ন হলো। বিবাহ-বাসরেই শ্রীনিবাস স্ত্রীকে দীক্ষা দিলেন। নাম হলো ঈশ্বরী ঠাকুরাণী। এবং পরবর্তীকালে রাঘব চক্রবর্তীর কন্যা পদ্মাবতী শ্রীনিবাসের পাণ্ডিত্যের যশঃসৌরভ ও নয়নাভিরাম রূপে মুগ্ধ হয়ে স্বামীরূপে বরণ করেন। তাঁকেও দীক্ষা দিয়ে শ্রীনিবাস নাম দিলেন গৌরাঙ্গপ্রিয়া।

আর একটি শুভদিন। শ্রীনিবাস শ্রীধাম বৃন্দাবনের পথে করলেন যাত্রা। দুস্তর দুর্গম পথ অতিক্রম করে এসে পৌঁছলেন লীলায় ছাওয়া শ্রীধাম বৃন্দাবনে। শ্রীগোবিন্দজীর মন্দিরে সাক্ষাৎ হলো শ্রীশ্রীজীব গোস্বামীর সঙ্গে। ভাবানন্দে বিভোর হয়ে উভয়ে আলিঙ্গনাবদ্ধ হলেন। রূপ ও সনাতন গোস্বামী তখন অপ্রকট হয়েছেন। শ্রীশ্রীজীব গোস্বামী তখন ভারতের অদ্বিতীয় পণ্ডিত। প্রসিদ্ধ ভক্তিগ্রন্থ প্রণেতা ও টীকাকার।

'শ্রীরূপ-সনাতন অনুগ্রহ হইতে।
শ্রীজীবের বিদ্যাবল ব্যাপিল জগতে॥'

শ্রীনিবাস পণ্ডিতপ্রবর চিরসন্ন্যাসী শ্রীশ্রীজীব গোস্বামীর নিকট শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন শুরু করলেন। অতি অল্প-কাল মধ্যেই শ্রীনিবাস সমগ্র ভক্তিশাস্ত্র আয়ত্ত করে ফেললেন। শ্রীনিবাসের পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে শ্রীজীব গোস্বামী তাঁকে 'আচার্য ঠাকুর' উপাধি প্রদান করলেন। অবশেষে এক শুভদিনে আচার্য ঠাকুর ভূলুণ্ঠিত হয়ে প্রণাম করলেন ছয় গোস্বামীর অন্যতম গোপাল ভট্টকে। শ্রীমন্ মহাপ্রভু শীল গোপাল ভট্টকে স্বীয় ডোর, কৌপীন ও একখানি আসন দিয়ে শ্রীধাম বৃন্দাবনে প্রেরণ করেন। শ্রীগোপাল ভট্ট উত্তর দেশে তীর্থভ্রমণ সময় গণ্ডকী নদীতীরে একটি শালগ্রাম শিলা পান। ভক্ত বাসনায় উহাই পরে শ্রীরাধারমণ শ্রীবিগ্রহরূপে পরিণত হন। শ্রীল গোপাল ভট্টকেই শ্রীনিবাস গুরুরূপে বরণ করলেন। গোস্বামী গোপাল ভট্টও এতদিন এমনই একজন শিষ্যের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। ২২শে বৈশাখের শুভদিনে শ্রীরাধারমণজীর মন্দিরে শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে শ্রীল গোপালভট্ট দীক্ষা দিলেন শ্রীনিবাসকে। ভজন অধ্যয়ন আর গুরুসেবার মধ্য দিয়ে বৃন্দাবনের দিনগুলি অতি-ক্রান্ত হতে লাগলো শ্রীনিবাস ঠাকুরের। ধীরে ধীরে একটি বিশাল বনস্পতি প্রেমভক্তির সংমিশ্রণে যেন স্বর্ণলতায় রূপান্তরিত হয়ে দীন-তার ভারে ভূলুণ্ঠিত গতি লাভ করলো। এই শ্রীধামেই লোকনাথ

প্রভুর গৃহে এক শুভক্ষণে শ্রীনিবাসের সঙ্গে মিলন হলো গৌরবর্ণ নবীন যুবক নরোত্তম ঠাকুর ও শ্যামানন্দ গোস্বামীর। অবশেষে শ্রীজীবও ব্রজের পণ্ডিতমণ্ডলীর আদেশে শ্রীনিবাস আচার্য ঠাকুর শ্যামানন্দ ও নরোত্তম ঠাকুরসহ যাত্রা করলেন গৌড়দেশ অভিমুখে। মহাপ্রভুর বিশুদ্ধ প্রেমধর্ম রূপসনাতনার্দির রচিত গ্রন্থরাজি ও কবি কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী রচিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি গ্রন্থের নিগূঢ় অর্থ ঘরে ঘরে প্রচার করবার মানসে। সঙ্গে নিয়ে চললেন একটি কাষ্ঠ-পেটিকা। সেই অমূল্য গ্রন্থরাজি পরিপূর্ণ কাষ্ঠপেটিকা। চিন্তিত হলেন শ্রীনিবাস। তিনি কি সত্যই এতবড় দায়িত্ব গ্রহণের উপযুক্ত হয়েছেন ?

রাত্রিতে স্বপ্ন দেখলেন, শ্রীগোবিন্দজী বলছেন, 'শ্রীনিবাস তুমি বিচলিত হয়ো না। কৃষ্ণদাস ও রূপ-সনাতনাদির গ্রন্থরাজির প্রচার তোমার দ্বারাই সম্ভব হবে। বৈষ্ণবধর্মের নিগূঢ় রহস্য তুমি ঠিকই হৃদয়ঙ্গম করেছো। গৌড়দেশে তুমি সেই প্রেমধর্ম প্রচারে সক্ষম হবে।' স্বপ্ন ভঙ্গ হলেও অনির্বচনীয় এক আনন্দের অনুভূতিতে মন-প্রাণ ভরপুর হয়ে রইলো শ্রীনিবাসের। পরদিবস শুভযাত্রা হলো শুরু। সুসজ্জিত শকটে। গৌড়ের পথে। সমাগত বৈষ্ণবগণ যাঁরা বিভিন্ন স্থান থেকে আচার্য ঠাকুরকে বিদায় দেবার জন্য এসেছিলেন নামগানের মধ্য দিয়ে বিদায় সম্ভাষণ জানালেন। সর্বাগ্রে চলেছে গ্রন্থসম্পুট। তৎপশ্চাতে আচার্য শ্রীনিবাস, শ্যামানন্দ ও নরোত্তম ঠাকুর। তিন প্রভুর তিন আবেশাবতারের মিলনে গৌরলীলার দ্বিতীয় অধ্যায় প্রকাশের সূত্র হলো রচিত।

সুদীর্ঘ ছাব্বিশ বৎসর গৌরমণ্ডলে অবস্থান করে শ্রীনিবাস আচার্য ঠাকুর চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম প্রচার করেন এবং শ্রীগৌর সুন্দরের অসম্পূর্ণ কার্যকে করলেন সম্পূর্ণ।

প্রেমধর্মের সঠিক তাৎপর্য উপলব্ধি করে চৈতন্যমহাপ্রভুর সরস প্রেমধর্মকে দার্শনিক ভিত্তির উপর করলেন স্থাপন। এবং সেই বিশুদ্ধ

ভক্তিবাদের মর্মবাণী বাংলার ঘরে ঘরে দিলেন পৌঁছে। বৈষ্ণবধর্ম হলো বাংলার অবহেলিত মানুষের হৃদয়ের ধর্ম। বাংলার ঘরে ঘরে শ্রীগৌরাঙ্গ নামসংকীর্তনের তরঙ্গ উঠলো। সাধারণ মানুষ উপলব্ধি করলো নামের মাহাত্ম্য। নাম শুধু একটা অভ্যস্ত নিষ্প্রাণ বুলি নয়, একটা প্রজ্বলন্ত প্রেমমন্ত্র। সেই প্রেমমন্ত্রে দীক্ষিত হলেন রাজা প্রজা দস্যু শত শত সহস্র সহস্র সাধারণ মানুষ। ব্রাহ্মণ্যধর্মের কুসংস্কারে হতাশার অন্ধকারে আচ্ছন্ন সাধারণ মানুষের প্রাণ প্রেমধর্মের আবেদানে আবার হয়ে উঠলো সঞ্জীবিত।

বীর হাম্বীরের বিষ্ণুপুর রাজ্য, গৌড়দেশ আর মানভূম হতে শবরভূম পর্যন্ত নরনারায়ণের মিলনতীর্থে হলো পরিণত।

এইভাবে বঙ্গভূমির লীলা সাঙ্গ করে শ্রীনিবাস আচার্য ঠাকুর আবার ফিরে চললেন শ্রীধাম বৃন্দাবনে। শ্রীগোবিন্দজীর হাতছানি তাঁকে ব্যাকুল করে তুললো। গুরু শ্রীল গোপাল ভট্ট তখনও অপ্রকট হননি। ব্যাকুল হৃদয়ে ছুটে চললেন আচার্য প্রভু বৃন্দাবনের পথে।

যাত্রা হলো শুরু শ্রীধামের পথে। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত বৃন্দাবনধামেই অতিবাহিত করেন এবং কঠোর সাধনার জীবন যাপন করেন আচার্য প্রভু।

শ্রীনিবাসের তিন পুত্র ও তিন কন্যা। বৃন্দাবনচন্দ্র, রাধাকৃষ্ণ, গীতগোবিন্দ, হেমলতা, কৃষ্ণপ্রিয়া ও কাঞ্চনলতা। জ্যেষ্ঠা কন্যা হেমলতা জনমানসের কাছে অর্ধকালীরূপে পরিচিতা হয়েছিলেন। মুণিপুর নিবাসী রামকৃষ্ণ চট্টরাজের পুত্র গোপীজীবনবল্লভের সহিত বিবাহ হয়। এঁর জীবনের অলৌকিক ঘটনা হলো—একদিন ব্রাহ্মণ ভোজনের সময় পরিবেশন করছিলেন। দুই হাতে ছিল অন্নব্যঞ্জনের থালা। হঠাৎ মাথায় ঘোমটা স্থানচ্যুত হলো। পরমুহূর্তেই স্কন্ধদেশ হতে অপর দুই হাত বের করে ঘোমটা টেনে দিলেন। এই অভাবনীয় দৃশ্য নয়নগোচর করে ভোজনরত ব্রাহ্মণেরা অভিভূত

হলেন। এবং দিকে দিকে প্রচারিত হলো হেমলতা মানবী নয়—দেবী। স্বয়ং কালী। অর্ধকালী।

আর কনিষ্ঠ পুত্র গীতগোবিন্দ পিতার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে সারস্বত সাধনায় ব্রতী হন। রচনা করেন বীর রত্নাবলী গ্রন্থ। পদাবলী সাহিত্যেও তাঁর দান আছে।

বৈষ্ণবজগতের বিখ্যাত গোস্বামী শ্যামানন্দ ও নরোত্তম ঠাকুর আচার্য প্রভু শ্রীনিবাসের সাহচর্য লাভ করেই সন্ন্যাসজীবনের পাথেয় করেছিলেন সঞ্চয়। এইজন্যই বৃন্দাবনের শ্রীজীব গোস্বামী ও লোকনাথ প্রভু উভয়কেই শ্রীনিবাসের হাতে সমর্পণ করে হয়েছিলেন নিশ্চিন্ত। শ্রীনিবাস প্রভুর প্রধান শিষ্য ছিলেন রামচন্দ্র কবিরাজ। ইনি রচনা করেন শ্রীনিবাসের জীবনচরিত। ইনি ছিলেন অষ্ট কবিরাজের অন্যতম। গুরুভক্তি ছিল তাঁর অতুলনীয়। বিবাহ করলেও সংসার আশ্রমে প্রবেশ করেন নি। গুরু সেবাই ছিল তাঁর জীবনব্রত। গুরুর অন্তর্ধানের পরেই দেহলীলা সংবরণ করেন—শ্রীধাম বৃন্দাবনে।

যাঁর আগমনে আর প্রেমধর্মের প্রচারে আর একবার উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল গৌড়জনের মনের আকাশ। আর মনের মাটি সিক্ত করে তুলেছিল শ্রীমদ্‌ভাগবত আর শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের অপূর্ব সরস ব্যাখ্যায়। মিটিয়ে দিচ্ছিল জীবনের সকল তত্ত্বকঠিন ভাবনার পিপাসা। সেই পরম বৈষ্ণব শ্রীগৌরাঙ্গের আবেশাবতার শ্রীনিবাস আচার্য ঠাকুর নিত্যলীলা সাঙ্গ করলেন শ্রীধাম বৃন্দাবনে। ১৫২৫ শকে। কার্তিকী শুক্লা অষ্টমী দিবসে। চুরাশী বৎসর বয়সে।

শিষ্য ভক্তকবি—গেয়ে উঠলো—

বিধি মোরে কি করিল
প্রভু মোর কোথা গেল
হিয়া মাঝে দিয়া
দারুণ ব্যথা॥

গোস্বামী শ্যামানন্দ

স্বপ্নের মধ্যেই গৌরসুন্দরের নির্দেশবাণী শুনতে পেয়ে ঘুম ভেঙে গেল কিশোরের। ঘুম ভেঙেই বুঝতে পারেন মিথ্যা নয় এ স্বপ্ন। সত্যই প্রেমের ঠাকুরের আহ্বান। তার বুকেরই ভিতর নির্বাসিত এক বদ্ধ নিশ্বাসের বাতাস যেন হয়ে ওঠে চঞ্চল। নিজেকে শাসন করার শক্তিও ফেলেন হারিয়ে। ব্যাকুল হয়ে ছুটে চললেন সুদূর উড়িষ্যার ধারেন্দা-বাহাদুর গ্রাম থেকে অম্বিকা-কালনার শ্রীগৌর-সুন্দরের মন্দির অভিমুখে। পরম বৈষ্ণব হৃদয়চৈতন্যের নিকট। শুধুমাত্র গৌর-নাম সম্বল করে। তখন অস্তমিত সূর্যের রক্তিম আভায় রঙীন হয়ে উঠেছে গঙ্গার জল।

—আমাকে আশ্রয় দান করুন আর সাধনার পথ বলে দিন প্রভু !

বাষ্পায়িতলোচনে বলেন কিশোর, বৈষ্ণবাচার্য হৃদয়চৈতন্যকে। মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকেন আচার্যদেব পরমার্থাভিলাষী আগন্তুক কিশোরের মুখের দিকে। স্তম্ভিত হন তার সঙ্কল্পের নিষ্ঠা দেখে। একাকী দুস্তর দুর্গম পথ অতিক্রম করেছে সে শুধুমাত্র হরিনাম সম্বল করে। আরও বিস্মিত হলেন স্বপ্নবৃত্তান্ত শুনে। কে এই ভাগ্যবান কিশোর, মহাপ্রভু স্বয়ং যাকে প্রেমধর্ম গ্রহণের নির্দেশদান করেন ? মনে মনে ভাবেন বৈষ্ণবাচার্য।

কৌতূহলী হয়ে স্নেহার্দ্র কণ্ঠে জিগ্‌গেস করলেন,—বাছা, তোমার নামটি তো বললে না ?

আমার নাম দুখী। প্রত্যুত্তরে বলে ওঠে আগন্তুক।

অকস্মাৎ ভাবাবেগে চঞ্চল হয়ে বৈষ্ণবাচার্য বলে ওঠেন,—না না বাছা, তোমার নাম দুঃখী হতে পারে না। পিতামাতার একমাত্র স্নেহের দুলাল হয়ে সংসারের টানকে পেছনে ফেলে, যে সর্বদাই কৃষ্ণ-নামের অমৃত আস্বাদনে রত, সে তো দুঃখী নয়। সে হলো কৃষ্ণদাস। বাছা, আজ থেকে তোমার নাম হলো কৃষ্ণদাস।

আনন্দবিহ্বল হয়ে পরম বৈষ্ণব হৃদয়চৈতন্য গৌরবিগ্রহের সম্মুখে সেই মুহূর্তেই কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত করলেন নবাগত কিশোরকে। নাম হলো কৃষ্ণদাস। সেই দিন থেকে অম্বিকা-কালনার বৈষ্ণব-সমাজে দুখী পরিচিত হয়ে উঠলেন দুঃখী কৃষ্ণদাস নামে।

এই দুঃখী কৃষ্ণদাসই হলেন বৈষ্ণবসমাজের বিখ্যাত গোস্বামী শ্যামানন্দ। যিনি একদিন উড়িষ্যার শত শত আর্ত মুমুক্ষু মানুষকে বৈষ্ণবধর্মে করেছিলেন দীক্ষিত। শ্রীচৈতন্যের অন্তর্ধানের পর আর একবার উড়িষ্যাবাসীর মনের মাটিকে সিক্ত করে তুলেছিলেন। ভক্তি-রসামৃত সুধা পান করিয়ে। জীবনের তত্ত্বকঠিন ভাবনার পিপাসাকে দিয়েছিলেন মিটিয়ে। ভক্তপ্রাণ নূতন করে হয়ে উঠেছিল সঞ্জীবিত। সেই সময়। তাইতো বৈষ্ণবেরা বলতেন শ্যামানন্দ গোস্বামী শ্রীল অদ্বৈতপ্রভুর দ্বিতীয় প্রকাশ।

১৩৩৪ শকে চৈত্র পূর্ণিমা তিথিতে আবির্ভূত হন শ্যামানন্দ। পিতা শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডল আর মাতার নাম দুরিকা। জাতিতে সদ্‌গোপ। গৌড়দেশ থেকে উড়িষ্যার দণ্ডেশ্বরের অন্তর্গত ধারেন্দা-বাহাদুরপুর এসে সংসার পাতেন কৃষ্ণ মণ্ডল। সংসার পাতলেন কিন্তু সংসার জমলো না। উপর্যুপরি অনেকগুলি সন্তানের অকাল মৃত্যু হলো। সংসার হলো অশান্তিপূর্ণ। অবশেষে এই সন্তানটিই বেঁচে যায়। দুঃখের সংসারে এসেছে বলে বাপে মায়ে নাম রাখলেন, দুঃখীরাম। লোকে বলতো দুখী।

তখন বাংলা ও উড়িষ্যার মাটিতে শ্রীগৌরসুন্দরের প্রেমধর্মের বন্যা

প্রবাহিত হয়ে' চলেছে। আর সেই প্রেমধর্মের বন্যায়ই ভেসে গেলেন কিশোরী দুখীরাম। বাল্যকাল হতেই ভক্তিধর্মের যে বীজ তাঁর অন্তরে আরোপিত হয়েছিল বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেই বীজই অঙ্কুরিত হয়ে উঠলো। গৌর অন্ত প্রাণ। গৌরভাবে বিভোর। দেহ মন আত্মা ব্যাকুল হয়ে ওঠে গৌর দর্শনের আকাঙ্ক্ষায়। অবশেষে সত্য সত্যই শ্রীগৌরসুন্দর একদিন হাতছানি দিয়ে কাছে টেনে নিলেন। তাইতো স্নেহময়ী জননীর স্নেহশৃঙ্খলকে অনায়াসে ছিন্ন করে ছুটে গেলেন কালনায়। শ্রীগৌরসুন্দরের মন্দিরপ্রাঙ্গণে। পরম বৈষ্ণব হৃদয়-চৈতন্যের আশ্রয়ে। তারপর শুরু হলো নবীন সাধকের কঠোর সাধনার জীবন।

গুরু হৃদয়চৈতন্য ঠাকুরের গৃহমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত গৌরবিগ্রহের সেবায় নিয়োজিত হলেন নবীন সাধক। কঠোর তপশ্চর্যা ও বৈষ্ণবীয় আচারনিষ্ঠার মধ্য দিয়ে দিন অতিবাহিত হতে লাগলো কৃষ্ণদাসের। বিগ্রহের স্নানের জন্য গুরুর আদেশে গঙ্গা থেকে মাথায় করে জল বহন করে আনেন নবীন শিষ্য। ভারী জলের ভাণ্ডটি মাথায় করে বইতে বইতে তার মাথায় দুরারোগ্য ঘা জন্মে গেল। নবীন সাধকের কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। গৌরবিগ্রহের সেবায় আত্মহারা। কৃষ্ণচিন্তায় বিভোর। অকস্মাৎ একদিন শিষ্যকে মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করতে গিয়ে গুরু দেখলেন, এক বৃহৎ ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে শিষ্যের মস্তকে। প্রশ্ন করে জানলেন গঙ্গাজল বহন করেই এ ক্ষতের হয়েছে সৃষ্টি। কিন্তু বিগ্রহের সেবায় বিঘ্ন হবে বলে বলেননি। নবীন শিষ্যের সেবানিষ্ঠা দেখে মুগ্ধ ও অভিভূত হলেন গুরু হৃদয়-চৈতন্য। দুই হাতে আশীর্বাদ করে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, দুখী, সত্যই তুমি কৃষ্ণদাস। সার্থক হয়েছে তোমার নাম। একদিন নিশ্চিত সফল হবে তোমার সাধনা। কৃষ্ণকৃপা ছাড়া এমন হতে পারে না। তোমার মত একজন আচার্যের প্রয়োজন আছে গৌড়ের বৈষ্ণবসমাজে। তাইতো তোমাকে আদেশ করছি বাছা, তুমি

বৃন্দাবনে যাও। শ্রীজীব গোস্বামীর আশ্রয়ে থেকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-শাস্ত্র অধ্যয়ন কর। আমি লিখে দিচ্ছি অনুরোধ পত্র।

শ্রীজীব গোস্বামী তখন ব্রজমণ্ডলের বৈষ্ণবসমাজের মহাআচার্য। আর শ্যামানন্দ- গোস্বামীর দীক্ষাগুরু এই হৃদয়চৈতন্যদেব হলেন শ্রীবাণীনাথের পুত্র ও শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীপাদের ভ্রাতুষ্পুত্র, 'হৃদয়ানন্দ'। মহাবৈষ্ণব গৌরীদাস পণ্ডিতের প্রিয় শিষ্য। তিনি শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ বিগ্রহের সেবাপূজায় আত্মনিয়োগ করেন।

বৈষ্ণব কবি বলেন,

বন্দে শ্রীহৃদয়ানন্দং মগ্নং প্রেমরসে সদা।
মহাভাব-চমৎকার-গৌরভাব কলেবরম্॥

এই মহাপুরুষ পরম বৈষ্ণব হৃদয়চৈতন্যের সাহচর্য লাভ করেই তরুণ সাধক কৃষ্ণদাস মহাভাবের অনির্বচনীয় আনন্দরসের আস্বাদন লাভ করেন। অবশেষে গুরুর আদেশে শোকভারাক্রান্ত হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণদাস গৌরবিগ্রহের সেবা ও গুরুদেবের সাহচর্য ত্যাগ করে শ্রীধাম বৃন্দাবনের পথে যাত্রা করলেন। যাত্রাপথে নবদ্বীপ শান্তিপুর ও গৌরমণ্ডলের বিভিন্ন তীর্থস্থান দর্শন করলেন।

অবশেষে দুরধিগম্য পথ অতিক্রম করে উপস্থিত হলেন শ্রীকৃষ্ণ লীলাভূমি শ্রীধাম বৃন্দাবনে। বৃন্দাবনের মাটি স্পর্শ করেই ভক্তপ্রাণ পুলকিত হয়ে উঠলো। ভাবাবেশে আকুল হয়ে ছুটে এলেন রাধা-কুঞ্জে আর নিপতিত হলেন রঘুনাথদাস গোস্বামীর চরণে। আগন্তুক তরুণ বৈষ্ণব সাধককে স্নেহালিঙ্গন দিলেন রঘুনাথদাস। তারপর শ্রীজীবের আশ্রয়ে যাওয়ার দিলেন নির্দেশ। শ্রীজীবও এই তরুণ বৈষ্ণবের আচরণে মুখের ভাষায় আর চোখের দৃষ্টিতে বিষয়বাসনার কোন প্রমাণ না পেয়ে মুগ্ধ হলেন। আর এইখানেই তিন প্রভুর তিন আবেশাবতারের মিলনে গৌরলীলার দ্বিতীয় অধ্যায় প্রকাশের সূত্র হলো রচিত। ভবিষ্যতের এই তিন বৈষ্ণবাচার্য হলেন শ্রীনিবাস, আচার্য নরোত্তম ঠাকুর আর শ্যামানন্দ গোস্বামী। এই তিন বৈষ্ণব

জগতের প্রতিভাধরের সাধননিষ্ঠাও ছিল অপূর্ব। ধীরে ধীরে এঁদের মধ্যে এক আত্মিক বন্ধন গড়ে উঠলো। উত্তরকালে এই সাধকত্রয়ী বাংলা ও উড়িষ্যার ধর্ম-সংস্কৃতির জগৎকে করেছিলেন প্রভাবিত। শ্রীজীবের শিষ্যরূপে দুঃখী কৃষ্ণদাস ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়নে মনোনিবেশ করলেন। ক্রমে ক্রমে ব্রজমণ্ডলের বৈষ্ণবসমাজে পরিচিত হয়ে উঠলেন, তাঁর ত্যাগ তিতিক্ষা ও গভীর নিষ্ঠার গুণে। পরম উপলব্ধির পথে উন্নীত হতে লাগলেন।

অধ্যয়ন ভজননিষ্ঠা আর বিগ্রহসেবার মধ্য দিয়ে বৃন্দাবনের দিনগুলি অতিক্রান্ত হতে লাগলো ভক্তসাধক কৃষ্ণদাসের। শ্রীরাধারমণের নিভৃত নিকুঞ্জ-বিহার দর্শনমানসে বৃন্দাবনের নিধুবনের ঝাড়ুদারের কার্যে ব্রতী হলেন। ভাবাবেশে বিভোর হয়ে ঝাড়ু দেন আর রাধারাণীর চরণ দর্শনের জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। ব্যাকুলতাও দিনে দিনে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে লাগলো। রাধাগোবিন্দের অপ্রাকৃত নিকুঞ্জবিহার দর্শনের জন্য শ্রীরাধার ভজন করতে লাগলেন। নিকুঞ্জবনেই রাধাভাবে বিভোর হয়ে সমাধিস্থ হলেন নবীন সাধক। অবশেষে সত্যসত্যই একদিন জনহীন স্থানের স্তব্ধতাকে শিউরে দিয়ে অপূর্ব নৃত্যচঞ্চল ধ্বনি পেলেন শুনতে সাধক। আশার আলোক দেখতে পেয়ে রাধারাণী দর্শনের আরও কঠোর সাধনায় ব্রতী হলেন। নিষ্ঠা সাধনা ও আকুলতা হলো তীব্রতর।

সেদিন কোন্ এক অজানা শক্তির আকর্ষণে ছুটে এলেন নিকুঞ্জবনে। রাত্রি শেষ প্রহরে। আর ধন্য হলেন শ্রীরাধারাণীর চরণ কমলের মঞ্জীর দেখতে পেয়ে। কি অপরূপ সৌন্দর্যমণ্ডিত। তার ঔজ্জ্বল্যের সাথে বিকীর্ণ হচ্ছে দিব্য সৌরভ। বিস্মিত ও হতবাক্ হয়ে সে নূপুর তুলে নিলেন যোগীবর। অকস্মাৎ এক বৃদ্ধা রমণী এসে নূপুর ভিক্ষা করলেন। যোগীবর হৃদয়ঙ্গম করলেন এ নিশ্চিত রাধারাণীর লীলাখেলা। ধীর গম্ভীর স্বরে বললেন, যাঁর নূপুর তাঁকে আসতে বল মা। তারপর শুরু হলো উভয়ের মধ্যে বাগ্‌বিতণ্ডা।

বৃদ্ধা বলেন, সে যে রাজনন্দিনী, তরুণী কেমন করে আসবে লোকালয়ে ?

প্রত্যুত্তরে ভক্তপ্রাণ কৃষ্ণদাস বলেন,

—আমি যে নিজ হাতে পরিয়ে দেবো এ নূপুর তাঁর পায়ে। তিনি না এলে আমার এ সাধ পূর্ণ হবে না মা। মাগো, কৃপা করো। আর ছলনা করো না ছেলের সাথে।

অবশেষে যোগীবর কৃষ্ণদাসের ব্যাকুলতায় সন্তুষ্ট হয়ে বৃদ্ধা রমণী ললিতাসখীর মূর্তিতে আবির্ভূতা হয়ে আশীর্বাদ করলেন, রাধাকৃষ্ণ প্রাপ্তি হোক্।

আর অধীর হলেন জগজ্জননী শ্রীরাধারাণী ভক্তের ব্যাকুলতা দেখে। অপরূপা শ্রীমূর্তিতে দর্শন দিলেন ভক্তকে। ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করলেন। তারপর সেই নূপুর দিয়েই কপালে পরিয়ে দিলেন তিলক। পরমুহূর্তেই পরমানন্দে বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে ফেললেন সাধক দুঃখী কৃষ্ণদাস।

এইভাবে অনেক সময় অতিক্রান্ত হলো। যখন প্রকৃতিস্থ হলেন তখন প্রভাত সূর্যের স্বর্ণকিরণে আলোকিত হয়ে উঠেছে নিধুবনের পুণ্যময় ভূমি। সাধকের হৃদয় তখন প্রেমরসে হয়ে উঠেছে সিক্ত। সেই অলৌকিক অপ্রাকৃত লীলার কথা চিন্তা করে আবার প্রেমানন্দে বিভোর হয়ে পড়লেন। এইভাবে প্রেমসুধারস সমুদ্রে অবগাহন করে মোহাচ্ছন্নের মত গুরু শ্রীজীবের চরণে এসে লুটিয়ে পড়লেন। বললেন সব ঘটনার কথা। রাত্রি শেষ প্রহরের নিধুবনের অপ্রাকৃত লীলার ইতিবৃত্ত।

সবকিছু শুনে শ্রীজীব গোস্বামী শ্রীরাধারাণীর কৃপাপ্রাপ্ত সাধক দুঃখী কৃষ্ণদাসের মুখের দিকে অভিভূত হয়ে তাকিয়ে রইলেন। আরও বিস্মিত হয়ে নয়নগোচর করলেন ভক্তের ললাটে শ্রীমতীর নূপুর লাঞ্ছিত তিলকচিহ্ন। দিব্য তিলক।

স্নেহালিঙ্গন দিয়ে বললেন, বৎস, তুমি শ্যামাপ্রিয়া শ্রীরাধারাণীর

কৃপাপ্রাপ্ত হয়েছো। সাধনায় তোমার সিদ্ধিলাভ হয়েছে। বৈষ্ণব-জগতের তুমি পরম ভাগ্যবান। আজ হতে তোমার নাম আর দুঃখী কৃষ্ণদাস থাকবে না, তোমার নাম হবে শ্যামানন্দ।

পুত্র কন্যা গত হৈলে' হৈল শ্যামানন্দ।
মাতা পিতা দুঃখ সহ পালন করিল॥
এই হেতু দুঃখী নাম প্রথম হইল।
শ্যামাসুন্দরের মহা আনন্দ জন্মাইল॥
শ্যামানন্দ নাম পুনঃ বৃন্দাবনে হইল।
রাধা শ্যামসুন্দরে সুখ জন্মাইল।
জানিয়া শ্রীজীব শ্যামানন্দ নাম থুইল॥

(ভক্তি ৬।৫২)

এ কাহিনী সমগ্র ব্রজমণ্ডলে প্রচারিত হলো। ব্রজমণ্ডলের বৈষ্ণবাচার্যেরা স্বীকৃতি দিলেন শ্যামানন্দ গোস্বামীকে। বৈষ্ণবদের কণ্ঠে কণ্ঠে ধ্বনিত হতে লাগলো গোস্বামী শ্যামানন্দ নাম।

অবশেষে এক শুভদিনে বৃন্দাবন থেকে আবেশাবতার ত্রয়ী শ্রীনিবাস আচার্য, নরোত্তম ঠাকুর আর গোস্বামী শ্যামানন্দ যাত্রা করলেন গৌড়ের পথে। সঙ্গে নিয়ে চললেন বৃহৎ এক কাষ্ঠপেটিকা। অমূল্য বৈষ্ণব গ্রন্থবাজিতে পূর্ণ। তারপর রামসাগরের কিনারায় ঘটলো সেই অভাবনীয় ঘটনা। গ্রন্থপেটিকাকে রত্নপেটিকা মনে করে লুণ্ঠন করলো দস্যুদল। সে ঘটনার সঙ্গে জড়িত হয়ে বনবিষ্ণুপুরের রাজা বীর হাম্বীরের জীবনে এসেছিল আমূল পরিবর্তন। বীর হাম্বীর হয়েছিলেন হরিচরণদাস। রত্ন লুঠ করতে এসে অমৃত পেয়ে গিয়েছিলেন সেদিন দস্যুরাজ বীর হাম্বীর। আর সেদিনের সেই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন শ্যামানন্দ। প্রত্যক্ষদর্শীরূপে প্রেমধর্মের মাহাত্ম্য মর্মে মর্মে করেছিলেন উপলব্ধি।

এদিকে শ্যামানন্দ নাম প্রাপ্তির কাহিনী পল্লবিত হয়ে পৌঁছালো গুরু হৃদয়চৈতন্য গোস্বামীর কানে। উত্তেজিত হয়ে উঠলেন তিনি।

শিষ্য শ্যামানন্দ যখন গুরুদেবের পদবন্দনা করে যুক্তকরে দাঁড়ালেন; তখন ক্রোধান্বিত চিত্তে জিগ্‌গেস করলেন,—গুরুপ্রদত্ত নাম পরিত্যাগ করেছো কেন? এ যে অশাস্ত্রীয় কাজ। অপরাধ স্বীকার করো। উত্তর দাও।

শান্ত কণ্ঠে বললেন, শ্যামানন্দ,

প্রভু, এ সবই তো আপনার কৃপাবলে সম্ভব হয়েছে।

গুরু হৃদয়চৈতন্য আরও ক্রোধান্বিত হয়ে উঠলেন,—ভণ্ড, ছলনা করো না। মিথ্যার আশ্রয় নিও না। তোমাকে ও নাম ও তিলক মুছে ফেলতে হবে।

তারপর নিজের বস্ত্র দিয়েই মুছতে লাগলেন শ্যামানন্দ গোস্বামীর তিলকচিহ্ন।

পরমুহূর্তেই বিস্মিত হলেন হৃদয়চৈতন্য গোস্বামী। এ কি! এ যে দিব্য তিলক! এ কেমন করে মুছে ফেলবো? একমুহূর্তে রাগ দ্বেষ হলো দূরীভূত হৃদয়চৈতন্যের অন্তর হতে। শিষ্যকে বক্ষে জড়িয়ে ধরে আলিঙ্গনাবদ্ধ হলেন। তারপর শুনলেন শ্যামানন্দ গোস্বামীর মুখনিঃসৃত অলৌকিক সে কাহিনী। শ্রীরাধারাণীর অপ্রাকৃত লীলাখেলার ইতিবৃত্ত। হতবাক্ হয়ে সিদ্ধ মহাপুরুষ শিষ্য শ্যামানন্দ গোস্বামীর মুখের দিকে রইলেন তাকিয়ে। তারপর মুগ্ধ চিত্তে উপহার দিলেন রাধাগোবিন্দজীর এক জাগ্রত বিগ্রহ। যে বিগ্রহ তিনি শ্রীধাম বৃন্দাবন থেকে আনিয়েছিলেন। সেই বিগ্রহকে শ্যামানন্দ গোস্বামী প্রতিষ্ঠিত করলেন উড়িষ্যার গোপীবল্লভপুর মঠে। অবশেষে গুরুর আদেশে বিবাহ করে আচার্যজীবন করলেন শুরু। গোস্বামী শ্যামানন্দের লীলাক্ষেত্র হলো উড়িষ্যাপ্রদেশ। উড়িষ্যার জনমানসচিত্তে ভক্তিবাদের অমৃতরসধারার স্রোত দিলেন প্রবাহিত করে। গোস্বামী শ্যামানন্দ গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর প্রেমধর্মকে দার্শনিক মতবাদের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন উড়িষ্যার বৈষ্ণব-সমাজে। তাঁর বিশিষ্ট বারোজন শিষ্য হতে বারোটি বৈষ্ণব শাখার

হয়েছিল উৎপত্তি। প্রধান শিষ্য ছিলেন রয়ণীর রসিক মুরারী। শ্রীরসিকানন্দ।

শ্রেষ্ঠ শাখা রসিকানন্দ আর শ্রীমুরারী।
যার যশোগুণ গায় উৎকল দেশ ভরি ॥
শ্যামানন্দের প্রিয় শিষ্য দুই মহাশয়।
সুবর্ণরেখা নদীতীরে রয়ণী আলয়।

(প্রেম ২০)

শ্যামানন্দ প্রভু গোপীবল্লভপুরের শ্রীশ্রীগোবিন্দজীর সেবাভার ভক্তপ্রবর রসিকানন্দের হস্তেই প্রদান করেছিলেন। ইনিই রচনা করেছেন 'শ্রীশ্যামানন্দ শতক' ও শ্রীমদ্‌ভাগবতাষ্টক।

গোপীবল্লভপুরে প্রেমবৃষ্টি কৈলা।
শ্রীগোবিন্দ সেবা শ্রীরসিকে সমর্পিলা ॥
রসিকানন্দের মহাপ্রভাব প্রচার।
কৃপা করি কৈল দস্যু-পাষণ্ডে-উদ্ধার ॥
ভক্তি-রত্ন দিলা কৃপা করিয়া যবনে।
গ্রামে গ্রামে ভ্রমিলেন লইয়া শিষ্যগণে ॥
দুষ্টের প্রেরিত হস্তী, তারে শিষ্য কৈল।
তারে কৃষ্ণ-বৈষ্ণব সেবায় নিয়োজিল ॥
সে দুষ্ট যবন রাজা, প্রণত হইল।
না গণিলা ঘর কত জীব উদ্ধারিল ॥

(ভক্তি ১৫।৮১-৮৫)

জীবনের শেষভাগে উড়িষ্যারই নৃসিংহপুর গ্রামে বাস করতে লাগলেন। আর আচার্যরূপে বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করেন শ্যামানন্দ গোস্বামী।

ইহলীলা সংবরণের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত প্রেমধর্মের বীজ বপন করেছিলেন জনমানসচিত্তে। অবশেষে এক শুভদিনে মহাবৈষ্ণব গোস্বামী-

পাদ শ্যামানন্দ প্রভু মহালীলায় করলেন প্রবেশ। দুঃখী কৃষ্ণদাস শ্রীকৃষ্ণচরণেই জীবনের একমাত্র তৃপ্তি নিবেদন করেই শ্যামানন্দ হয়েছিলেন।

—সকল ছাড়িয়া রহিনু তুয়া পায়ে জীবনমরণ ভরি॥

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী

উনবিংশ শতাব্দীতে হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানে ব্রাহ্মসমাজের আচার্য বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর অবদানও অমূল্য। সত্যানুসন্ধানী নবীন যুবক একদিন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কেশব সেনের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে ব্রাহ্মধর্মে আকৃষ্ট হন। এবং আপনার স্বভাবসুলভ সরলতা কোমলতা ও প্রেমভক্তি ভাবের দ্বারা সকলের অন্তর স্পর্শ করে ধীরে ধীরে ব্রাহ্মসমাজের আচার্য পদ লাভ করেন। আচার্য বিজয়কৃষ্ণ রূপেই ধর্মজীবনে হয়েছিলেন সুপ্রতিষ্ঠিত। কেশব সেন বলতেন, 'গোঁসাই ভক্তিসিদ্ধ হয়ে গেছে।' আর শিবনাথ শাস্ত্রী বলেন, 'গোঁসাইকে সকলের সামনে দেখিয়ে বেড়ালে, তাঁর এই ভক্তি-সমৃদ্ধ মূর্তি দেখালেই ব্রাহ্মধর্মের ব্যাপক প্রচার হবে। আর কোন প্রচেষ্টা দরকার হবে না।'

কিন্তু অকস্মাৎ একদিন এই ব্রাহ্মধর্মের মহান্ প্রচারকের জীবন-ধারায় চিন্তাজগতে ও ধর্মজীবনে এলো আমূল পরিবর্তন। নিরাকার ব্রহ্মের চিন্তা থেকে চলে এলেন সাকারে। সত্যিকার সাকারে। নিরাকারে ছিল সমচেতনা এবারকার সাকারে সমদৃষ্টি। সর্বত্রই সমদৃষ্টি। দেখলেন সমস্ত জীবে ব্রহ্মের প্রতিভাস। অনুভব করলেন ভগবানের বিচিত্র লীলা বিশ্বময়। অনন্তকে উপলব্ধি করবার জন্য মূর্তির প্রয়োজনীয়তাও উপলব্ধি করলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ও বারদীর লোকনাথ ব্রহ্মচারীর প্রভাবে প্রভাবিত হলেন। তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি হলো তাঁর মনোজগতে। অবশেষে ব্রাহ্মধর্মের প্রচারকের ব্রতও

পরিত্যাগ করলেন। সেবাব্রত ও ভক্তিধর্মকেই জীবনধর্ম করে নিলেন।

মেডিক্যাল কলেজের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির শিক্ষায় শিক্ষিত ডাক্তার আর পাশ্চাত্যের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত ব্রাহ্মসমাজের আচার্য-প্রবর হরিনাম গানে আর ভক্তিসুধাদ্রাবিত মৃদঙ্গের ধ্বনিতে মুখরিত করে তুললেন বঙ্গভূমির মাটি। ভেসে গেল তত্ত্বকঠিন ভাবনার ধর্ম। মধুর নামমাহাত্ম্যে রসসিক্ত হয়ে উঠলো যোগসিদ্ধ দেহের শুষ্ক হৃদয়। আচার্য 'বিজয়কৃষ্ণ' গোস্বামী বিজয়কৃষ্ণে হলেন রূপান্তরিত। গোস্বামী বিজয়কৃষ্ণ ভক্তের প্রাণে নূতন করে দিলেন ভক্তি। ভাব। ভাষা। প্রেম। আর ভক্তের মনের সব দ্বন্দ্ব চাঞ্চল্য সংশয়কে দিলেন শান্ত করে। নামমন্ত্রে। তাঁর প্রভাবজাত ভক্তিবায়ুর স্নিগ্ধ হিল্লোলে নব্য বঙ্গ নবজীবন লাভ করলো।

বাংলা ১২৪৮ সালের ১৩ই শ্রাবণ সোমবার ঝুলন পূর্ণিমা রাত্রে, এই মহাপুরুষ আবির্ভূত হলেন। নদীয়া জেলার দহকুল গ্রামে। মাতুলালয়ে। জন্মসময়ে হঠাৎ কোন কারণ বশতঃ পুলিশ এসে মাতুলালয় ঘেরাও করলে মাতৃদেবী গৃহসন্নিকটে কচুবনে আশ্রয় গ্রহণ করেন। আর সেই স্থানেই জন্মলাভ করলেন পবিত্র এই মহা শিশু। দেবশিশু বিজয়কৃষ্ণ।

পিতৃদেব প্রভুপাদ আনন্দকিশোর গোস্বামী ছিলেন সত্যনিষ্ঠ ও প্রবল ধর্মানুরাগী মহাপুরুষ। ভক্তিশাস্ত্রে ছিল এঁর অগাধ পাণ্ডিত্য। এমন আচারনিষ্ঠ ছিলেন যে, স্বপাকে আহার করতেন আর প্রতিখণ্ড লকড়ি (খড়ি) জলে ধুয়ে নিতেন রান্না করবার পূর্বে। তাইতো জনপদের মানুষেরা বলতো 'খড়ি ধোওয়া গোঁসাই'। 'দামোদর' নামে শালগ্রাম শিলা সর্বদা তাঁর কণ্ঠে আভরণরূপে শোভা পেতো। নয়নজলে ভাসতে ভাসতে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করতেন। ভাগবতের পাতা চোখের জলে ভিজে যেতো, রৌদ্রে শুকিয়ে নিতেন। ভাগবত গ্রন্থ পাঠ করবার সময় ভাবাবেশে বিভোর হতেন। অষ্ট সাত্ত্বিক

বিকার প্রকাশ পেতো। লোমকূপ দিয়ে রক্তোদ্‌গম হতো। লোমগুলি শিমুলের কাঁটার মত দাঁড়িয়ে উঠতো। মাঝে মাঝে 'হরেকৃষ্ণ' —'রাধাশ্যাম' বলে এমন হুঙ্কার দিতেন যে দূরস্থিত লোকেরা শুনে চমকে উঠতো।

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব একদিন কথাপ্রসঙ্গে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীকে বলেন, 'আমি শান্তিপুরে এক গোঁসাইর কথা শুনেছিলাম তাঁর ভাগবত পাঠের সময় প্রতি লোমকূপ হতে রক্তোদ্‌গম হতো, আর তিনি মাঝে মাঝে এমন হুঙ্কার দিতেন যা বহুদূর থেকে শোনা যেতো।'

সে কথা শুনে গোস্বামী প্রভু বলেছিলেন,—'তিনি আমারই পিতা ছিলেন।'

প্রত্যুত্তরে রামকৃষ্ণ বলেন, 'অমন বাপ না হলে কি এমন ছেলে হয়।'

এই গোস্বামীপরিবার ছিলেন অদ্বৈতাচার্যের বংশধর। অদ্বৈতাচার্যের তিরোধানের পর তাঁর বংশধরেরা শান্তিপুরের বিভিন্ন স্থানে বসতি করেন। আচার্য পৌত্র দেবকীনন্দন গোস্বামী আতাবুনিয়া গোস্বামীবাটীর প্রতিষ্ঠাতা। যে স্থানে বাসস্থান নির্মাণ করেন সেখানে আতাবৃক্ষের প্রাচুর্যহেতু 'আতাবুনিয়া গোস্বামীবাটী' নামে প্রসিদ্ধিলাভ করে। আর এই আতাবুনিয়া গোস্বামীবাটীরই সন্তান গোস্বামী আনন্দকিশোর। গোস্বামীপরিবারের বিগ্রহ শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দরজীউ। জাগ্রত বিগ্রহ। অদ্বৈতাচার্যের সময়ে প্রতিষ্ঠিত বলে প্রবাদ আছে।

প্রভুপাদ আনন্দকিশোর তিনবার দারপরিগ্রহ করেন। দু'বার নিঃসন্তান বিপত্নীক হওয়ায় অনেকদিন পর্যন্ত দারপরিগ্রহ করেন নি। অবশেষে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গোপীমাধব গোস্বামীর অন্তিমকালের অনুরোধ উপেক্ষা করতে না পেরে ৫০ বৎসর বয়সে আনন্দকিশোর গোস্বামী তৃতীয়বার বিবাহ করলেন। তৃতীয়া পত্নী স্বর্ণময়ী দেবীর গর্ভেই ব্রজগোপাল ও বিজয়কৃষ্ণের জন্ম হয়।

অগ্রজ গোপীমাধব গোস্বামীর দেহান্তরিতের ঘটনাও বিচিত্র। মৃত্যুর পূর্বদিন শরীর সামান্য অসুস্থ হওয়ায় গোপীমাধব অন্নাহার করলেন না। পরের দিন শরীর সুস্থ, আহারে বসবেন, এমন সময় কবিরাজ গৌর সেন মহাশয়ের হঠাৎ আগমন হলো। গোপীমাধব হাত বাড়িয়ে দিলেন। কবিরাজ নাড়ী দেখেই বললেন, 'সময় হয়ে এসেছে, তীরস্থ করবার আয়োজন করুন।' পরিবারের সকলে প্রথমে পরিহাস মনে করেছিলেন, পরমুহূর্তে সত্যতা অনুভব করে, ভীত ও বিষণ্ণ হলেন। সংকীর্তন সম্প্রদায় এলো, পাড়া-প্রতিবেশীরা সমাবেত হলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই গঙ্গাযাত্রার আয়োজন হলো। গোস্বামী গোপীমাধব দুই হাতে দুটি শসা নিয়ে ভক্ষণ করতে করতে খাটিয়াতে শুয়ে গঙ্গাযাত্রা করলেন। পথিমধ্যে মিষ্টান্নের দোকান থেকে প্রাণ-ভরে রসোগোল্লা আহার করলেন। তারপর আবার খাটিয়াতে এসে উঠলেন। যাত্রা হলো শুরু। বিস্মিত হয়ে সকলেই রহস্য করে বললেন, এ যেন বিবাহ সভায় যাত্রা করছেন। গঙ্গাতীরে উপস্থিত হয়ে গোস্বামী মহাশয় দিব্যদৃষ্টি লাভ করলেন। বললেন প্রিয়তম সহোদর আনন্দকিশোর গোস্বামীকে, আমি দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছি তোমার দুইটি পুত্রসন্তান হবে। সুতরাং আমার অনুরোধ তোমাকে বিবাহ করতেই হবে। পুত্রদ্বয় জন্মগ্রহণ করলে কনিষ্ঠটিকে আমার পত্নীর হস্তে সমর্পণ করো।

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অন্তিম অনুরোধ রক্ষা করেছিলেন আনন্দকিশোর গোস্বামী, তৃতীয় বিবাহ করে। প্রথম পুত্র জন্মগ্রহণের পর সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করতে করতে শান্তিপুর থেকে শ্রীক্ষেত্রে গিয়েছিলেন আনন্দ-কিশোর গোস্বামী। দেড় বৎসরে পুরীধামে পৌঁছেছিলেন। পুরী-ধাম থেকে গৃহে ফিরবার কিছুদিনের মধ্যেই স্বর্ণময়ী দেবীর গর্ভে আবির্ভাব হলো দ্বিতীয় সন্তানের। দৈহিক সৌন্দর্যও দিনে দিনে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হলো। অপরূপ লাবণ্যমণ্ডিত হয়ে উঠলেন। প্রতি সূর্যরশ্মিতে দেখতে লাগলেন রাধাকৃষ্ণকে? আরও

কত সব বিচিত্র দেবদেবী। আর এই দ্বিতীয় সন্তানই হলেন বিজয়কৃষ্ণ।

নবজাত শিশুর অষ্টম মাসে মহা সমারোহে অন্নপ্রাশন ও নামকরণ উৎসব সম্পন্ন হলো। পিতৃদেব নাম রাখলেন বিজয়কৃষ্ণ। রাশিনাম হলো দিগ্‌বিজয়। অপরূপ লাবণ্যমণ্ডিত শিশুকে দর্শন করে মুগ্ধ ও আনন্দিত হলেন পাড়া-প্রতিবেশীরা।

শৈশবকাল থেকেই তাঁর ভক্তিভাবও ফুটে উঠতে লাগলো। সকাল সন্ধ্যা তুলসীতলায় গড়াগড়ি দেয় ছোট্ট শিশু। তুলসীবৃক্ষে জল সিঞ্চন করে কোমল ছোট ছোট দুটি হাত দিয়ে। আর এই শৈশবকাল থেকেই গৃহবিগ্রহ শ্যামসুন্দরের উপরও ভক্তি শ্রদ্ধা ভালবাসা স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রবল হয়ে উঠতে লাগলো বিজয়-কৃষ্ণের।

একদিন জননী স্বর্ণময়ী শ্যামসুন্দরের মঙ্গল আরতি দর্শন করে কিছুক্ষণ পরে ঘরে এসে দেখেন পুত্র বিজয় শয্যায় নেই। উদ্বিগ্ন মাতা অনুসন্ধান করতে করতে দেখলেন এক অভাবনীয় ব্যাপার। ছোট্ট বিজয় কথা বলছে, শ্যামসুন্দরের সঙ্গে। শ্রীমন্দিরের রুদ্ধদ্বার ঠেলাঠেলি করে খুলতে চেষ্টা করছে, আর খুলতে না পেরে শ্যাম-সুন্দরকে কাকুতি-মিনতি করছে। কিন্তু যখন সকল চেষ্টা ব্যর্থ হলো তখন শ্রীবিগ্রহকে শাসাচ্ছে, একটু পরে যখন দরজা খুলবে তখন তোমায় কে বাঁচায় দেখবো?

তারপর ছোট্ট একটা লাঠি হাতে দাঁড়িয়ে রইলো। ইতিমধ্যে পুরোহিত এসে দরজা খুললেন। কিন্তু উপবীত হয় নি বলে ছোট্ট বালককে শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করতে দিলেন না। তখন বালক ক্রোধান্বিত হয়ে শ্যামসুন্দরকে বললেন,—'আমার ভাঁটা চুরি করে পালিয়ে এসেছো, আবার আমাকে ঘরে ঢুকতে দিলে না। আচ্ছা কাল আবার খেলতে এসো? আমি এর প্রতিশোধ না নিয়ে জল গ্রহণ করবো না।' সত্য সত্যই ছোট্ট বিজয় জল অন্ন কিছুই গ্রহণ

করলো না। আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনাই প্রত্যক্ষ করলেন স্বর্ণময়ী দেবী।

অবশেষে রাত্রিতে শয়নগৃহে খাবার ঢেকে রাখলেন মাতা। বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে মধ্যরাত্রিতে জননী দেখলেন শয্যাত্যাগ করে প্রেমাবিষ্ট বালক শ্যামসুন্দরকে বলছে—যাক্ আমার কাছে ঘাট মানিলে, তাই বাঁচলে। নইলে আজ ভাল করে মজা দেখাতাম।

আবার বলছে,—আমি যেন ভাই তোমার উপর রাগ করে খাই নাই। তুমি কেন খেলে না?

এইরূপ অলৌকিক ঘটনা দেখতে দেখতে স্বর্ণময়ী দেবী অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলেন।

পরদিন জিজ্ঞেস করলে বালক কিছুই বলতে পারলো না। তবে সেই রাত্রিতে পুরোহিত স্বপ্ন দেখলেন ঠাকুরের মধ্যাহ্নিক ভোগ হয় নি।

অবশেষে ১২৫১ সনে শিষ্যবাড়ি শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করতে করতেই চৈতন্য হারালেন পিতৃদেব আনন্দকিশোর গোস্বামী। সেই অবস্থায়ই গোপীনাথপুরের খামার বাড়িতে আনা হলো। তারপর অক্ষয় তৃতীয়া দিবসে সমাধিযোগে নিত্যধামে গমন করলেন গোস্বামী প্রভু আনন্দকিশোর।

কনিষ্ঠ পুত্র বিজয়কৃষ্ণকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃবধূর হাতে দত্তক স্বরূপ প্রদান করবার পূর্বেই গোস্বামী আনন্দকিশোর নিত্যানন্দধামে গমন করলেন। বিধবা পত্নী স্বর্ণময়ী দেবীই শেষে পাঁচ বৎসরের শিশু বিজয়কৃষ্ণকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃজায়া কৃষ্ণমণির হাতে দত্তক প্রদান করে স্বামীর প্রতিশ্রুতি পালন করলেন। বিজয়কৃষ্ণ কৃষ্ণমণির প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন না। উপনয়ন সংস্কারের পূর্বেই বালক অবস্থায়ই বিজয়কৃষ্ণের দত্তক গ্রহিত্রীমাতা কৃষ্ণমণি দেহলীলা সংবরণ করলেন।

আবার লালিত-পালিত হতে লাগলেন গর্ভধারিণী জননী স্বর্ণময়ী দেবীর স্নেহে যত্নে। স্বর্ণময়ী দেবীর চরিত্রও অনুপম। সর্বভূতে দয়া,

দীন দুঃখীর প্রতি সমবেদনা ভগবদ্ভক্তি আতিথেয়তা প্রভৃতি সদ্‌গুণের অধিকারিণী ছিলেন তিনি।

মায়ের স্নেহ ভালবাসা ও উদার হৃদয়ের কথা প্রসঙ্গে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী উত্তরকালে বলেন,

তিনি দাসীপুত্রকেও আমাদের সঙ্গে তুল্যরূপ ভালবাসতেন। একখানা থালা একটা ঘটি একটা গ্লাস একখানা পিঁড়ি তাকেও নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন। এ বিষয়ে তিনি অপরের কথায় কর্ণপাত করতেন না। বরং দাসীপুত্র বলে অবজ্ঞা করলে বেদনা অনুভব করতেন। বলতেন, আহা! 'কৃষ্ণের জীব সকলেই সমান।'

এই স্বর্ণময়ী দেবীর জন্মবৃত্তান্ত ও জীবনলীলাও বড় বিচিত্র। নানা অলৌকিক ঘটনায় পূর্ণ।

বিজয়কৃষ্ণের মাতামহ শ্রীগৌরীদাস জোদ্দার বহুদিন পর্যন্ত নিঃসন্তান ছিলেন। কর্মজীবনে তিনি ছিলেন নীলকর সাহেবদের অধীনস্থ কর্মচারী। সংসারে প্রাচুর্যের অভাব ছিল না। কিন্তু মনে বড়ই অসুখী ছিলেন। কোনও সন্তান লাভ হয়নি বলে। অবশেষে অধীর হয়ে এক ফকিরের শরণাপন্ন হলেন। ফকির সবকিছু শুনে বললেন, 'যদি কথা দাও প্রথম সন্তান হলে আমাকে প্রত্যর্পণ করবে তাহলে ব্যবস্থা করতে পারি।'

ফকিরের কথায় সম্মতি জ্ঞাপন করলেন গৌরীদাস। মনে মনে ভাবলেন সন্তান হলে ফকিরের হাতে পায়ে ধরে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করানো যাবে।

তারপর সেই ফকিরের কৃপায় সত্যসত্যই এক কন্যা-সন্তান লাভ করলেন। এই কন্যাই হলেন স্বর্ণময়ী দেবী। এবং ফকিরকে অনুনয় বিনয় করে সন্তানকে ঘরে রাখলেন বটে, কিন্তু দিনে দিনে কন্যার মধ্যে দৈবভাব প্রবল হয়ে উঠতে লাগলো। জনপদের মানুষেরা বলতেন ঐ ফকিরই তাঁর মধ্যে আবিষ্ট হতেন। মাঝে মাঝে তাঁর মধ্যে পাগলামি খুবই প্রবল হয়ে উঠতো। দিব্যপ্রভায় সমুজ্জ্বল

মুখের দিকে তাকিয়ে কিন্তু ঠিক পাগল বলে স্বীকার করে নিতেও কারো মন চাইত না। উত্তরকালে মাতৃদেবী সম্বন্ধে বিজয়কৃষ্ণকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন,—'ওঁর জীবন্মুক্ত অবস্থা। ধর্ম সম্বন্ধে কোন বিশেষ অবস্থাতে লোকে উঁহাকে পাগল বলিয়া মনে করে. কিন্তু বাস্তবিক উনি পাগল নন। কারণ সেই অবস্থাতে যে সকল ঘটনা ঘটে, তাহা সমস্ত স্মরণ থাকে। পাগলদের তাহা থাকে না।'

একবার স্বর্ণময়ী দেবী কোথায় অন্তর্ধান হয়ে গেলেন। অনেক অনুসন্ধান করেও পাওয়া গেল না। অকস্মাৎ একদিন রাণাঘাট স্টেশনে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী কয়েকজন কাঠুরিয়ার মধ্যে আলাপ আলোচনার সূত্র ধরে জননীর সন্ধান পেলেন। তারা বলছিলো, 'জঙ্গলের মধ্যে আশ্চর্য ব্যাপার দেখলাম। একটি উলঙ্গ স্ত্রীলোক একটি বাঘের গায়ে মাথা দিয়ে শুয়ে আছে।' তারপর গ্রামের লোকের সাহায্যে রাণাঘাটের সন্নিকটে জঙ্গলের গভীরে প্রবেশ করে সত্য-সত্যই জননীর দর্শন লাভ করলেন। বাঘের দেহে হাত বুলিয়ে দিয়ে স্বর্ণময়ী দেবী বলছেন, তুই যদি আমার হ'স, তবে আমাকে পিঠে কর না। তুই আমার নয়, তুই দশভুজার আর আমি কালী। আচ্ছা তুই ঘুমো, আমি তোর খাবার নিয়ে আসি। এই বলেই ধীরে ধীরে জঙ্গলের বাইরে চলে এলেন। সেই মুহূর্তেই বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী গিয়ে জননীর পায়ে ধরে কাঁদতে লাগলেন। স্নেহময়ী জননী পুত্রকে দেখে চিনলেন এবং পুত্রের অনুনয় বিনয়ে—স্নেহে বিগলিত হয়ে পুত্রের সঙ্গেই ফিরে এলেন গৃহে। দিকে দিকে প্রচারিত হলো এই অলৌকিক ঘটনার কথা।

বিজয়কৃষ্ণের শৈশবের শিক্ষা শুরু হয় শান্তিপুরের ভগবান গুরু-মহাশয়ের পাঠশালায়। হরিভক্তিপরায়ণ শিক্ষকের সংস্রবে শিক্ষা-লাভ করে বিজয়কৃষ্ণের বাল্যজীবন অপূর্ব এক ভক্তিভাবে হয়ে উঠে-ছিল সমুজ্জল।

অকস্মাৎ একদিন সেই গুরুমহাশয়ও সজ্ঞানে নিত্যধামে গমন

করলেন। পাঠশালা উঠে গেল। বিজয়কৃষ্ণের শিক্ষাজীবন শুরু হলো হেজল সাহেবের বিদ্যালয়ে। হেজল নামে এক পাদ্রী সাহেব শান্তিপুরে বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। এখানে তিনি সংস্কৃত বিভাগে পাঠ আরম্ভ করলেও ভক্তিসহকারে বাইবেল পাঠ করেন। বাই-বেলের প্রতি অনুরক্ত দেখে হেজল সাহেব খুবই স্নেহ করতেন বিজয়-কৃষ্ণকে। দুই ভাবধারার অপূর্ব সমন্বয় তার চরিত্রের মধ্যে পরিস্ফুট হয়ে উঠতে লাগলো বাল্যকাল হতেই। ধর্মের কুসংস্কারগুলি কখনও মনের মধ্যে স্থায়িত্বলাভ করতে সক্ষম হয়নি। এক বিশাল উদার হৃদয় ধীরে ধীরে অনন্তের চিতায় বিভোর হয়ে উঠতে লাগলো।

শান্তিপুরের গোবিন্দ ভট্টাচার্যের টোলেও কিছুদিন অধ্যয়ন করেন বিজয়কৃষ্ণ। অসাধারণ মেধাবলে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ব্যাকরণ ও সাহিত্যে বুৎপত্তি লাভ করেন।

উপনয়ন সংস্কারের পর উপগুরু পণ্ডিতপ্রবর কৃষ্ণগোপালের চতুষ্পাঠীতে বেদান্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। উপনয়নের পর কুলপ্রথা অনুসারে বিজয়কৃষ্ণ তাঁর মাতার নিকট হতেই দীক্ষা গ্রহণ করলেন। স্ত্রীলোকের নিকট হতে দীক্ষা গ্রহণ করতে হলে একজন সদাচারী ব্রাহ্মণকে 'উপগুরু'রূপে শিক্ষাদানের অনুষ্ঠানগুলি সম্পাদন করে দিতে হয়। স্ব ইচ্ছায়ই বিজয়কৃষ্ণ—সে সময়ের অদ্বিতীয় পণ্ডিত ও ধর্মনিষ্ঠ আচার্য কৃষ্ণগোপালকে উপগুরুরূপে নির্বাচন করলেন।

বালক বিজয়কৃষ্ণ সম্বন্ধে পণ্ডিতপ্রবর কৃষ্ণগোপাল বলছেন, 'শৈশবেই বালকের হৃদয়ে সদ্‌গুণরাজি প্রস্ফুটিত হইয়াছিল। পৃথিবীতে পরপীড়ন, ব্যথা, হাহাকার দেখিয়া তাঁহার হৃদয় মমতায় ভরিয়া যাইত। বিজয় জাতিস্মরের ন্যায় স্বতঃই জীবে দয়া ও ভগবানে ভক্তি এই দুইটিকেই শ্রেষ্ঠ ধর্মরূপে গ্রহণ করিয়াছিল। দীক্ষা গ্রহণের পর বিজয় 'হরিবোল' হইয়া উঠিল। প্রতিদিন স্বহস্তে পুষ্পচয়ন করিয়া শ্যামসুন্দরের পূজা করিত। এরূপ পুণ্যের সংসারে ধর্মের ক্ষেত্র-মধ্যে পারিপার্শ্বিক শুভ সংযোগে সর্বোপরি পূর্বজন্মার্জিত এত অধিক

উচ্চ সংস্কার লইয়া যাহার জন্ম সে যে ভবিষ্যতে এই দাবদগ্ধ সংসারকে স্বর্গের সুষমায় পরিণত করিবে তাহার আর আশ্চর্য কি ?'

বিজয়কৃষ্ণের অধ্যাপক পণ্ডিতপ্রবর বনমালী ভট্টাচার্য বলছেন, —'বয়োবৃদ্ধির সহিত বিজয়ের চঞ্চলতা ও চতুরতা প্রভৃতি ভাবগুলি তেজস্বিতা ধর্মপ্রবণতা প্রভৃতি গুণগ্রামে পরিণত হইয়াছিল। এই সময়ে দেশে সর্বপ্রকার দুর্নীতি কুপ্রথা ও কুসংস্কার বৃদ্ধি পাইয়াছিল। শিক্ষিত সম্প্রদায়ও তাহার প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই। এই দুরবস্থা অবলোকন করিয়া দেশের সর্বপ্রকার কুসংস্কার ও কুপ্রথা নিবারণ, লোকের ক্লেশ দূরীকরণ এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ জন্য বিজয় একটি দল গঠন করিয়াছিলেন। তাহার তেজস্বিতা ও পরদুঃখকাতরতার মধ্যে এমন সরলতা ও মধুরতা ছিল—তাহার শাসনের মধ্যেও এমন সদাশয়তা ও সহৃদয়তা অপেক্ষা করিত যে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি মাত্রেই তাহার হৃদয়ের সৌন্দর্য উপলব্ধি করিতে পারিতেন।'

'তাঁহার নৈতিক চরিত্র অতিশয় উন্নত ছিল। কখনও তাঁহাকে নীতিবিগর্হিত কার্য করিতে দেখি নাই। উদ্দাম যৌবনের কোনরূপ চপলতা তাঁর দেবচরিত্রকে স্পর্শ করিতে পারে নাই।'

১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে বিজয়কৃষ্ণ উচ্চ শিক্ষার জন্য কলকাতা সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করলেন। সে সময়ে নব্য বঙ্গের যুবকেরা উদ্ধত প্রকৃতি ও উন্মার্গগামী হয়ে পড়েছিলেন। এবং অভিভাবকহীন হয়ে কলকাতায় বাস করবার জন্য নৈতিক চরিত্রকে উন্নত রাখা খুবই দুরূহ ছিল। শিবনাথ শাস্ত্রী ঠিক সেই সময়ের বঙ্গসমাজ সম্বন্ধে লিখছেন, ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দ হতে ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে বিধবা বিবাহের আন্দোলন, ইণ্ডিয়ান মিউটিনি, নীলের হাঙ্গামা, হরিশের আবির্ভাব, সোমপ্রকাশের অভ্যুদয়, দেশীয় নাট্যালয়ের প্রতিষ্ঠা, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের আবির্ভাব, কেশবচন্দ্রের ব্রাহ্মসমাজে নব শক্তি-সঞ্চার প্রভৃতি ঘটনা ঘটিয়াছিল। ইহার প্রত্যেকটি বঙ্গসমাজকে প্রবলরূপে আন্দোলিত

করিয়াছিল। এই প্রবল তরঙ্গের মধ্যেও বিজয়কৃষ্ণের মন ধীর স্থির ও প্রশান্ত ছিল। কণ্ঠে তুলসীমালা, মস্তকে শিখা ও ললাটে তিলক রেখা এবং ধর্ম অনুষ্ঠানাদিতে গভীর অনুরাগ দেখে বন্ধুরা বিস্ময় প্রকাশ করতেন। এই সময়ই তাঁর আশৈশব অন্তরঙ্গ বন্ধু রামময় ও কৃষ্ণময় ভট্টাচার্য খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেন। ধীরে ধীরে অন্তরঙ্গ বন্ধুদের প্রভাবে সংশয়বাদী হয়ে উঠেছিলেন বিজয়কৃষ্ণ।

বেদান্ত শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হয়ে বৈদান্তিক হয়ে পড়লেন। কৌলিক ধর্মাচরণে তাঁর যে ঐকান্তিক অনুরাগ প্রবল বিশ্বাস ও অবিচলিত নিষ্ঠা ছিল তাও তিরোহিত হতে লাগলো। এই ধর্মমত পরিবর্তনের সূচনা প্রসঙ্গে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী বলেছেন,

গোস্বামী প্রভুর ভাষায়,—

'হিন্দু শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া ঘোর বৈদান্তিক হইয়া পড়িলাম। তখন সমস্ত পদার্থ ব্রহ্ম অহং ব্রহ্ম এই বিশ্বাস করিতাম। উপাসনার আবশ্যকতা স্বীকার করিতাম না।'

সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়নরত অবস্থায়ই বিজয়কৃষ্ণের বিবাহ সংস্কারও সম্পন্ন হয়। রামচন্দ্র ভাতুড়ীর কন্যা যোগমায়া গৃহবধূ হয়ে এলেন। তখন তাঁর বয়ঃক্রম ছিল মাত্র ছয় বৎসর। অভিভাবকবিহীন, দারিদ্র্য-ক্লিষ্টা বালবিধবা শ্বশ্রূঠাকুরাণী তাঁর জননী ও কনিষ্ঠা কন্যাটি এই-সময় হতেই বিজয়কৃষ্ণের পরিবারভুক্ত হয়ে পড়েন। তাইতো বন্ধুরা কৌতুক করে বলতেন, 'বিজয় বিবাহে তিনটি জীবন্ত যৌতুক প্রাপ্ত হইয়াছেন।'

যোগমায়া দেবী অবশ্য উত্তরকালে গোস্বামী বিজয়কৃষ্ণের যোগ্য পত্নী হয়ে উঠেছিলেন। পতির ধর্মসাধনে আজীবন তাঁকে সহায়-স্বরূপ দেখা গেছে। চিরদিন তাঁকে ঘোর দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করতে হয়েছে। কিন্তু কখনও বিষাদক্লিষ্ট হননি। সদানন্দময়ী ছিলেন। অধরপ্রান্তে মৃদু হাস্যরেখা নিয়ত অঙ্কিত থাকতো।

অবশেষে সংস্কৃত কলেজের পাঠ সমাপ্ত করে মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হলেন শাস্ত্রবিদ্ বিজয়কৃষ্ণ। পণ্ডিত এবার ধীরে ধীরে শল্যবিদ

পণ্ডিতে রূপান্তরিত হতে লাগলেন। চিকিৎসা বিদ্যায় পারদর্শী হয়ে দুঃস্থ আর্তের সেবায় জীবন উৎসর্গ করবেন স্থির করলেন। সেবাব্রতই হবে জীবনব্রত।

সে সময়ে তরুণ-বঙ্গ ব্রাহ্মসমাজের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিল। তরুণ বিজয়কৃষ্ণও ব্রাহ্মসমাজে বেদ ও উপনিষদ পাঠ ও ব্যাখ্যা শুনতে নিয়মিতভাবে যাতায়াত করতে লাগলেন। এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কেশব সেনেরবক্তৃতা শুনে অনুপ্রাণিত হয়ে ব্রাহ্মধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়লেন। তারপর এক শুভদিনে নূতন ধর্মে দীক্ষিত হয়ে ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হলেন। ব্রাহ্মসমাজও তরুণ সাধক বিজয়কৃষ্ণকে সাদরে গ্রহণ করলেন। বিজয়কৃষ্ণ তখন চিকিৎসা বিদ্যার শেষ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। অকস্মাৎ ব্রাহ্মসমাজের নিকট হতে আহ্বান এলো প্রচারকের ব্রত গ্রহণ করবার। চিকিৎসক জীবনের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎকে তুচ্ছ করে সেই মুহূর্তেই প্রচারকের কাজে যোগ দিলেন বিজয়কৃষ্ণ। তরুণ বিজয়কৃষ্ণ হলেন, ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক আচার্য বিজয়কৃষ্ণ। প্রচারকের কার্যে ব্রতী হয়ে বিজয়কৃষ্ণ যশোহর খুলনা বরিশাল ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জের বিভিন্নস্থানে পরিভ্রমণ করতে লাগলেন।

ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকরূপে বিজয়কৃষ্ণ উত্তর-পশ্চিম ভারতও পরিভ্রমণ করেন। এই সময়ে একদিন কাশীর মণিকর্ণিকার ঘাটে ক্লান্ত হয়ে বিশ্রাম করছেন, অকস্মাৎ সম্মুখে আবির্ভূত হলেন কাশীর জীবন্ত শিব ত্রৈলঙ্গস্বামী। প্রথম দর্শনেই গুরু চিনলেন শিষ্যকে। ইঙ্গিত করলেন, স্নান করে আসতে। কিন্তু আচার্যপ্রবর আপত্তি জানালেন। কারণ ক্লান্তিবোধ করছিলেন।

স্বামীজী বললেন,—'আমি তোমাকে মন্ত্র দিব।'

প্রত্যুত্তরে আচার্য বললেন,—'আমি মন্ত্র নিয়েছি, মায়ের নিকট হতে।'

স্বামীজী বললেন, 'আমিও দিব।

আচার্যপ্রবর বললেন,—'আমরা ব্রাহ্মসমাজের লোক, আমার বিশ্বাস হয় না।'

এবারে স্বামীজী মৃদু হেসে বললেন, 'ও ত আচ্ছা, আমরাও ব্রাহ্মসমাজের লোক।'

এবারেও যখন আচার্যপ্রবর আপত্তি জানালেন তখন ত্রৈলঙ্গস্বামী বলপূর্বক বিজয়কৃষ্ণকে ধরে নিয়ে গিয়ে গঙ্গায় স্নান করালেন। তারপর কানে দিলেন মন্ত্র। শিব মন্ত্র। অবশেষে বললেন, বসন্তের দাওয়াই যেমন বসন্ত, তেমন মন্ত্র দিলাম। অন্য কথা কানে লাগবে না। বিষয় তৃষ্ণা থাকবে না। 'ইয়াদ্ রাখ্, হাম তুমহারা গুরু নেহি।' ত্রৈলঙ্গস্বামী মন্ত্রচৈতন্য দিলেন ব্রাহ্মসমাজের আচার্য বিজয়কৃষ্ণকে।

ত্রৈলঙ্গস্বামী সম্বন্ধে উত্তরকালে বিজয়কৃষ্ণ বলেছিলেন ভক্ত বৃন্দাবনবাবুকে। বিজয়কৃষ্ণের ভাষায়, 'ত্রৈলঙ্গস্বামী লোক-শিক্ষার জন্য হাজার শিবলিঙ্গ মাঝে মাঝে পূজা করিতেন, আর অঘোরভাবে কাঁদিতেন। পরে যখন গুরুজী আমাকে গয়ায় কৃপা করিলেন, তখন ত্রৈলঙ্গস্বামীর মন্ত্রের কথা আমার মনে ছিল না। কাশীতে গিয়া দেখি তিনি হঠ্‌যোগাদি ছাড়িয়া অজগর বৃত্তি নিয়াছেন। হঠ্‌যোগ ছাড়িলে শরীর অত্যন্ত খারাপ হয়। ওঁরও সেইরূপ হইয়াছিল। গিয়া নমস্কার করিলে, দক্ষিণ বাহুর নিচ দিয়া আমার দিকে তাকাইলেন। চিনিয়া ফেলিলেন। লিখিলেন—'ইয়াদ হ্যায়?' বলিলাম হাঁ। গায়ে হাত দিয়া আশীর্বাদ করিলেন।

দীক্ষামন্ত্র সম্বন্ধে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী বলেন, মূর্খেই শিবমন্ত্র, বিষ্ণুমন্ত্র বলে। সবই এক মন্ত্র।

এই উত্তরাঞ্চল পরিভ্রমণকালেই বিজয়কৃষ্ণ অকস্মাৎ কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েন। মরণাপন্ন অবস্থা। দুঃসংবাদে বিচলিত হলেন ঢাকার এক প্রিয় শিষ্য। তিনি বারদীর ব্রহ্মচারীজীর শরণাপন্ন হলেন। সকাতরে নিবেদন করলেন, 'আমার আয়ুর দ্বারা গুরুর জীবন

রক্ষা করুন।' শিষ্যের প্রগাঢ় গুরুভক্তি দর্শন করে মুগ্ধ হলেন লোকনাথ ব্রহ্মচারী। প্রত্যুত্তরে বললেন, 'তুমি ঢাকায় ফিরে যাও। দুই দিনের মধ্যেই শুভ সংবাদ পাবে। আমি বিজয়কৃষ্ণের নিকট যাবো।'

অলৌকিক ব্যাপার, লোকনাথ ব্রহ্মচারীর দেহ বারদীতেই বর্তমান ছিল। কিন্তু বিজয়কৃষ্ণের শুশ্রূষাকারীরা লোকনাথ ব্রহ্মচারীজীকে বিজয়কৃষ্ণের শিয়রে উপবিষ্ট দেখতে পেতেন। এই প্রসঙ্গে একজন শিষ্য বলেন,—'সেই পীড়াতে গোঁসাইজীর এমন অবস্থা হইয়াছিল যে, ডাক্তারেরা তাঁহাকে মৃতজ্ঞানে বাহিরে রাখিতে বলিয়াছিলেন, বাহিরে রাখার পর রোগী পুনর্জীবিত হইয়াছেন।'

বিজয়কৃষ্ণের শিষ্যদের বিশ্বাস সে-যাত্রায় বারদীর ব্রহ্মচারীর কৃপায়ই গোঁসাইজী পুনর্জীবন লাভ করেন।

ইতিপূর্বে অবশ্য বিজয়কৃষ্ণ বারদীর ব্রহ্মচারীর সাক্ষাৎলাভ ও কৃপাদৃষ্টি লাভ করেছেন। এই ব্রহ্মচারীজীর প্রভাবে প্রভাবিত হয়েই বিজয়কৃষ্ণ কয়েকবৎসর যাবৎ সমভাবে হরিনাম জপ ও হরি সংকীর্তন করতেন। আর ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা সভায়ও মৃদঙ্গ করতালসহ কীর্তনের প্রবর্তন করেছিলেন।

রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, লোকনাথ ব্রহ্মচারী ও ত্রৈলঙ্গস্বামী আচার্যপ্রবর বিজয়কৃষ্ণের অন্তরজগতে সনাতন হিন্দুধর্মের ভক্তিভাবের যে বীজ বপন করেছিলেন ধীরে ধীরে সেই বীজই অঙ্কুরিত হয়ে বৃক্ষরূপে আত্মপ্রকাশ করতে লাগলো। জীবনের পরমাশ্রয় লাভের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। কখনো অশান্ত হয়ে ওঠে, আবার কখনো বা উদাস হয়ে যায় মন। মনের চাঞ্চল্য তীব্র হতে তীব্রতর হয়ে উঠতে লাগলো। ভারতের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ছোটাছুটি করতে লাগলেন সদ্‌গুরু লাভের জন্য। নর্মদাতীরে এসে পুণ্যসলিলা নর্মদার জল-লহরীর দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে থাকেন। অস্থির হয়ে ওঠে ব্যাকুলের মন।

আবার যাত্রা হয় শুরু। উত্তরাঞ্চলের বিভিন্ন তীর্থস্থান পরিভ্রমণ

করে গয়াধামে এসে উপস্থিত হলেন। সে সময়ের সকল সম্প্রদায়ের সাধু সন্ন্যাসীর সঙ্গেই সাক্ষাৎলাভ হয় বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর। এবং সকলেরই স্নেহধন্য ছিলেন ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক তরুণ সাধক এই বিজয়কৃষ্ণ। তাঁর ভাবভক্তিপূর্ণ শ্রীমূর্তির দিকে তাকিয়ে আর সাহচর্য লাভ করে সকল সম্প্রদায়ের সাধু যোগী ও সাধারণ মানুষ আকৃষ্ট হয়ে পড়তেন।

গয়াধামে এসে সাক্ষাৎ হলো রামাইৎ সাধু রঘুবীর দাসজীর সঙ্গে। তাঁর সঙ্গে আকাশগঙ্গা পাহাড়ের আশ্রমে অবস্থান করতে লাগলেন। এই সময়েই ফল্গুনদীর অপরপারে রামগয়ায় সাক্ষাৎলাভ হয় যোগী-বর গম্ভীরনাথের সঙ্গে। অকস্মাৎ একদিন আকাশগঙ্গা পাহাড়ের শীর্ষভূমিতে সাক্ষাৎলাভ হলো এক যোগসিদ্ধ মহাপুরুষের সঙ্গে। মহাপুরুষ আশীর্বাদ করলেন বিজয়কৃষ্ণকে। প্রথম দর্শনেই বিজয়-কৃষ্ণের অন্তরে ভাবহিল্লোল প্রবাহিত হয়ে চললো। অভাবনীয় অচিন্তনীয় ব্যাপার। এক অনির্বচনীয় আনন্দে ভরপুর হয়ে উঠলো দেহ মন। হৃদয়তন্ত্রীতে এক অপূর্ব রাগিণী যেন উঠলো বেজে। ধীরে ধীরে চৈতন্য হারালেন বিজয়কৃষ্ণ। জ্ঞান ফিরলে আর সে মহাপুরুষকে দেখতে পেলেন না। অলৌকিকভাবে দর্শন দিয়েই অন্তর্ধান হয়েছেন যোগীবর। এবারে অস্থির হয়ে উঠলো বিজয়কৃষ্ণের মন। তীব্র আকর্ষণ অনুভব করতে লাগলেন মহাপুরুষের জন্য। কে এই মহাপুরুষ? মনের কাছে প্রশ্ন করেও উত্তর মিললো না। আবার একদিন আকস্মিকভাবে সাক্ষাৎলাভ হলো রামশিলা পাহাড়ের অরণ্যে সেই মহাপুরুষের সঙ্গে। অকস্মাৎ দর্শন দিয়েই অন্তর্ধান হলেন।

বিস্মিত ও অভিভূত হলেন বিজয়কৃষ্ণ। কিন্তু পরমানন্দ অনুভব করতে লাগলেন মনে মনে। অবশেষে এক শুভদিনে আকাশগঙ্গা পাহাড়ের নিভৃতে দীক্ষা দিলেন মহাপুরুষ, তরুণ সাধক বিজয়-কৃষ্ণকে। ইনিই হলেন সাধক বিজয়কৃষ্ণের গুরু ব্রহ্মানন্দ স্বামী।

পরমহংসজী নামেই সাধুমহলে পরিচিত। পূর্বাশ্রমের দেশ পাঞ্জাবে। প্রথমে ছিলেন নানকপন্থী উদাসী সম্প্রদায়ের। পরবর্তী-কালে ভক্তি সাধকরূপেই আত্মপ্রকাশ করেন। সাধনভূমি মানস-সরোবরে। শুরু হলো বিজয়কৃষ্ণের জীবনে যোগসাধনা। ব্রাহ্ম-সমাজের আচার্য ধীরে ধীরে হিন্দুযোগীরূপে আত্মপ্রকাশ করতে লাগলেন। দীক্ষা গ্রহণের পর একাদিক্রমে এগারো দিন সমাধিমগ্ন হয়ে রইলেন।

অবশেষে গুরুর নির্দেশে কাশীধামে এসে নৈষ্ঠিক সন্ন্যাসী শ্রীহরি-হরানন্দ সরস্বতীর নিকট হতে সন্ন্যাসীর দীক্ষা গ্রহণ করলেন। সন্ন্যাস-নাম হলো অচ্যুতানন্দ সরস্বতী। উত্তরকালে ভক্তদের মধ্যে জটিয়া বাবা বলেও পরিচিত হন। এই সময়ে সংসার ত্যাগের তীব্রতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। সংসার থেকে চিরতরে বিদায় নিয়ে সবচেয়ে বেশী নিরাপদ হয়ে তাঁর সাধনার জীবন যাপন করতে পারবেন। এই ইচ্ছাই তীব্রতর হয়ে ওঠে বিজয়কৃষ্ণের মনে। অকস্মাৎ অলৌকিক-ভাবে গুরু ব্রহ্মানন্দ স্বামী আবির্ভূত হয়ে, সংসার ত্যাগের ইচ্ছা হতে বিরত হতে দিলেন নির্দেশ। এবং আকাশগঙ্গা পাহাড়ের নিভৃতে গিয়ে কিছুদিন সাধনা করবার জন্য করলেন আদেশ।

আবার কাশীধাম থেকে ফিরে এলেন গয়াধামের আকাশগঙ্গা পাহাড়ের নিভৃতে। আসন পাতলেম এক নির্জন গুহায়। সংসারের কোলাহল থেকে অতিদূরে আকাশগঙ্গা পাহাড়ের নিভৃতে এসে বিজয়কৃষ্ণ কঠোর যোগসাধনায় হলেন ব্রতী। দুরূহ সাধনপ্রণালী সম্বন্ধে শিক্ষা দিলেন গুরু ব্রহ্মানন্দ স্বামী। অলৌকিক বিভূতির অধিকারী স্বামী ব্রহ্মানন্দ শিষ্যের প্রয়োজনে আবির্ভূত হয়ে নির্দেশ-দান করে আবার অন্তর্ধান হয়ে যেতেন। ধীরে ধীরে বিজয়কৃষ্ণ দুরূহ সাধনপ্রণালী আয়ত্ত করে যোগসিদ্ধ হয়ে উঠলেন। সাত্ত্বিক সংস্কারবশত অতি অল্পসময়ের মধ্যেই বিজয়কৃষ্ণ যোগসাধনায় সিদ্ধি-লাভ করে অলৌকিক বিভূতির অধিকারী হয়ে উঠলেন। এই সময়ে

সাধক বিজয়কৃষ্ণের মুখমণ্ডল অপার্থিব সৌন্দর্যে অপূর্ব শ্রীমণ্ডিত হয়ে উঠেছিল। অব্যক্ত, অচিন্ত্য, অনির্বচনীয় অবস্থা।

আবার একদিন এই অরণ্যের নিভৃত সাধনার জীবনেরও হলো অবসান। বন্ধুবর্গ ও স্ত্রীর চেষ্টায় ফিরে এলেন কলকাতায়। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ব্রাহ্মসমাজের ভক্তবৃন্দ বিজয়কৃষ্ণকে পেয়ে আনন্দিত হলেন। ঠিক এই সময়ে কেশবচন্দ্রের কন্যার কোচবিহার রাজপরিবারে বিবাহের ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্রাহ্মসমাজে তুমুল আলোড়নের হয়েছে সৃষ্টি। কেশব সেন প্রচারিত নবধর্মের আবির্ভাবে ব্রাহ্মসমাজ দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। কেশব সেনের বিরোধীরা 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ' নাম ধারণ করলেন। বিজয়কৃষ্ণ, শিবনাথ শাস্ত্রী, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় এই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নেতা নির্বাচিত হলেন। আবার ঢাকা শহরে এসে ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকের কার্যে ব্রতী হলেন বিজয়কৃষ্ণ। কিন্তু ভক্তিভাবের সাধকের মন ভক্তিসাধনা হতে বিরত হলো না। সেই ভাবতরঙ্গে মত্ত হয়ে নৃত্য করতে করতে ভজন কীর্তন সমভাবেই চলতে লাগলো। এই সময়ে কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী গোঁসাইজীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ভক্ত হয়ে পড়েন। এবং বিজয়কৃষ্ণের কৃপালাভ করে সিদ্ধ সাধক শ্রীশ্রীঠাকুর কুলদানন্দে রূপান্তরিত হন। কুলদানন্দের জ্যেষ্ঠ সহোদর শ্রীসারদাকান্ত বন্দ্যো-পাধ্যায়ও তাঁর সমস্ত জীবন গোঁসাইজীর সেবায় উৎসর্গ করেন। ভক্তবৃন্দ পরিবৃত হয়ে ভগবৎ বিষয় আলোচনা ও নামকীর্তনে বিভোর হয়ে থাকেন যোগীবর বিজয়কৃষ্ণ। ব্রাহ্মসমাজের কর্মকর্তারা আচার্য বিজয়কৃষ্ণের ঠিক এই ধরনের হিন্দুসুলভ আচরণকে বরদাস্ত করতে পারলেন না। আরও বারদীর লোকনাথ ব্রহ্মচারীর নিকট যাতায়াত এবং তাঁর অলৌকিক জীবনলীলার কথা দিকে দিকে প্রচার করার কার্যকেও তাঁরা সহজভাবে গ্রহণ করতে সক্ষম হলেন না।

আর একটি নূতন দিন আলোকিত হয়ে উঠলো বিজয়কৃষ্ণের জীবনে। নব উষা। নব প্রভাত।

চিরতরে ব্রাহ্মসমাজকে ত্যাগ করলেন আচার্যপ্রবর বিজয়কৃষ্ণ। ঢাকা গেণ্ডারিয়ায় কুটির নির্মাণ করে সাধন ভজনে ব্রতী হলেন। আচার্য বিজয়কৃষ্ণ, ভক্তিসাধক গোস্বামী বিজয়কৃষ্ণে হলেন রূপান্তরিত। গেণ্ডারিয়া আশ্রমের আমগাছের নিচে বসে ভাবাবেশে বিভোর হয়ে বিজয়কৃষ্ণ যখন নামগান করতেন, তখন ঐ মধুর ধ্বনি ভক্তবৃন্দের প্রাণস্পর্শ করতো, ভাবাবেশের সে অপ্রাকৃত রূপ মাধুর্য উপভোগ করতেন অমেয় সৌভাগ্যবান ভক্তমণ্ডলী।

ব্রাহ্মসমাজ পরিত্যাগের কিছুদিন পূর্বেই বিজয়কৃষ্ণ বলেছিলেন, 'আমার অস্থিতে অস্থিতে, রক্তে তাঁহার 'নাম' উজ্জ্বলরূপে জ্বলিতেছে। এ কল্পনা নয়, সত্য। সত্য। বাস্তবিক। বাস্তবিক।'

সত্য সত্যই প্রতিনিয়ত হরিনাম গান করতে করতে বিজয়কৃষ্ণের দেহ দিব্য সৌন্দর্যে সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। রমনার ফকিরসাহেব বিজয়কৃষ্ণকে দর্শন করেই বলেছিলেন, ইনি 'সিদ্ধ-ফকির'। এই সময়ে বিজয়কৃষ্ণের শ্রীঅঙ্গে ও আসনে নানাপ্রকরে দেবদেবীর ছাপ পরিস্ফুট হয়ে উঠতো। ধীরে ধীরে সমগ্র বঙ্গভূমিতে গোস্বামী বিজয়কৃষ্ণের সাধনার যশঃসৌরভ বিকীর্ণ হয়ে পড়লো।

আবার একদিন ঢাকার আনন্দের হাটকে ভেঙে দিয়ে গোস্বামী বিজয়কৃষ্ণ যাত্রা করলেন উত্তর-পশ্চিম ভারত অভিমুখে। তীর্থে তীর্থে পরিভ্রমণ করতে লাগলেন। অবশেষে এসে উপস্থিত হলেন শ্রীকৃষ্ণ লীলাভূমি শ্রীধাম বৃন্দাবনে। এখানেই যমুনা স্নান করতে করতে গোস্বামীজীর মাথায় সৃষ্টি হলো জটার। তাঁর জটাও ছিল অপরূপ। ভক্তরা কখনও কখনও জটাজুট-শোভিত মহাদেব রূপে দর্শন করে অভিভূত হতেন। গোস্বামী প্রভুর জটাতে তিনটি বেণী হয়েছিল। চুলগুলি ময়ূরপুচ্ছের মত কতক কাল, কতক শুভ্র, অরুণ বর্ণ আবার কতগুলির বর্ণ ছিল নীল। জটাজুট-শোভিত অনির্বচনীয় রূপ দর্শন করে ভক্তরা বলতেন জটিয়াবাবা। যোগীশ্বর ভোলানন্দ গিরিমহারাজ বিজয়কৃষ্ণকে বলতেন 'মেরা আশুতোষ'। মহাত্মা

নরসিংহ দাস (পাহরীবাবা) বলতেন, সাক্ষাৎ শ্রীরামচন্দ্র। মহাত্মা অর্জুন দাস (ক্ষেপাচাঁদ) বলতেন, এ সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু হ্যায়, ইয়া মেরা ধ্যান মে মিলা।' আবার কখনও কখনও 'মেরা রাম' বলেও স্তুতি করতেন। একবার কুম্ভমেলায় এক মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীকে দর্শন করেই চীৎকার করে বলে ওঠেন, 'ইনিই সদ্‌গুরু। এই সদ্‌গুরুর রূপ দর্শন কর।'

গোস্বামী বিজয়কৃষ্ণের শ্বাসপ্রশ্বাসে প্রতি অণু-পরমাণুতে আপনা-আপনি নাম হয়ে যেতো। তিনি লাভ করেছিলেন ভগবতী তনু। তাইতো গোস্বামী প্রভুর অনির্বচনীয় রূপে সকল সম্প্রদায়ের মানুষই আকৃষ্ট হয়ে পড়তেন। অনেকে নির্বাক হয়ে তাঁর মধুর রূপ দর্শন করে অমৃতের আনন্দ ধারায় সিক্ত হয়ে উঠতেন।

কীর্তনে গোস্বামী বিজয়কৃষ্ণের ভাবাবেশ সম্বন্ধে ভক্তপ্রবর সারদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন, 'ভাবে কখনও তিনি কটিদেশ হইতে বহির্বাস খুলিয়া ঘোমটা দিতেন। কখন বা চীৎকার করিতেন। কখনও বা দরদরধারে অশ্রুজলে অভিষিক্ত হইতেন। কখনও বা শরীর হইতে ধারায় ঘর্ম পড়িতে থাকিত। নৃত্যকালে উহা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িত। আমরাও উহা দ্বারা কতবার সিক্ত হইয়াছি। এক এক অঙ্গ আপনা-আপনি ঘন ঘন কম্পিত হইত। হাতখানি উঠাইতেই উহা এমনি দ্রুতগতিতে কাঁপিতে থাকিত যে আমরা দেখিয়া অবাক হইতাম। কখনও আবার ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া কাঁদিতেন। কখনও উর্ধ্বে তাকাইয়া চোখের জলে অভিষিক্ত হইয়া জটা ধরিয়া কাহাকে যেন আরতি করিতেন। কখন আবার জোড়হাতে দাঁড়াইয়াও রোমাঞ্চিত দেহে শ্বাস ও পলকশূন্য অবস্থায় কাষ্ঠবৎ কাহার দিকে যেন তাকাইয়া রহিয়াছেন দেখা যাইত।'

অবশেষে উত্তর-পশ্চিম ভারতের লীলা সাঙ্গ করে গোস্বামী বিজয়কৃষ্ণ ফিরে এলেন কলকাতায়। শহরের নানা স্থান অবস্থান করে স্থায়ী আসন পাতলেন ৪৪ নং হ্যারিসন রোডের ভাড়াটিয়া

বাড়িতে। এই গৃহে গোস্বামী প্রভুর বহু অলৌকিক বিভূতি প্রকাশিত হয়ে পড়ে। গোস্বামী প্রভু ভক্তদের বলতেন,—'যা কিছু লাভ করা যায় তা নাম দ্বারা। নামই সাধন। শ্বাস পড়ছে উঠছে তা লক্ষ্য করে সর্বদা মনে মনে নাম জপ করবে।'

ঈশ্বরের বিভিন্ন রূপ সম্বন্ধে বলছেন,

'যেমন থিয়েটারে এক ব্যক্তি চাষা সেজে অভিনয় করে, সেই ব্যক্তিই কোন সময়ে রাণী সাজে এবং কোন সময়ে বীর পুরুষ সেজে অভিনয় করে। কিন্তু যে ব্যক্তি পূর্বেই চিনেন, তিনি বুঝতে পারেন যে একই ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন রূপে অভিনয় করছেন।'

ভক্ত শিষ্যদের অন্তর্জীবনের বিক্ষিপ্ত গতিকে শান্ত করে ধর্মজীবনে দিব্যালোক সম্পাত করতেন গোস্বামী বিজয়কৃষ্ণ। তাইতো দীক্ষা গ্রহণ কালে শিষ্যবৃন্দ অলৌকিক দৃশ্য নয়নগোচর করে বিস্মিত ও অভিভূত হতেন।

এই প্রসঙ্গে ভক্তপ্রবর সারদাকান্ত বলছেন,

'ঠাকুর যখন মধুর স্বরে হরিনাম করতে করতে শক্তি সঞ্চার করতেন তখন প্রায়ই অপূর্ব তড়িৎপ্রবাহ গৃহস্থিত ভক্তবৃন্দকে চঞ্চল করে তুলতো। কুলবধূও আনন্দাবেগকে সংযত করতে না পেরে অধীর হয়ে চিৎকার করে আনন্দধ্বনি করতেন সর্বসমক্ষে। কেহ সাধন পাওয়া মাত্র পূর্বপুরুষদিগকে দর্শন করে আশ্চর্য হতেন। শক্তি সঞ্চারে কেউ বা সংজ্ঞা হারাতেন। কেউ বায়ু হিল্লোলে বৃক্ষপত্রের ন্যায় কাঁপতে থাকতেন। আবার কেউ প্রাণায়াম ও কুম্ভকের প্রভাবে উপবিষ্ট অবস্থায়ই শূন্যে উঠতেন। কেউ কেউ দেব-দেবীর দর্শনলাভ করে পরমানন্দ অনুভব করতেন মনে মনে। দীক্ষাকালে এক হুলুস্থুল ব্যাপার হতো।'

শিষ্য ভক্ত সিভিল সার্জন হরকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় দীক্ষাগ্রহণের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে বলেছেন, 'ঠাকুর যখন সুস্বরে 'হরিনাম ও জয় গুরু,

জয় মহাদেব' বলছিলেন, আমার বোধ হলো, 'স্বয়ং মহাদেব আমাকে হাত বাড়িয়ে আলিঙ্গন করছেন।'

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সহধর্মিণী যোগমায়া দেবীও দীক্ষাগ্রহণ সময়ে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর দর্শন লাভ করে বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলেন। ভক্ত শিষ্যা শ্রীমতী নির্মলা দেবীও গেণ্ডারিয়ায় দীক্ষাগ্রহণ সময়ে ভাবাবেশে তিব্বতীয় ভাষায় কথা বলে উপস্থিত ভক্তবৃন্দকে বিস্মিত করে দেন। এই প্রসঙ্গে গোস্বামী প্রভু বলেছিলেন, 'নির্মলা পূর্বজন্মে তিব্বতদেশবাসিনী সাধিকা ছিল।'

ভক্তিমতী রমণী মনোরমা ঠাকুরাণী দীক্ষাগ্রহণ কালে অলৌকিক অবস্থা লাভ করেছিলেন। ২৮ ঘণ্টা সমাধিস্থ হয়েছিলেন। নাম গান কীর্তনের ধ্বনিতেও তাঁর সমাধি ভঙ্গ হয়নি। ঠিক যেন মৌমাছি মধু পানে বিভোর হয়ে মধুতে ডুবে আছে।

ভক্ত শিষ্যা কুসুমকুমারীও দীক্ষাগ্রহণ কালে ১৯ ঘণ্টা সমাধিস্থ হয়েছিলেন। তখন এঁর শরীর দিব্য শোভায় হয়ে উঠেছিল উদ্ভাসিত। এই প্রসঙ্গে নামের মধুরতা সম্বন্ধে স্বামীকে লিখেছিলেন,—'একটি নামে যে আনন্দ, স্বামী-স্ত্রী-সংসর্গ সুখ তাঁহার সহস্রাংশের এক অংশও নয়।' সাধন করতে করতে কুসুমকুমারী দেবী উপলব্ধি করেছিলেন, —'ঠাকুর প্রদত্ত নাম আর ঠাকুর একই বস্তু।'

প্রিয় শিষ্য কুলদানন্দকে বলছেন গোস্বামী বিজয়কৃষ্ণ, সৎসঙ্গ প্রসঙ্গে,

—সাধু চরিত্রের অনুশীলনই সাধুসঙ্গ-সৎসঙ্গ। তা না করে, তাঁদের কথা এক কান দিয়ে শুনলে অন্য কান দিয়ে বের হয়ে গেলে তাতে কি হবে? সাধুসঙ্গে থেকে নিজের দোষ ত্রুটি ভাল করে পর্যবেক্ষণ করে তা সংশোধন করতে হয়—'তাকেই বলে সৎসঙ্গ।'

ঠিক ঠিক নিয়ম পালন করে চললে কত দিনে সিদ্ধিলাভ হয়? জিজ্ঞেস করলেন কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী। প্রত্যুত্তরে গোঁসাইজী বলছেন, অলৌকিক শক্তি বা যোগৈশ্বর্য লাভই তো সিদ্ধি নয়। নামে সিদ্ধিই

প্রকৃত সিদ্ধি। প্রতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যখন আপনা হতে নাম করতে থাকবে, তখনই জানবে সিদ্ধি হয়েছে। বিষয়ে অনাসক্ত এবং নির্লোভ হলেই নামে রুচি জন্মে। আর প্রার্থনা আন্তরিক হলেই তিনি এগিয়ে এসে রক্ষা করেন।

আবার বলছেন,

ধর্মের পথ বড় কঠিন। পশু-পক্ষী কীট-পতঙ্গ সকলের পায়ের নিচ দিয়ে এর রাস্তা। ধার্মিকের বেশ জটা মালা তিলক ধারণ করে যদি অভিমান হয় তবে এরাই সর্প হয়ে দংশন করে। নিতান্ত চরিত্রহীন মদখোর বেশ্যাসক্ত ব্যক্তিও ভগবানের দয়ার পাত্র হয় যদি নিজেকে দীন-হীন পতিত কাঙাল বলে মনে করতে পারে। আর সে স্থলে একজন চরিত্রবান ধর্মাভিমানীর প্রতি ভগবান ফিরেও তাকান না,—'অহংকারী বলে।'

দীক্ষার তাৎপর্য সম্বন্ধে গোস্বামী প্রভু বলছেন,

গুরুকে দীক্ষাকালে শিষ্যের নিদ্রিতা কুলকুণ্ডলিনী শক্তি জাগ্রত করতে হয়। কুলগুরু তাঁরাই যাঁরা এই কুলকুণ্ডলিনী শক্তি জাগ্রত করতে সক্ষম। মূলাধার চক্রে এই শক্তি নিদ্রিতাবস্থায় বর্তমান আছেন। এই শক্তি মেরুদণ্ডের মধ্যবর্তী সুষুম্না নাড়ীর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে মূলাধার স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞা এই ষট্ চক্র ভেদপূর্বক সহস্রারে পৌছে। দীক্ষাকালে গুরু এই শক্তি জাগ্রত করে দেওয়ায় সাধক নানারূপ অবস্থা সম্ভোগ করে।

একবার একজন ভক্ত বিজয়কৃষ্ণের নিকট দীক্ষাপ্রার্থী হয়ে পত্র লেখায়,—গোস্বামী প্রভু বলেছিলেন,—'তার আমার এখানে আসার কোন দরকার নেই।' প্রত্যুত্তরে ভক্ত শ্রীকুঞ্জলাল গুহ সেই ভক্তটির সদ্‌গুণাবলী গোস্বামী প্রভুর নিকট নিবেদন করলেন। গোস্বামী প্রভু হেসে বললেন,—যাঁরা সাধন পাবে তাঁদের নাম নির্দিষ্ট আছে। তার থেকে একটুও বেশী নয়। তাঁরা যদি না আসেন তবে তাঁদের বাড়ি গিয়ে দীক্ষা দিতে হবে। যদি আমাকে ঠেঙা মারতে থাকে

তবু মার খেয়েও তাঁদের দীক্ষা দিয়ে আসবো।' এই শক্তি সেই বা মহাপ্রভু সাড়ে তিনজনকে দিয়েছিলেন। স্বরূপ দামোদর, রামানন্দ শিখি মাহিতী ও ভগ্নী মাধবী। নাম কতগুলি শব্দ বা অক্ষর নয়। নামই শক্তি। ঈশ্বরের নাম অক্ষর নয়। স্বয়ং ঈশ্বরই নাম। তিনি শক্তি। আমি যে নাম করি তাতে যদি শক্তি না থাকে, নাম স্পর্শ-মাত্র যদি প্রেম-ভক্তি-পবিত্রতা প্রাণে ভোগ না করি, তবে তা ঈশ্বরের নাম নয় কয়েকটি অক্ষর। নাম, চিৎস্বরূপ। চৈতন্যরসবিগ্রহ। নাম নামী অভেদ। তুমি ইচ্ছা কর আর না কর, সদ্‌গুরু প্রদত্ত এই শক্তি আপনা আপনি বিকাশ পাবে। অনন্তকাল চলবে।

এই প্রসঙ্গে একটি গল্পের অবতারণা করলেন,

এক ব্রাহ্মণ বেদব্যাসের নিকট উপস্থিত হয়ে অনেক স্তবস্তুতি করলেন। ব্যাস বললেন,—হে বিপ্র, তুমি কি জন্য আমার নিকট দৈন্য প্রকাশ করছো। আমি তোমার কি উপকার করবো ?

ব্রাহ্মণ বললেন,—আমি তোমার শরণাগত। তোমার অসাধ্য কিছুই নাই। আমাকে এমন কিছু শিখিয়ে দাও যে আমি যথেচ্ছা গমনাগমন করিতে পারি।

ব্রাহ্মণের অনুনয় বিনয়ে প্রীত হয়ে বেদব্যাস বিল্বপত্রে কিছু লিখে ব্রাহ্মণের হাতে দিয়ে বললেন,—হে দ্বিজ, এই বিল্বপত্রে যা লিখলাম তা দেখো না। হাতে রেখে যেখানে ইচ্ছা গমন করতে পারবে।

ব্রাহ্মণ সেই পত্র নিয়ে পরমানন্দে সর্বত্র গমনাগমন করতে লাগলেন। ইন্দ্রলোক, চন্দ্রলোক, বৈকুণ্ঠ, কৈলাস প্রভৃতি দেবস্থান ভ্রমণ করতে করতে একদিন দেখলেন পত্রটি শুকিয়ে গেছে। ব্রাহ্মণ মনে মনে সিদ্ধান্ত করলেন, পত্র শুষ্ক হয়েছে কখন চূর্ণ হয়ে যায় ঠিক নেই। সুতরাং এই পত্রে যা লেখা আছে তাই একটি ভাল পত্রে লিখে নিলেই হবে। তাইতো পত্রটি খুলে দেখলেন, তাতে লেখা আছে 'ওঁ রাম'। আবার ব্যাসদেবের হস্তাক্ষরটিও ভাল নয়। ব্রাহ্মণ এবারে অবজ্ঞার হাসি হাসলেন, আর বললেন. ও হরি. এই

সঙ্কেত। আমি এর চেয়ে আরো ভালো করে লিখতে পারতাম। তারপর নিজেই সুন্দর করে একটি নূতন বিল্বপত্রে, 'ওঁ রাম' লিখলেন।

অবশেষে বললেন,—মন চল এবারে কাশী যাই। কিন্তু কোথায় কাশী। শত চেষ্টা করেও কাশী যাওয়া সম্ভব হলো না। ততক্ষণে সে শুষ্ক পত্রটি কোথায় গেছে উড়ে। তখন নিজের ওপর ঘৃণা লজ্জা অপমান ও দুঃখে অবসন্ন হয়ে চারিদিক অন্ধকার দেখতে লাগলেন। উপায়ান্তর না দেখে আবার ছুটে এলেন ব্যাসদেবের নিকট। ব্যাসদেব সবকিছু শুনে বললেন,—হে বিপ্র, তোমার অবিশ্বাস তোমাকে নষ্ট করেছে। আমি তোমাকে বলেছিলাম, এই পত্রের মধ্যে কি আছে দেখো না। আমি বহুকাল গুরুসেবাপূর্বক তাঁর কৃপালাভ করি। সেই গুরুশক্তি হৃদয়ে ধারণ করতে করতে সেই শক্তি আমার দেবতা-রূপে প্রকাশিত হয়েছেন। তাঁরই কৃপায় আমি সেই শক্তিকে সঞ্চারিত করতে পারি। এই জন্যই আমার লিখিত নামে সেই শক্তি বর্তমান ছিল। সেই শক্তি প্রভাবেই তুমি যথেচ্ছা ভ্রমণ করেছো। 'ওঁ রামঃ' এই কয়টি অক্ষরের কোন মূল্য নাই। এজন্য তোমার হস্তাক্ষর তোমার মনোবাঞ্ছা পূরণ করতে পারে নাই।

ব্রাহ্মণ নিজের মূর্খতার কথা চিন্তা করে নয়নজলে ভাসতে লাগলেন। কিন্তু ব্যাসদেব অবিশ্বাসী ব্যক্তিকে 'সময় হয় নাই,' বলে, আর শক্তি সঞ্চার করলেন না।

তাইতো ঠাকুর বিজয়কৃষ্ণ ভক্তদের শ্বাসে শ্বাসে নাম জপ করতে বলতেন। বিশেষ কোনও দেবতার উপাসনা, কি ভগবানের কোনও বিশেষ রূপ ধ্যান, কি গুরুকে দেবতা জ্ঞান কিংবা অন্য কোনরূপ বিশ্বাস করতে বলতেন না।

বলতেন,—যা সত্য তা সময়ে হৃদয়ে প্রকাশিত হবে। পূর্বে একটা কল্পনা করা থাকলে যথার্থ সত্য প্রকাশে ব্যাঘাত হয়।

আবার বলতেন,—'যা সরলভাবে সত্য বলে বিশ্বাস করো, তাই করে যাও।'

ঠাকুর বিজয়কৃষ্ণের ভাবধারার মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা ছিল না। সীতারাম ঘোষ স্ট্রীটের গৃহে লিখে রেখেছিলেন, 'এখানে যাঁরা আছেন বা আসবেন তাঁরা কোন সম্প্রদায়কে নিন্দা করতে পারবেন না।' তাইতো দেখা যায় হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান সন্ন্যাসী ফকির প্রভৃতি শ্রেণীর লোক বিজয়কৃষ্ণের নিকট দীক্ষালাভ করে ধর্মজীবনে উন্নীত হয়েছিলেন। ঢাকায় আলিজান ফকির আর খ্রীষ্টান কেম্বেল সাহেব বিজয়কৃষ্ণের প্রিয় শিষ্য ছিলেন। গোস্বামী প্রভু কোরাণ, বাইবেল, গ্রন্থসাহেব, কবীরজীর গ্রন্থ, তুলসীদাসের রামায়ণ, মহাভারত, বেদ উপনিষদ সমস্ত পুরাণ, বৈষ্ণব ও শাক্ত গ্রন্থ সকল, চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থ নিকটে রাখতেন এবং ইচ্ছামত পাঠ করতেন।

বিজয়কৃষ্ণের গলায় সকল ধর্ম সম্প্রদায়ের বিশেষ বিশেষ চিহ্নস্বরূপ রুদ্রাক্ষ পদ্মবীজ তুলসী স্ফটিক প্রবাল বিল্বমূল ও চন্দনের মালা বিরাজ করতো।

তিনি সকল সম্প্রদায়ের সাধুদের নিকট যেতেন। সকল সম্প্রদায়ের সাধুরাও তাঁর নিকট আসতেন। গোস্বামী প্রভু বলতেন,—

হরি রাম দুর্গা কালী খোদা আল্লা যা বলুক আমার প্রভুকে যদি কেহ ডাকে অমনি আমার প্রাণ কেড়ে নেয়। তাঁকে যা বল, জল বল, সূর্য বল, চন্দ্র বল, এই ব্রহ্মাণ্ডকে আমাকে যিনি সৃষ্টি করেছেন তাঁকে চাই! প্রাণ কাঁদে তাঁর জন্য।

হরি একটি শব্দ মাত্র নয়। যে নামে যার পাপ হরণ হয় তার পক্ষে তাই হরিনাম। ব্রাহ্মণের গায়ত্রী হরিনাম। 'হরি দুর্গা বিষ্ণু রাম কালী শিব গায়ত্রী সমস্তই হরিনাম।'

অবশেষে ১৩০৪ সালের ফাল্গুন মাসে কলকাতার লীলা সাঙ্গ করে গোস্বামী বিজয়কৃষ্ণ যাত্রা করলেন শ্রীক্ষেত্রের পথে। সে সময়ে পুরীধামের পথ ছিল দুর্গম। রেলপথ হয়নি। তাইতো যাত্রা হলো শুরু জলপথে। জাহাজে করে। জগন্নাথদেবকে দর্শন আর

মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের লীলাভূমিতে অবস্থানের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলেন বিজয়কৃষ্ণ।

ভক্তবৃন্দসহ জাহাজে উঠে চিন্তামগ্ন হলেন গোস্বামী প্রভু। প্রাণের ঠাকুরকে বিদায় দিতে জাহাজঘাটে এসেছেন কলকাতা ও বঙ্গভূমির বিভিন্ন প্রান্তের ভক্তবৃন্দ। আর এসেছেন কয়েকজন সন্ন্যাসী, বৈষ্ণব। একজন তান্ত্রিক সাধুও আছেন। সকলেই বিমর্ষ। সকলেরই মন গোঁসাইজীর জন্য ব্যাকুল। সকলেই শোকে আকুল।

গোস্বামী প্রভু ভক্তবৃন্দকে বললেন, 'ঘরে করো নাম সংকীর্তন, শ্রীগুরু বৈষ্ণব সেবন।' ভক্তবৃন্দ নয়নজলে ভাসতে ভাসতে ঠাকুরকে বিদায় দিলেন। গোস্বামী প্রভুর জননী স্বর্ণময়ী দেবী পুত্রকে এক সময় বলেছিলেন, 'তুমি যথা ইচ্ছা যাইও, কিন্তু কদাচ শ্রীক্ষেত্রে যাইও না।' তাঁর বিশ্বাস ছিল বিজয়কৃষ্ণ শ্রীক্ষেত্রে গেলে আর ফিরবে না।

তাইতো ভক্তবৃন্দ প্রাণের ঠাকুরকে বিদায় দিতে শোকে মুহ্যমান। আর ভাবমগ্ন স্বয়ং ঠাকুর বিজয়কৃষ্ণ। মনে হয় কি এক গভীরতায় যেন ডুবে আছেন।

তারপর বিদায়ের সেই মুহূর্তটিও এসে উপস্থিত হলো। নদীর চলমান জলধারার উপর দিয়ে ভেসে চললেন। নীলাচলের পথে। নীলাচলচন্দ্রকে দর্শন অভিলাষে গোস্বামী বিজয়কৃষ্ণ। সমতল ভূমি নগর গ্রামকে পিছনে ফেলে, সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের মধ্যে নৃত্য করতে করতে এগিয়ে চললেন। গোস্বামী প্রভু মধুর কণ্ঠে হরিনাম গান শুরু করলেন। কি সে সুর! কি সে ধ্বনি! সঙ্গীতের মধুরতায় সহযাত্রী শিষ্য ভক্তবৃন্দদের মেরুদণ্ড দিয়ে যেন আনন্দের শিহরণ প্রবাহিত হয়ে যেতে লাগলো। অপূর্ব! অনির্বচনীয় এক শুদ্ধসত্ত্ব-পরিবেশের হলো সৃষ্টি।

শ্রীক্ষেত্রে এসে মন্দিরের ধ্বজা দর্শন করেই বিজয়কৃষ্ণ ভাবাবেশে মত্ত হলেন। কীর্তনানন্দে বিভোর হয়ে নৃত্য করতে করতে পথ চলতে লাগলেন। ভক্ত বিধুবাবু গান ধরলেন,

'যাদের হরি বলতে নয়ন ঝরে,
ঐ দেখ তারা ছু ভাই এসেছে রে।'

হরিনাম গানে আর মৃদঙ্গের ধ্বনিতে পুরীধামকে প্লাবিত করে, এসে উঠলেন, নীলমণি বর্মণের পুরানো দোতলা বাড়িতে। কিছু সময় বিশ্রাম করে, মহাপ্রসাদ গ্রহণ করে গোস্বামী প্রভু আবার বহির্গত হলেন মন্দিরাভিমুখে জগন্নাথ দর্শন অভিলাষে। অবশেষে রাত্রি দশটায় ভাবানন্দে বিভোর হয়ে জগন্নাথদেবকে দর্শন করে অভিভূত হলেন। ভাবাবেশে বলতে লাগলেন, এই নৃসিংহদেব, এই গোপাল, শ্রীজগন্নাথদেব হতে প্রকাশ হচ্ছেন।

অমেয় সৌভাগ্যবান ভক্তবৃন্দ ঠাকুর বিজয়কৃষ্ণের ভাবাবেশের সে অনির্বচনীয় মূর্তি নয়নগোচর করে মুগ্ধ বিস্মিত ও অভিভূত হলেন।

তারপর শুরু হলো ঠাকুর বিজয়কৃষ্ণের শ্রীক্ষেত্রের লীলা। সমুদ্র দর্শন করেও বিজয়কৃষ্ণের ভাবাবেশ হলো। চৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণিত 'চটক পর্বত' দর্শন করলেন। বালির পাহাড়। মহাপ্রভু এই চটক পর্বত দর্শন করে ভাবোন্মত্ত অবস্থায় গোবর্ধন ভ্রম হয়েছিল। এবং এই চটক পর্বত হতেই জ্যোৎস্না রাত্রিতে সমুদ্র দর্শন করে যমুনা ভ্রমে ঝাঁপ দেন। সংজ্ঞাহীন হয়ে ভাসতে ভাসতে কোনার্কের দিকে চলে যান। অবশেষে জেলেদের জালে আটকে সে যাত্রায় প্রাণরক্ষা হয়।

চটক পর্বত দর্শন করে গোঁসাইজীও ভাবমগ্ন হলেন। মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের লীলায় ছাওয়া শ্রীক্ষেত্রের পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছেন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী। নয়নজলে ভাসতে লাগলেন—হৃদয় উদ্বেল। ভাব ও ব্যাকুলতায় অস্থির হয়ে উঠলেন। শ্রীচৈতন্য চিন্তায় বিভোর গোস্বামী বিজয়কৃষ্ণ।

সিদ্ধবকুল দর্শন করে গোস্বামী প্রভু বললেন ভক্তবৃন্দকে,—'এই যে সিদ্ধবকুল বৃক্ষটি দেখছো, হরিদাস ঠাকুরের তপঃপ্রভাবে ও মহিমায় একটি বীজ আকারে পরিণত হয়েছে। সত্যসত্যই বৃক্ষটি

বেঁকে প্রণবাকার হয়েছে। আর বিস্মিত ও অভিভূত হয়ে ভক্তরা দেখলেন বৃক্ষের গায়ে অসংখ্য দেবদেবীর মূর্তি যেন প্রকাশিত হয়ে রয়েছে। ভক্তদের বিস্ময়াবিষ্ট ভাব দেখে ঠাকুর বিজয়কৃষ্ণ মৃদু মৃদু হাসছেন।

হরিদাস ঠাকুর বৃদ্ধ বয়সে এইখানে শূন্য আকাশের নিচে রৌদ্রে বৃষ্টিতে বসে ভজন করতেন। মহাপ্রভু প্রতিদিন হরিদাস ঠাকুরকে দেখতে আসতেন। একদিন ভোরে বকুল কাঠ দিয়ে দাঁত মাজতে মাজতে হরিদাস ঠাকুরের ভজনস্থানে এসে হঠাৎ ঐ বকুলের ছোট্ট ডালটি মাটিতে পুঁতে দিয়ে বললেন, হরিদাস তুমি রৌদ্রে বৃষ্টিতে বড় ক্লেশ পাও, আমার প্রাণে বড় লাগে, এখন থেকে এর নিচে বসে ভজন করো। অলৌকিক ব্যাপার, সেই মুহূর্তেই দাঁত মাজবার সেই ছোট্ট বকুল ডালটি মহীরুহে পরিণত হলো। আর অনির্বচনীয়ভাবে বিভোর হয়ে গৌর নামে মত্ত হলেন ঠাকুর হরিদাস। তাইতো ভক্তরা বলে সিদ্ধবকুল।

ঠাকুর বিজয়কৃষ্ণ ভক্তবৃন্দসহ দর্শন করলেন চক্রতীর্থ। এখানে ব্রহ্মদারু ক্ষীরোদসাগর হতে ভাসতে ভাসতে সমুদ্রের চড়ায় লাগে। ইন্দ্রদ্যুম্ন মহারাজ স্বয়ং এসে এই ব্রহ্মদারু সমারোহের সঙ্গে পূজা অর্চনা করে মন্দিরে যজ্ঞবেদীতে নিয়ে যান এবং স্বয়ং ভগবানই বিশ্বকর্মারূপে এসে ঐ ব্রহ্মদারু দিয়ে চার বিগ্রহ নির্মাণ করেন। আর এই পবিত্র স্থানে আছে চক্রনারায়ণ বিগ্রহ। তাইতো ভক্তরা বলেন চক্রতীর্থ।

শ্রীক্ষেত্রের পুণ্যময় ভূমির জগন্নাথদেব ও চৈতন্যদেবের লীলাস্থল দর্শন করতে করতে ঠাকুর এলেন গুণ্ডিচাবাড়ী। গুণ্ডিচাবাড়ী ইন্দ্রদ্যুম্ন মহারাজের যজ্ঞবেদী। তিনি ঐ স্থানে সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞ করে ভগবান জগন্নাথদেবের কৃপালাভ করেন এবং দারুব্রহ্ম স্বরূপে চক্রতীর্থে প্রকট হন। ঐ যজ্ঞকালে যে সব গোদান হয়েছিল সেই অসংখ্য গরুর খুরের আঘাতে যে গর্ত হয় তাই হলো ইন্দ্রদ্যুম্ন-

সরোবর। গুণ্ডিচাবাড়ীতে জগন্নাথদেব ছয়-সাত দিন বাস করেন। গুণ্ডিচা মন্দিরে প্রবেশ করে রত্নবেদী দর্শন করে ঠাকুর বিজয়কৃষ্ণের ভাবাবেশ হলো।

অবশেষে ভক্তবৃন্দসহ গোস্বামী প্রভু দর্শন করলেন লোকনাথ মহাদেবের বিগ্রহ। আর মহাবীর বিগ্রহ। অক্ষয় বট, আরও নানা লীলাস্থল জগন্নাথদেবের আর মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের।

ঠাকুর বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর শ্রীক্ষেত্রলীলায় চৈতন্য মহাপ্রভুই ধ্যানজ্ঞান মন্ত্র ছিল। প্রতিদিন রাত্রি শেষ প্রহরে উঠে সমুদ্রস্নান করে জগন্নাথদেবকে প্রণাম করে চলে আসতেন কাশী মিত্রের বাড়ি, মহাপ্রভুর লীলাভূমিতে। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যদেবই ছিলেন তখন তাঁর উপাস্য।

ধীরে ধীরে শ্রীক্ষেত্রে ও উড়িষ্যার বিভিন্ন প্রান্তে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সাধনার যশঃসৌরভ বিকীর্ণ হয়ে পড়লো। বহু ভক্ত সমাগম হতে লাগলো। ভক্তবৃন্দ পরিবৃত হয়ে উপদেশ বাণী দিতেন ঠাকুর। শ্রীশ্রীঠাকুর বিজয়কৃষ্ণের মুখনিঃসৃত অমৃত নিস্যন্দী বাণী শ্রবণ করে মুগ্ধ ও তৃপ্ত হতেন অমেয় সৌভাগ্যবান ভক্তবৃন্দ। আবার মহাপুরুষ বিজয়কৃষ্ণের অসাম্প্রদায়িক মনোভাব ও উদারবোধ কোন কোন সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীদের অশান্তির কারণ হয়ে উঠেছিল। তাঁরা গোস্বামী বিজয়কৃষ্ণের প্রতি ধীরে ধীরে বিদ্বেষভাবাপন্ন হয়ে উঠেছিলেন। এবং এই বিদ্বেষ ও হিংসাভাবই একদিন সরল হৃদয় মহাপুরুষের ইহলীলা সংবরণের কারণ হয়ে উঠেছিল।

ইতিপূর্বে শ্রীধাম বৃন্দাবনে ঠাকুর বিজয়কৃষ্ণের সহধর্মিণী ভক্তিমতী যোগমায়া দেবী দেহলীলা সংবরণ করেছেন। কন্যাও ইহলীলা সংবরণ করেছেন মুঙ্গেরে। এখন একমাত্র পুত্র যোগজীবন গোস্বামী ঠাকুরের সেবায় নিযুক্ত আছেন।

ভক্তিযোগ গ্রন্থ প্রণেতা অশ্বিনীকুমার দত্ত এসেছেন। কথা প্রসঙ্গে লিঙ্গপূজা সম্বন্ধে বলছেন গোস্বামী বিজয়কৃষ্ণ,—'যখন নির্গুণ

ব্রহ্ম সগুণ হন, তখন প্রথম এই লিঙ্গরূপ ধারণ করে প্রকৃতি ও পুরুষ একাধারে বিরাজিত থাকেন। পরে সমস্ত সৃষ্টি আদি সম্পন্ন হয়। যোগী ঋষি মুনি সকলেই এই ব্রহ্মস্বরূপ লিঙ্গের উপাসনা করেন। উহাই ব্রহ্মের প্রথম প্রকাশ। উহা পরব্রহ্মেরই সগুণ রূপমাত্র। যেমন সমুদ্রের ঢেউ হয় হঠাৎ ফেনাও হয়। কেন হয় কে জানে? কোন কারণ নাই অথচ হঠাৎ তরঙ্গ হয়, তদ্রূপ পরব্রহ্মের যখন ইচ্ছা হলো তখন তিনি ঐ লিঙ্গমূর্তি রূপে সগুণ হলেন। পরে বিদ্যা ও অবিদ্যা দুই ভাগ হয়ে পঞ্চদেবতা ও তিনগুণ হতে তিন দেবতা জন্মিল। এই তিনগুণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাই ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিব।'

ঠাকুর বিজয়কৃষ্ণের অমৃতময় ব্যাখ্যা শুনে তৃপ্ত হলেন ভক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত। এবং প্রণাম করে বিদায় নিলেন। ঠাকুর আশীর্বাদ করলেন ভক্তপ্রাণ অশ্বিনীকুমার দত্তকে।

ঠাকুর বিজয়কৃষ্ণ আবার বহির্গত হলেন শ্রীক্ষেত্র পরিক্রমায়। চৈতন্য লীলাভূমি পুণ্যময় শ্রীক্ষেত্রের পথে পথে আনন্দ কীর্তনে মেতে উঠলেন। গান ধরলেন,

জান না রে মন, পরম কারণ শ্যামা কখন মেয়ে নয়।
মেঘের বরণ করিয়ে ধারণ কখন কখন পুরুষ হয়॥
হয়ে এলোকেশী করে লয়ে অসি দনুজতনয়ে করে সভয়।
(কভু) ব্রজপুরে আসি, বাজাইয়ে বাঁশী ব্রজাঙ্গনার মন হরিয়ে লয়॥

কীর্তনানন্দে প্লাবিত করলেন শ্রীক্ষেত্রকে। চৈতন্য মহাপ্রভুর লীলাস্থলকে গোস্বামী বিজয়কৃষ্ণ।

গোস্বামী প্রভু বলছেন মহাপ্রসাদ সম্বন্ধে, মহাপ্রসাদ ও জগন্নাথদেব এক। মহাপ্রসাদ আহার করলে পুনর্জন্ম হয় না। আর এই মহাপ্রসাদ দিয়ে শ্রাদ্ধ করলে পিতৃপুরুষদেরও আর জন্ম হয় না। শ্রাদ্ধের পরে জন্ম হয়ে থাকলে উহা পিতৃলোকে জমা থাকে। পরে পায়

আবার বলছেন,

শাস্ত্র ও সদাচার সর্বদাই পালনীয়। আমি তো ব্রাহ্ম ছিলাম। কিছুই মানতাম না। কিন্তু শাস্ত্রানুসারে চলে শারীরিক ও মানসিক উপকার উপলব্ধি করছি।

ঠাকুর আবার করতাল বাজিয়ে সুস্বর কণ্ঠে গান ধরলেন,

বৃন্দা বিপিনে, মঙ্গল আরতি হের রে নয়ন আনন্দে।
মঙ্গল আরতি হোতেছে নাচিছে সখীবৃন্দে।
কুঞ্জ কুঞ্জ হইতে ধাইছে সবে, হেরিতে শ্রীগোবিন্দে॥

হরে মুরারে মধুকৈটভারে গোপাল গোবিন্দ গাও রে।
গাও শ্রীমধুসূদন, যশোদানন্দন, গোপীজনবল্লভ প্রাণায়ামে॥

ভক্তবৃন্দ পরিবৃত হয়ে ঠাকুর বলছেন,

ভক্তিকে কৃপণের ধনের ন্যায় গোপনে রাখতে হবে। শাস্ত্রকারেরা যুবতীর স্তনের সঙ্গে এর উদাহরণ দিয়েছেন। কন্যা অবস্থায় মেয়েটি নেংটা হয়ে ঘুরে বেড়ায়। যুবতী হলে স্তন বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন করে। পিতা-মাতা গুরুজন কেহ তা দেখতে পায় না। যুবতী কেবল স্বামীর নিকটেই উহা প্রকাশ করে। সেই রকম ভগবান ব্যতীত সকলেরই নিকট ভক্তি অতি সন্তর্পণে গোপনে রাখবে। প্রথম প্রথম যখন ভাবের উচ্ছ্বাস হলো, একটু চোখ দিয়ে জল পড়লো, অমনি ভাবতাম লোকে দেখুক। পরে দেখি কি করে একে গোপন করবো সেই ইচ্ছাই প্রবল। হৃদয়ের অতি নিভৃত স্থানে ইহা গোপন করতে ইচ্ছা হতো।

গোস্বামী বিজয়কৃষ্ণ উপদেশচ্ছলে সর্ব সম্প্রদায় সর্ব ধর্ম সমন্বয়ের বাণী প্রচার করতেন।

গোস্বামীপ্রভু বলেন, এক সম্প্রদায়ের সাধু অপর সম্প্রদায়ের সাধু-সন্ন্যাসী দেবতার উপর বিদ্বেষভাবাপন্ন হওয়া ধর্ম নয়। হরিহর মন্ত্রে মহাদেবের পূজা হলেও তাঁর প্রসাদ রামাইত বৈষ্ণবেরা গ্রহণ করবে

না। আবার কালীর মন্দিরে বৈষ্ণবেরা প্রাণান্তেও যাবে না। শাক্ত ও বৈষ্ণবেরা পরস্পর ঘৃণা করে থাকেন।

কিন্তু মহাপ্রভুর শক্তি যাঁরা লাভ করেছেন তাঁদের সঙ্গে অন্যের বিরোধ নেই। মহাপ্রভুর ভক্তদের মধ্যে কেহ কেহ রামোপাসক, কেহ নৃসিংহোপাসক কেহ বা নারায়ণোপাসক ছিলেন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবরা যে সাম্প্রদায়িক চিহ্ন না থাকলে তাদের দলে গ্রহণ করেন না, ইহা মহাপ্রভুর মত নয় বা গোস্বামীদের কোন গ্রন্থে দেখা যায় না। বৈষ্ণবের লক্ষণ—'তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা। অমানিনা মানদেন কীর্তনীয় সদাহরি।'

অভিমান; অহং বোধকে দূর করা প্রয়োজন। সাধুসঙ্গ না হলে অভিমান বাড়ে।

ঠাকুর আবার বলছেন,

বশিষ্ঠদেব রামচন্দ্রকে উপদেশ দিয়েছিলেন মুক্তির দ্বার চারিটি। শম দম বিচার সাধুসঙ্গ। একটি অবলম্বন করে চললেই লোকে মুক্তিলাভ করতে পারে। চারিটির আর কি কথা? আবার বিধি-লিপি খণ্ডাইবার নয়।

মহাবীর যে রামচরিত লেখেন, 'মহানাটক', তাতে আছে, বিশ্বামিত্র ঋষি যাঁর ঘটকালি করলেন, স্বয়ং বশিষ্ঠদেব যাঁর মন্ত্র পড়লেন, সেই মহাভাগ্যবান রামচন্দ্রের কপালে কত কষ্ট। সীতা হরণ হবে তা কি তিনি জানতেন না, যে তাঁর সৃষ্টিতে সোনার মৃগ নাই?—না, তিনি যে নরলীলা করছেন। নরলীলায় বিধাতার বিধান মানতেই হবে।'

ঠাকুর বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর মুখনিঃসৃত অমৃতময় বাণী মুগ্ধচিত্তে শ্রবণ করলেন অমেয় সৌভাগ্যবান পুরীর ভক্তবৃন্দ।

সত্যসত্যই বিধিলিপি অখণ্ডনীয়, সেদিন বেলা ১২টার সময় আকস্মিকভাবে এসে এক অপরিচিত বাবাজী গোস্বামী প্রভুর হাতে দিয়ে গেলো মহাপ্রসাদের লাড্ডু প্রসাদ। আর মহাপ্রসাদ বলায়

ঠাকুর ভক্তিভরে তৎক্ষণাৎ খেয়ে ফেললেন। সে লাড্ডু ছিল বিষ মিশ্রিত। এবং গোঁসাইজীর প্রাণনাশ করাই ছিল উদ্দেশ্য। জগন্নাথ বল্লভ মঠের উদ্যানে দুইজন গুণ্ডাকেও কলকাতা থেকে আনানো হয়েছিল। এক সম্প্রদায়ের বাবাজীদের প্রতিষ্ঠার অন্তরায় হয়েছিলেন গোস্বামী বিজয়কৃষ্ণ। ধীরে ধীরে সত্য প্রকাশিত হয়ে পড়ে। পুলিশ ইন্সপেক্টর নারায়ণবাবু ও ঠাকুরের বিশিষ্ট ভক্ত জগৎবাবু শশীবাবু কিশোরীবাবু ডেপুটি ও মুন্সেফ, আরও অন্যান্য ভক্তবৃন্দরা দোষীকে শাস্তি দেবার জন্য সচেষ্ট হলেন এবং ঠাকুরের অনুমতি প্রার্থনা করলেন। কিন্তু গোস্বামী প্রভু অনুমতি দিলেন না। জোড় হস্তে বললেন, এঁরা যা ইচ্ছা করতে পারেন। আমার দ্বারা যেন কারো অনিষ্ট না হয়।

বিষ প্রয়োগকারীর নাম প্রকাশ করতেও আপত্তি জানালেন উদার হৃদয় মহাপুরুষ বিজয়কৃষ্ণ।

বিষ গ্রহণ করে সাময়িকভাবে জীবন রক্ষা হলেও গোঁসাইজীর শরীরের গতি ধীরে ধীরে নিম্নগামী হতে লাগলো। ক্রমে ক্রমে মহাপ্রয়াণের দিনটিও হয়ে এলো নিকটবর্তী।

আবার নব উষা ! নব প্রভাত !

১৩০৬ সালের ২২শে জ্যৈষ্ঠ রবিবার।

সমস্ত দিনই অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন গোস্বামীপ্রভু। সকাল গেলো দুপুর গেলো সন্ধ্যা নেমে এলো শ্রীক্ষেত্রের পুণ্যময় ভূমিতে। ভক্তরাও একে একে এসে উপস্থিত হলেন। মহাপুরুষের শয্যা ঘিরে ভক্ত ও শিষ্যবৃন্দ শোকভারাক্রান্ত স্তম্ভিত হৃদয়ে মহাসমাধির প্রতীক্ষা করতে লাগলেন।

যন্ত্রণায় অব্যক্ত ক্লেশসূচক শব্দ করতে লাগলেন। বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে ফেললেন। অনেকক্ষণ অতিক্রান্ত হলো। অকস্মাৎ 'জগবন্ধু' বলে চিৎকার করে ডাকলেন। ধীরে ধীরে আবার জ্ঞান ফিরে এলো। ভক্তপ্রবর কিশোরীবাবু চা এনে ঠাকুরকে দিলেন। ঠাকুরও বালিশে

ঠেস দিয়ে বসে অল্প একটু চা সেবন করলেন। তারপর কাকে যেন মাথা নোয়াইয়া প্রণাম করলেন। তাঁর নিকট অনুমতির প্রার্থনা করলেন। তখন রাত্রি ৯টা ২০ মিনিট। গোস্বামী বিজয়কৃষ্ণ সজ্ঞানে ধীরে ধীরে মহাসমাধিতে হলেন নিমগ্ন। মহাপুরুষের বদন-মণ্ডল অপার্থিব জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো।

নয়নে নয়নে অঝোরে বইতে লাগলো শ্রাবণের ধারা। মহাসমুদ্রও যেন আকুল হয়ে আছড়ে পড়লো তীরভূমিতে বিরাট মহাপুরুষের বিয়োগ ব্যথায়।

ভক্ত লালাবাবু

'বেলা যে গেল, পারে যাবে কখন?' ওঠো বাবা। বললো এক ধীবর কন্যা। তার নিদ্রিত পিতাকে। ময়ূরাক্ষী নদীর তটে। কান্দীতে।

চমকে উঠলেন লালাবাবু। এ কি কথা! কেমন কথা! বুক কেঁপে ওঠে, চক্ষু সজল হয়, দুই ওষ্ঠ কম্পিত করে যেন নিজেরই অজ্ঞাতসারে ক্ষীণ আর্তনাদের মত ধ্বনিত হয়, 'আমারো তো জীবন-বেলা গত প্রায়।' অন্তরের গভীরে প্রশ্নের পর প্রশ্ন উত্থিত হতে লাগলো। ব্যাকুল হলো প্রাণ শ্রীকৃষ্ণচরণ লাভ করার জন্য। আর অন্তরের সেই ব্যাকুলতাকে প্রতিশোধ করার শক্তিও যেন ফেললেন হারিয়ে।

এই মাত্র এসেছেন লালাবাবু ময়ূরাক্ষী নদীতটে। ক্ষণিকের বিশ্রামলাভ করবার জন্য। আকাশের প্রান্তে সূর্যাস্তের দীপ্তি ক্রমে ক্রমে তখন ম্লান হয়ে আসছে। দিনশেষে কর্মক্লান্ত দেহে কাছারী বাড়ি থেকে ফিরছেন প্রাসাদে। হঠাৎ কি খেয়াল হলো ময়ূরাক্ষী নদীতটের বৃক্ষচ্ছায়ায় তাঞ্জাম রাখতে বললেন। পাইক বরকন্দাজ ও ভৃত্যের দল রাজ আদেশ পালন করলো। কিংখাবে মোড়া নরম তাকিয়ায় এলিয়ে দিলেন অবসন্ন দেহ। ময়ূরাক্ষীর জললহরীর দিকে তাকিয়ে কেবল ফর্‌সীর নলটি মুখে পুরেছেন, এমন সময়ই হঠাৎ ঐ নদীতীরেরই এক পর্ণকুটির থেকে বাতাস বয়ে নিয়ে এলো ধীবর কন্যার পিতাকে ঘুম ভাঙাবার ঐ ডাক। এতো সাধারণ মানুষের

ডাক নয়। এ যে ভগবানের সর্বনাশা ডাক! হাতছানি! সে ডাক শুনে একদিন কপিলাবস্তুর রাজপ্রাসাদ, উত্তর কোশলের রাজধানী অযোধ্যা, নদীয়ার শচীমায়ের স্নেহনীড়, বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রেমকুঞ্জ ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছিলো। এ যে শুধু ঘুমভাঙার ডাক নয়, এ যে কুলভাঙারও ডাক। এর সুরে আছে এক অলৌকিক পরমানন্দের আভাস। আজ ভগবানের সেই ডাক, শ্রীকৃষ্ণের বাঁশীর সেই মর্মান্তিক সুর, আহ্বান সঙ্গীত, যেন শুনতে পেলেন লালাবাবু।

সামান্য এক ধীবর কন্যার তুচ্ছ এই ডাকটির মধ্য দিয়ে লালাবাবু পেলেন এক অধ্যাত্ম জীবন লাভের প্রেরণা। নবজন্ম লাভ হলো তাঁর। এক মুহূর্তও দেরি করেন নি। চির সুখ ঐশ্বর্য পালিত রাজ-রাজেশ্বর লালাবাবু কান্দী রাজধানীর খিড়কী পথে বেরিয়ে পড়লেন। গৃহত্যাগ করলেন।

পদক্ষেপ হলো শুরু। শ্রীপাট সৈদাবাদের পথে। আট নয় ক্রোশ পথ অতিক্রম করলেন পদব্রজে। গৃহহারা ছন্নছাড়ার মত। অবশেষে এসে উপস্থিত হলেন ভাগীরথী তীরের সৈদাবাদে। শ্রীপাট সৈদাবাদে। পরম বৈষ্ণবী হরিপ্রিয়া ঠাকুরাণীর শ্রীচরণে করলেন আত্মসমর্পণ। নিবেদন করলেন মনোবেদনার কথা। শ্রীভগবানের কৃপালাভের জন্য ব্যাকুলতার কথা।

সাধনসিদ্ধা হরিপ্রিয়া ঠাকুরাণী শ্রীনিবাস আচার্য প্রভুর বংশের কুলকন্যা। বৈষ্ণব শ্রীল জীবনকৃষ্ণ ঠাকুরের পত্নী আর লালাবাবুর মন্ত্রগুরু। বৈষ্ণবী ঠাকুরাণী প্রেরণা দিলেন শিষ্য ভক্ত লালাবাবুকে। শ্রীগোবর্ধনের সিদ্ধমহাপুরুষ কৃষ্ণদাস বাবাজীর কৃপাপ্রার্থী হওয়ার জন্য নির্দেশ দিলেন।

লালাবাবুর সহধর্মিণী পত্নী রাণী কাত্যায়নী একমাত্র পুত্র নারায়ণ সহ আকুল হয়ে ছুটে এলেন সৈদাবাদে। স্বামীর পদতলে আছড়ে পড়লেন। বিরাগী স্বামীর মনকে ভুলিয়ে সংসারের প্রতি আকৃষ্ট করবার চেষ্টার কোনও ত্রুটি হলো না। কিন্তু তাঁর সকল চেষ্টাই

হলো ব্যর্থ। পত্নী ও পুত্রের মায়ায় অভিভূত সংসারের সকল টান পিছনে ফেলে রেখে ভাগীরথীর জলে নৌকা ভাসালেন।

শ্রীকৃষ্ণ লীলাভূমি শ্রীধাম বৃন্দাবনের পথে করলেন যাত্রা। নৌকাযোগে।

এক অনির্বচনীয় ভাবে বিভোর লালাবাবু। কৃষ্ণপ্রেমে ব্যাকুল তাঁর অন্তর। সেই পরম পুরুষকে গভীর নিবিড় করে পাওয়ার জন্যই তো এই আকুলতা। এক অলৌকিক পরমানন্দের আভাস যেন পেয়েছেন। দর্শনলাভ হয় নি। স্পর্শ না জানি কিরূপ! কবে সে অমৃতসাগরে করবেন অবগাহন। তাইতো সেই অমৃতের পথেই করেছেন যাত্রা। দিবানিশি কমললোচন শ্রীকৃষ্ণ চিন্তায় তন্ময় হয়ে আছেন। রাজরাজেশ্বর লালাবাবু অকস্মাৎ অভাবনীয়ভাবে রূপান্তরিত হলেন ভক্ত লালাবাবুতে।

এই লালাবাবুই হলেন দেওয়ান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সিংহ। রাজা কিষণ-চাঁদ। সে যুগের বিশিষ্ট ধনী জমিদারদের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা প্রবল প্রতাপান্বিত দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দের একমাত্র পৌত্র। অতি আদরের দুলাল লালাবাবু। গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ আদর করে ডাকতেন 'লালা' বলে।

ধীরে ধীরে ঐ ছোট্ট লালাই পরিণত হলেন লালাবাবুতে। আর পিতামহের প্রদত্ত সেই আদরের ছোট্ট নামটিই চিরস্মরণীয় হয়ে রইলো সাধু সন্ন্যাসী সাধারণ মানুষের অন্তরে অন্তরে। শ্রীধাম বৃন্দাবনে। মঠে। মন্দিরে। দেশে দেশে। ভক্ত বৈষ্ণব আর জনপদের মানুষেরা ঐ লালাবাবু নামটিকেই করে নিলো চির আপন। ব্রজবাসী বৈষ্ণবেরাও চৈতন্যদাস বাবাজী বলতো না। বলতো ভক্ত লালাবাবু।

বাংলা ১১৮২ সনে, ইংরেজী ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দী রাজধানীর সিংহ বংশে জন্মগ্রহণ করেন ভবিষ্যতের এই ত্যাগী মহান ভক্ত মানুষটি। পিতা প্রাণকৃষ্ণ সিংহও ছিলেন দেওয়ান। আর

পিতামহ ছিলেন সেই বহুবিখ্যাত বিত্তবান ও প্রতাপান্বিত বাংলা বিহার উড়িষ্যার দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ। ওয়ারেন হেস্টিংসের প্রিয়পাত্র আর জমিদারদের ভাগ্য-বিধাতা। তাইতো রাজা কৃষ্ণচন্দ্র পত্রের উপরিভাগে লিখতেন, 'পুত্র অবাধ্য, দরবার অসাধ্য ভরসা কেবল গঙ্গাগোবিন্দ।' কাঞ্চন-কৌলিন্যের পরিচয় দিয়েছিলেন গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ মাতৃশ্রাদ্ধে, আর একমাত্র পৌত্র লালাবাবুর অন্নপ্রাশনের অনুষ্ঠানে। সোনার পাতে খোদাই করে নিমন্ত্রণ পত্র পাঠিয়েছিলেন নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গকে। বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার সম্ভ্রান্ত ও পণ্ডিতমণ্ডলীর সকলেই ছিলেন নিমন্ত্রিত। বিস্মিত হয়ে দেখেছিল সেদিন এই কলকাতার মানুষেরাই গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের ধনৈশ্বর্য ও বিলাসের বাহুল্য। এমনই এক সর্বসুখের নিকেতনে ঐশ্বর্যের প্রাচুর্যের মধ্যে লালিত পালিত হতে লাগলেন লালাবাবু। শৈশব বাল্য ও কৈশোর অতিক্রান্ত হলো। অসাধারণ মেধা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তাইতো অতি অল্পকাল মধ্যেই সর্বশাস্ত্র বিশারদ হয়ে উঠলেন। আরবী ফার্সী ও সংস্কৃত ভাষায় হলেন সুপণ্ডিত।

কান্দী থেকে তিন ক্রোশ দক্ষিণ-পূর্বে আজকের সিংহপুর গড়ই প্রাচীনের সিংহপুর। আর এই সিংহপুরেই ছিল সিংহবংশের বসতি।

'সিংহপুরে ছিল সিংহরাজের বসতি।
গঙ্গায় ভাঙ্গিল বাটি কান্দিতে করিল স্থিতি॥'

গঙ্গানদীর প্লাবনে আর ভাঙনে একদিন ধ্বংস হলো সিংহপুর সিংহবংশের পূর্বপুরুষ বনমালী সিংহ ময়ূরাক্ষী তটের অরণ্যকে সরিয়ে স্থাপন করলেন রাজধানী। নূতন এক জনপদ ভূমিষ্ঠ হলো। ধীরে ধীরে সেই জনপদ সমৃদ্ধ হয়ে উঠলো। অতীতের সমৃদ্ধ সেই জনপদই কান্দী। সিংহরাজের রাজধানী কান্দী। উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থবংশের গৌরব গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের জ্যেষ্ঠতাত গৌরাঙ্গ সিংহের সময়েই কান্দীতে প্রতিষ্ঠিত হলো রাধাবল্লভ জীউর মন্দির। রাধাবল্লভ

এতদিন ছিলেন এক সন্ন্যাসীর আশ্রয়ে। দীর্ণ সন্ন্যাসীর ঝোলার মধ্যে। পথে প্রবাসে তীর্থে তীর্থে মন্দিরে মন্দিরে ঘুরতে ঘুরতে ভারত পথিক সন্ন্যাসী অকস্মাৎ একদিন এসে উপস্থিত হলেন ময়ূ-রাক্ষী তীরের কান্দীতে। সিংহরাজের অতিথিশালায়। ধর্মপ্রাণ গৌরাঙ্গ সিংহের অতিথিশালায় প্রতিদিনই তখন সাধু-সন্ন্যাসীর যেন মেলা বসে যেতো। বিভিন্নভাবের সাধু-সন্ন্যাসীরা এসে মিলিত হতেন সেই অতিথিশালায়। রাধাবল্লভও আছেন, সন্ন্যাসীও আছেন। রাধাপ্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের হঠাৎ কি খেয়াল হলো রাত্রিতে স্বপ্নে দর্শন দিলেন গৌরাঙ্গ সিংহকে। আর তার সেবা পূজা গ্রহণ করবার ইচ্ছাও প্রকাশ করলেন। রাজা গৌরাঙ্গ সিংহেরও সন্ন্যাসীর দীর্ণ ঝোলার সেই রাধাপ্রাণবল্লভকে চিনে নিতে অসুবিধা হয়নি। সন্ন্যাসীও আপত্তি করেননি। গৌরাঙ্গ সিংহ স্থাপনা করলেন দেবালয়। কান্দীর রাজপ্রাসাদে। প্রতিষ্ঠিত হলেন রাধাপ্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ। রাজা আর প্রজার প্রণামে তৃপ্ত হয়ে হাসতে লাগলেন রাধাবল্লভ-জীউ। ধীরে ধীরে প্রেমময় শ্রীকৃষ্ণের প্রভাব সমস্ত রাজপরিবারকেই প্রভাবিত করলো। তাইতো দেখা যায় উত্তরকালে এই রাধাবল্লভ-জীউই প্রেরণা দিলেন লালাবাবুকে ত্যাগ বৈরাগ্যের পথকেই জীবনা-দর্শ করে নিতে। আর ভোগী লালাবাবুও আত্মপ্রকাশ করলেন পরম বৈষ্ণব রূপে। রাজা কিষণচাঁদ হলেন চৈতন্যদাস বাবাজী।

লালাবাবুর পিতা প্রাণকৃষ্ণ সিংহ ছিলেন গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের একমাত্র পুত্র। আবার গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের ভ্রাতা রাধাগোবিন্দ ছিলেন নিঃসন্তান ও বিত্তশালী। মৃত্যুর পূর্বে সমস্ত সম্পত্তি দিয়ে যান ভ্রাতুষ্পুত্রকে। গঙ্গাগোবিন্দ ও রাধাগোবিন্দ সিংহের মিলিত ধনৈশ্বর্যের অধিকারী হলেন প্রাণকৃষ্ণ সিংহ। আবার লালা[illegible]ও হলেন পিতা প্রাণকৃষ্ণের একমাত্র পুত্রসন্তান। ভবিষ্যতের বিপুল বিত্তের অপরিমেয় ধনৈশ্বর্যের অধিকারী।

সুখের নিকেতনে ঐশ্বর্যের বিলাসের মধ্যে লালিত পালিত হলেও

দীন দুঃখীর দুঃখে বিগলিত হতো লালাবাবুর প্রাণ। গৃহের দেবালয়ে ধর্মসভা বসলেই হলো, এক অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণে ছুটে যেতেন। বসে বসে শুনতেন ভাগবত পাঠ। শাস্ত্র পাঠ। আর ধর্মালোচনা। না বুঝলেও কিসের এক ভাবে তন্ময় হয়ে বসে থাকতেন কিশোর লালাবাবু। ঈশ্বর ভক্তির মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে যেন একটি সুপ্ত ধর্মপ্রাণ প্রস্ফুটিত হয়ে উঠতে লাগলো। উত্তরকালে শ্রীমদ্‌ভাগবতের প্রভাব তাঁর ধর্মজীবনকে অনেকখানি প্রভাবিত করেছিলো। বাল্য ও কৈশোরের অঙ্কুরিত ধর্মজীবনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিল শ্রীমদ্‌ভাগবতের প্রেমময় শ্রীকৃষ্ণ। রাধাপ্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র।

লালাবাবু তখন নব যুবক। চরিত্রবান ও সত্যনিষ্ঠ। পিতামহ গঙ্গাগোবিন্দ সিংহও ইহলীলা সংবরণ করেছেন। এই সময়ে সামান্য একটি ঘটনার প্রভাবে দৃঢ়সঙ্কল্প সিদ্ধপুরুষ রূপে রূপান্তরিত হলেন লালাবাবু, এবং ভবিষ্যৎ কর্মজীবনেও হয়েছিলেন সুপ্রতিষ্ঠিত।

ধূলিধূসরিত নগ্নপদে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ ঘোরাফেরা করছেন প্রাসাদের দ্বারে। কিন্তু দারোয়ানের ভয়ে প্রাণকৃষ্ণ সিংহের দরবারে উপস্থিত হওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন না। অকস্মাৎ দৃষ্টিগোচর হলো লালাবাবুর। উদ্‌ভ্রান্ত ব্রাহ্মণকে ঘোরাফেরা করবার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। ব্রাহ্মণও তাঁর দুঃখের ইতিবৃত্ত সবিস্তারে বললেন। কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা কিছু অর্থ সাহায্য লাভের আশায়ই এসেছেন রাজদ্বারে। দরিদ্র ব্রাহ্মণের আবেদন করুণ মূর্তি আর বিষণ্ন মুখের দিকে তাকিয়ে ব্যথিত হলো লালাবাবুর প্রাণ। খাজাঞ্চিকে আদেশ করলেন এক হাজার টাকা দিয়ে দেওয়ার জন্য। বৃদ্ধ খাজাঞ্চি তো পড়লেন মহাবিপদে। কর্তার হুকুম ছাড়া এ টাকা কি করে দেবেন? অবশেষে দুই কুল রক্ষা করার চিন্তা করে প্রাণকৃষ্ণ সিংহকে গোপনে সবকিছু বললেন। পুত্রের এই আদেশের কথা শুনে প্রাণকৃষ্ণ সিংহও চিন্তিত হলেন। অবশেষে গম্ভীর স্বরে খাজাঞ্চিকে বললেন,—লালা যখন কথা দিয়েছে তখন টাকাটা দিয়ে দাও ব্রাহ্মণকে। কিন্তু

লালাকে বলে দাও, এ রকম আদেশ যেন সে ভবিষ্যতে না করে। তাহলে তার অনুরোধ রক্ষা করা হবে না। সে নিজে যখন উপযুক্ত হবে, জমিদারীর আয় বাড়াবে তখনই সে দানের কর্তা হবে। তার পূর্বে নয়।

দরিদ্র ব্রাহ্মণ অর্থ নিয়ে হৃষ্টচিত্তে বিদায় নিতেই বৃদ্ধ খাজাঞ্চি রাজনন্দন লালাবাবুকে পিতার কঠোর মন্তব্য শুনিয়ে দিলেন।

পিতৃদেবের রূঢ় মন্তব্য শুনে হৃদয় বিদীর্ণ হলো লালাবাবুর। বিচলিত হলেন। পিতৃপিতামহের অর্থের উপর বিতৃষ্ণা জন্মালো। দুরন্ত এক সঙ্কল্প নিয়ে নিরুদ্দেশের পথে যাত্রা করলেন। কর্মজীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত যে তাঁকে হতেই হবে। পিতা মাতার করুণ আবেদন ও অশ্রুসজল চোখও তাঁকে সঙ্কল্পবিচ্যুত করতে পারলো না।

ফার্সী ভাষায় দক্ষ ছিলেন তাইতো বর্ধমানে এসে অতি সহজেই কালেক্টরীর সেরেস্তাদারের পদ প্রাপ্ত হলেন। এবং অতি অল্পসময়ের মধ্যেই কর্মদক্ষতা গুণে পদোন্নতি হলো।

ইতিমধ্যে লালাবাবুর বিবাহ কার্যও সুসম্পন্ন হলো। দিনাজপুরের গৌরমোহন ঘোষের কন্যা কাত্যায়নী দাসী লালাবাবুর সহধর্মিণীরূপে গৃহ আলোকিত করলেন। পরবর্তীকালে গৌরমোহন ঘোষ সিংহ-বংশের জমিদারীভুক্ত রসোড়া গ্রামে এসে বসবাস করতে থাকেন। গৌরমোহন ঘোষও ধর্মপরায়ণ মানুষ। গৃহে বিগ্রহ আছে। রাধারমণ জীউর নিত্যসেবা পূজার বন্দোবস্তও করেছেন। তাইতো কন্যা কাত্যায়নীও পরবর্তীকালে ভক্তিমতী ধর্মপরায়ণা মহিলারূপে আত্ম-প্রকাশ করেছিলেন।

স্বামীঅন্তপ্রাণা সেবাপরায়ণা কাত্যায়নীকে স্ত্রী রূপে গ্রহণ করে লালাবাবু গার্হস্থ্য জীবনে সুখী হয়েছিলেন। একটি পুত্রসন্তানও লাভ করলেন।

উড়িষ্যা প্রদেশ ইংরাজের অধিকারভুক্ত হলে লালাবাবু জরিপের কার্যে নিযুক্ত হন এবং কর্মকুশলতার গুণে অতি অল্পকাল মধ্যে

দেওয়ানের পদ প্রাপ্ত হলেন। এই সময়েই তাঁর পুরীর রাজার সঙ্গে সৌহার্দ্য হয় এবং উড়িষ্যাতে প্রচুর ভূ-সম্পত্তি করে ফেলেন। পুরীর রাজার একান্ত আগ্রহে একটি অঞ্চলের জমিদারীও লাভ হয়। এই-ভাবে লালাবাবু পিতৃ-পিতামহের ঐশ্বর্য ছাড়াও নিজ কর্মদক্ষতা গুণে প্রভূত ভূ-সম্পত্তি ও অর্থের অধিকারী হয়েছিলেন। এবং দেওয়ান কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ রাজা কিষণচাঁদে হয়েছিলেন রূপান্তরিত।

গৌরসুন্দরের লীলাভূমি শ্রীক্ষেত্রে এসে শুধুমাত্র যশ মান অর্থ-লাভই হয়নি বাল্য ও কৈশোরের অঙ্কুরিত ঈশ্বরপ্রেম আবার লালা-বাবুর অন্তরে স্ফুরিত হলো। ঐশ্বর্যশালী হলেও শ্রীকৃষ্ণচিন্তা মাঝে মাঝে তাঁর অন্তরকে ব্যাকুল করতো। জগন্নাথের বিগ্রহ দর্শন করে রাজা কিষণচাঁদ ভাব-বিহ্বল হলেন। ধীরে ধীরে অশ্রুসজল হয়ে উঠলো তাঁর দুই চক্ষু। বিস্ময় বিচলিত চক্ষে তাকিয়ে আছেন জগন্নাথদেব বিগ্রহের প্রতি। জগন্নাথ নয় এ যেন চিত্তসুধানিধি—প্রেমময় মুরলীধর শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে দর্শন করছেন। ধন রত্ন নয়, রত্নাধিক সেই অমৃতের ভাণ্ড রয়েছে তাঁর সম্মুখে, সে অমৃতের স্বাদের কাছে পৃথিবীর সব মণিমাণিক্যের স্বাদ হয়ে যায় ম্লান। তাইতো মাঝে মাঝে মন উদাস হয়ে যায়। শ্রীকৃষ্ণ লীলাভূমি শ্রীধাম বৃন্দাবনের জন্য কেন জানি মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে লালাবাবুর।

অকস্মাৎ এক দুঃসংবাদে মনের শান্তি হারালেন লালাবাবু। পিতৃদেব দেহান্তরিত হয়েছেন। মনে পড়ে কন্যাদায়গ্রস্ত সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণকে অর্থদানের কথা আর সেই অতি তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করেই গৃহত্যাগের ইতিবৃত্ত। অনুতপ্ত পিতার শেষ অনুরোধটুকুও রক্ষা করেননি। অশ্রুভারাক্রান্ত হৃদয়ে উড়িষ্যার বাস তুলে দিয়ে এবারে চলে এলেন কলকাতায়। প্রভূত অর্থ ব্যয় করে মহাসমারোহে দানসাগর শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান সম্পন্ন করলেন।

পিতৃদেব ও পিতামহের বিশাল জমিদারী আর অপরিমেয় ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়ে লালাবাবু প্রবল পরাক্রান্ত ভূম্যধিকারী রূপে এবারে

আত্মপ্রকাশ করলেন। এখন থেকে কলকাতা আর কান্দীতেই বসবাস করতে লাগলেন। বৈষয়িক কাজকর্ম আর বিলাসব্যসনে থাকেন সর্বদা মত্ত হয়ে।

হঠাৎ ময়ূরাক্ষীতটের ধীবর কন্যার ঐ ডাকটি, তাঁর ভোগ-বাসনার সব ভাবনাকে যেন করে দিলো এলোমেলো। সুপ্ত ভক্তপ্রাণ হলো জাগ্রত। চৈতন্যোদয় হলো। দিব্যপ্রভায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো মনোমুকুর। দিব্য জীবন লাভের জন্য সামগ্রীর সুখ ছেড়ে অমৃত-সাগরের পথে করলেন যাত্রা।

তারপর একদিন সত্য সত্যই লালাবাবু এসে পৌছলেন শ্রীধাম বৃন্দাবনে। শ্রীশ্রীরাধাশ্যামের লীলাস্থলে। লীলায় ছাওয়া বৃন্দাবন-ধামে। এসে উঠলেন ভরতপুর মহারাজের বড় কুঞ্জে। ভরতপুরের মহারাজা লালাবাবুর পুরাতন বন্ধু। লালাবাবুব গৃহত্যাগ ও বৃন্দাবন আগমন সংবাদে মহারাজা সাগ্রহে তাঁর কুঞ্জে অবস্থান করবার জন্য আমন্ত্রণ জানান। প্রচ্ছন্নভাবেই ছিলেন লালাবাবু ঐ কুঞ্জে।

ত্যাগতিতিক্ষা ও কৃচ্ছ্র ব্রতময় সাধনজীবন লালাবাবু স্বেচ্ছায় বরণ করে নিয়েছেন। তাইতো বেশীদিন আর মহারাজাব কুঞ্জে থাকতে পারলেন না। সাধন ভজন আর মাধুকরী অবলম্বন করে দিনাতিপাত করতে লাগলেন। ব্রজের সেই মাঠ বৃক্ষরাজি পাখি হরিণ ময়ূর ময়ূরী সবকিছুই আছে। শুধু নেই কৃষ্ণ। কোথা কৃষ্ণ! দেখা দাও! দেখা দাও! বলে নয়নজলে ভাসতে ভাসতে ভক্ত লালাবাবু বৃন্দাবনের কুঞ্জঘেরা পথে পথে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। এ সংবাদ পৌছালো কলকাতায় কান্দীতে আর সৈদাবাদে নানাভাবে পল্লবিত হয়ে। দুঃখে বেদনায় আকুল হয়ে কাঁদতে লাগলেন পত্নী কাত্যায়নী। পুত্রও অস্থির হলেন পিতৃদেবের কথা ভেবে। আর আত্মীয়-স্বজনেরাও মনঃকষ্টে অধীর হলেন। অবশেষে বৃদ্ধ দেওয়ান-জীকে পাঠানো হলো বৃন্দাবনধামে লালাবাবুকে প্রয়োজনীয় অর্থ দেবার জন্য।

দেওয়ানজীও বৃন্দাবনে এসে খুঁজে বের করলেন লালাবাবুকে। তারপর অনুরোধ করলেন লালাবাবুকে,—'ইষ্টদেবের সেবাপূজার জন্য অর্থ গ্রহণ করুন হুজুর। ভোগ দিয়ে প্রসাদ নেবেন। এতে আপত্তি করবার কোন কারণ দেখতে পাচ্ছি না।

প্রত্যুত্তরে লালাবাবু বললেন,—আমি বৈরাগী মানুষ। ভিক্ষায় দিয়েই রোজ কোনমতে দুটো ভোগ প্রসাদ নিবেদন করি। আমার ইষ্টকে রাজভোগ দেবার ক্ষমতা কোথায়?

দেওয়ানজীও ছাড়বার পাত্র নন। বললেন, হুজুর। কৃপাময় প্রভু কৃষ্ণচন্দ্র তো নিজে থেকেই ষোড়শোপচার সেবা পূজা গ্রহণের ব্যবস্থা করেছেন। তিনপুরুষ ধরে রাজসেবায় পূজিত হচ্ছেন কৃষ্ণচন্দ্র। তাহলে আর আপত্তি করছেন কেন? আপনার বিত্ত আপনি সেবক-রূপে এই বৃন্দাবনে থেকেই কৃষ্ণচন্দ্রের সেবা পূজায় ব্যয় করুন।

দেওয়ানজীর মুখনিঃসৃত যুক্তিপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করে চিন্তিত হলেন ভক্ত লালাবাবু। যেন নূতন এক পথের পেলেন সন্ধান। মনের এক অন্ধকার প্রকোষ্ঠ আলোকমালায় উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। এতদিন বৃন্দাবনের ভগ্ন মন্দির আর শ্রীবিগ্রহের সেবা পূজার দৈন্য দুর্দশা দেখে বিচলিত হয়েছেন কিন্তু পথ-নির্দেশ পাননি। আজ দেওয়ানজীর ছোট্ট অনুরোধের মধ্য দিয়ে যেন তারই পথ-নির্দেশ পেলেন। পুত্র ও পত্নীর নির্দিষ্ট অংশের অর্থ বাদ দিয়ে নিজের প্রাপ্য অংশের অর্থ গ্রহণ করতে সম্মতি জানালেন পরম বৈষ্ণব ভক্ত লালাবাবু।

এই সুসংবাদ লালাবাবুর পত্নী পুত্র ও আত্মীয়স্বজনকে পরিবেশন করবার জন্য হৃষ্টচিত্তে ফিরে গেলেন দেওয়ানী বাংলাদেশে।

অল্পকাল মধ্যেই লালাবাবুর প্রাপ্য অর্থ পঁচিশ লক্ষ টাকা হাতে এলো। নব উদ্দীপনায় কর্মে অবতীর্ণ হলেন। ভক্তপ্রাণ লালাবাবু বৃন্দাবনধামে এবারে কর্মযোগীরূপে করলেন আত্মপ্রকাশ। ব্রজধামের ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দির, শ্রীবিগ্রহ, সাধনপীঠ, কুণ্ড, স্নানঘাট সবকিছুরই সংস্কার সাধন করলেন। শ্রীগোবর্ধনের শ্যামকুণ্ড ও রাধাকুণ্ডের চতুষ্পার্শ্ব লাল

প্রস্তরে বাঁধিয়ে দিলেন। বিভিন্ন মন্দিরে সেবা পূজার জন্যও অর্থ প্রদান করলেন। রাজার রাজা দ্বারকার রাজা রাখাল রাজা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র আবার রাজসেবায় পূজিত হয়ে জাগ্রত হয়ে উঠলেন বৃন্দাবনধামে। রাজা কিষণচাঁদ নয়, দেওয়ান কৃষ্ণচন্দ্র সিংহও নয়, ভক্ত লালাবাবু শুধু ঐশ্বর্য দিয়ে নয় প্রাণের ঐশ্বর্য দিয়েও শ্রীকৃষ্ণের সেবা পূজায় মনোনিবেশ করলেন। শ্রীকৃষ্ণ লীলাভূমি শ্রীধাম বৃন্দাবন নবভাবোন্মাদনায় আবার জাগ্রত হয়ে উঠলো।

ভক্তপ্রাণ লালাবাবু পদব্রজে এলেন শ্রীগোবর্ধনে। ভাববিহ্বল হয়ে মানস-সরোবর তীরে মহাত্মা সিদ্ধপুরুষ কৃষ্ণদাস বাবাজীর চরণতলে নিপতিত হলেন। বাবাজী কৃষ্ণদাস সাদরে গ্রহণ করলেন ত্যাগী মহাপুরুষ লালাবাবুকে। কিন্তু তখনও সন্ন্যাসীর দীক্ষা গ্রহণের সময় হয়নি জানালেন। লালাবাবু নিরাশ হলেন না। ফিরে এলেন বৃন্দাবনে। সাধন ভজন আর মাধুকরীর দ্বারা দিনাতিপাত করতে লাগলেন।

অকস্মাৎ স্বপ্নদর্শন হলো যমুনাপুলিনের রাসস্থলীতে দুই সখিমধ্যে নৃত্যপরায়ণ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রমা বিরাজমান। মনোবাসনা হলো ঐ রাসস্থলীতেই মন্দির প্রতিষ্ঠা করবেন। আবার দুশ্চিন্তা হলো বেলাভূমিতে কেমন করে মন্দির নির্মাণ করবেন? স্বপ্নাদিষ্ট স্থানে এসে দেখলেন এক ভক্ত বৈষ্ণব কুটির নির্মাণ করে সাধন ভজনে মগ্ন। ভক্ত বৈষ্ণবও স্বপ্নদর্শনের কথা বললেন। তখন লালাবাবু হৃদয়ঙ্গম করলেন এই রাসস্থলীই শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রেত স্থান।

হঠাৎ আবার স্বপ্ন দেখলেন, রাখাল রাজা স্বয়ং বলছেন,—'তুমি শ্রীমন্দিরের ভিত্তি খনন কর। অদূরেই স্বর্ণবর্ণ কঠিন মৃন্ময়ভূমি দেখতে পাবে। সেই ভূমির উপর ভিত্তি রোপণ কর। তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে।'

আর দ্বিধা নয়, সঙ্কোচ নয়, লালাবাবু দ্বিগুণ উৎসাহে বিশাল মন্দির নির্মাণের কার্যে ব্যাপৃত হলেন। লালাবাবুর ত্যাগ বৈরাগ্য

সাধনার যশঃসৌরভ, যশ মান খ্যাতি স্থানীয় কিছু ধনী মানুষদের দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে উঠলো। বৃন্দাবনের শ্রীরঙ্গজীর মন্দিরের মালিক শেঠজীরা তাদের অন্যতম। ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে এক শ্রেণীর লোককে লালাবাবুর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তুললেন। অবশেষে মামলা মকদ্দমার মধ্য দিয়ে এর পরিসমাপ্তি হলো। শেঠজীরা লালাবাবুর পরম শত্রুরূপে পরিগণিত হলেন। এবারে একটার পর একটা বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হতে লাগলেন লালাবাবু।

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের মন্দিরের জন্য রাজপুতনার জয়পুর থেকে মূল্যবান প্রস্তরাদি আনাচ্ছেন। মাঝে মাঝে নিজেও রাজপুতনায় যান এবং সুযোগ পেলে ভরতপুরে মহারাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আসেন। মহারাজা লালাবাবুর বিশিষ্ট বন্ধু। এবং সেই বন্ধুত্বের ফলে হঠাৎ ভয়ঙ্কর এক বিপদের জালে জড়িয়ে পড়লেন পরম বৈষ্ণব লালাবাবু। তখনও ইষ্টমন্দির নির্মাণ সম্পূর্ণ হয়নি।

এ সময় রাজপুতনার রাজাদের সঙ্গে ইংরাজদের সন্ধি চুক্তির কথাবার্তা চলছিলো। ভরতপুরের মহারাজা ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। অকস্মাৎ ভরতপুররাজ সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করতে হলেন অসম্মত। এবং এই ভরতপুররাজের পশ্চাদপসরণের মূলে তাঁর বিশিষ্ট বন্ধু লালাবাবুর কুমন্ত্রণা রয়েছে বলে মনে করলেন ইংরেজ স্যার চার্লস মেটকাফ্। দিল্লী দরবারের রেসিডেন্ট। লালাবাবুর বিরুদ্ধ-বাদীরা এই সুযোগ গ্রহণ করতে বিলম্ব করেননি। মেটকাফের কর্ণে লালাবাবুর বিরুদ্ধে বিষভাণ্ড উজাড় করে ঢেলে দিলেন। 'মহারাজা তো সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করতে প্রস্তুত ছিলেন কিন্তু লালাবাবুই বাধা দিয়েছেন।' মেটকাফের ভ্রূকুটি উগ্র হয়ে উঠলো। মথুরার জেলা শাসককে আদেশ করলেন এই ব্যাপারে তদন্ত করে সঠিক সংবাদ পরিবেশন করবার জন্য। জেলা শাসকও লালাবাবু সম্বন্ধে খুবই উৎসাহী ছিলেন। এক মুহূর্তও দেরি করেননি। লালাবাবুকে বন্দী করে দিল্লীতে চালান দিতে। বিচার হবে লালাবাবুর দিল্লীতেই।

সমগ্র ব্রজমণ্ডলে ছড়িয়ে পড়লো দাবানলের মত লালাবাবুর গ্রেপ্তারের সংবাদ। দীন দুঃখী ভক্ত বৈষ্ণব শত শত সাধারণ মানুষ ছুটে চললো দিল্লীর পথে। মেটকাফ্ স্বচক্ষে দেখলেন প্রজার দল চঞ্চল হয়ে ছুটে চলেছে ব্যাকুল ভক্তের মত। লালাবাবুকে দেখতে নয়, যেন কোথাও নূতন এক মন্দিরের দ্বার খুলেছে আর নূতন এক দেবমূর্তিকে স্বচক্ষে দেখে ধন্য হবার জন্য, ভক্তি নিষ্ঠা নিয়ে চঞ্চল হৃদয়ে পথ চলেছে শত শত নর-নারীর দল। লালাবাবুর জনপ্রিয়তা ও ব্যক্তিত্বের প্রভাব দেখে সেদিন মুগ্ধ বিস্মিত ও চিন্তিত হয়েছিলেন স্যার চার্লস মেটকাফ।

লালাবাবুর কর্মজীবনের পূর্ব ইতিহাস সংগ্রহের দায়িত্ব পড়েছিল মেটকাফের ফার্সী লেখক দেবীপ্রসাদ রায়ের উপর। শান্তিপুর ছিল দেবীপ্রসাদ রায়ের নিবাস। দেবীপ্রসাদ রায়ের তদন্তে প্রকাশ পেলো শুধু লালাবাবুই নন তাঁর পূর্বপুরুষও কোম্পানীর সঙ্গে সর্বদা সহ-যোগিতাই করে এসেছেন। এবারে মেটকাফের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হলো। আর লালাবাবুর ত্যাগ বৈরাগ্যের কথা শুনে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়লেন দিল্লীর রেসিডেণ্ট স্যার চার্লস মেটকাফ্। বিচারে লালাবাবু মুক্তিলাভ করলেন। এবং মহারাজ উপাধিতে ভূষিত করতে চাইলেন ইংরেজ সরকার। মৃদু হেসে দীন বৈষ্ণব লালাবাবু ইংরেজ সরকারের প্রদত্ত খেতাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন সেদিন।

আবার ফিরে এলেন লালাবাবু সাধনভূমিতে। শ্রীধাম বৃন্দাবনে। আত্মনিয়োগ করলেন মন্দির নির্মাণের কার্যে। ধীরে ধীরে যমুনা-পুলিনের রাসস্থলীতে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রমার বিশাল মন্দির নির্মিত হলো। দক্ষিণে ললিতা, বামে শ্রীরাধা মধ্যে মণিময় শ্রীকৃষ্ণ মূর্তি। ভাস্বর প্রভায় আলোকিত হলো বৃন্দাবন। ব্রজধাম। এক শুভদিনে মহা-ধুমধামে শ্রীমন্দিরের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা কার্য সুসম্পন্ন হলো। মন্দিরের ব্যয় নির্বাহের জন্য ব্রজমণ্ডলে জমিদারী ক্রয় করলেন লালাবাবু। বিশাল মন্দির। বিরাট অতিথিশালা। রাজসিক ব্যাপার। শত

শত দীন দুঃখী ভক্ত বৈষ্ণব সাধু-সন্ন্যাসীর মেলা বসে যায় প্রতিদিন অতিথিশালায়। লালাবাবু কিন্তু মাধুকরীর দ্বারা দিনাতিপাত করেন। কঠোর তপস্যায় মগ্ন। দিবারাত্রি কৃষ্ণনামে বিভোর। বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা হয়েছে কিন্তু শ্রীমূর্তি তো জাগ্রত হয়নি। আবার মনের শান্তি হারালেন লালাবাবু। এখন বৈষ্ণবসমাজে তিনি মহা-বৈষ্ণব রূপে সুপ্রতিষ্ঠিত। আর দীন দুঃখী আর্ত মানুষের হলেন প্রাণের ঠাকুর। সাধারণ মানুষের শ্রদ্ধায় সত্য সত্যই ঠাকুর হয়ে উঠেছিলেন লালাবাবু। কিন্তু সেই দেবমানবের প্রাণে শান্তি কোথায়? কৃষ্ণচন্দ্র তো এখনও দেখা দিলেন না। বিগ্রহ প্রাণময় হলো কোথায়? কথা তো বলে না ভক্ত সনে। বিষয় বাসনার চিন্তা তো মন থেকে মুছে ফেলেছি। তবে কেন দেখা দাও না প্রভু? কোথা কৃষ্ণ। দেখা দাও। দেখা দাও। ব্যাকুল হয়ে নয়নজলে ভাসতে ভাসতে রাধাপ্রাণবল্লভ কৃষ্ণচন্দ্রকে ডাকেন ভক্ত লালাবাবু। দিবানিশি কৃষ্ণ চিন্তায় বিভোর।

অকস্মাৎ একদিন স্বপ্ন দেখলেন, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র মৃদু হেসে স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলছেন,—লালা, আমার জন্য মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছো সেবা পূজার রাজকীয় ব্যবস্থা করেছো আমি সন্তুষ্ট হয়েছি। কিন্তু আমার যে আরো চাই।

প্রত্যুত্তরে বিচলিত হয়ে লালা বলেন, ঠাকুর! তুমি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধিকারী হয়ে আমার কাছে ভিক্ষা চাইছো? আমার কাছে এমন কি ধন আছে ঠাকুর?

—হ্যাঁ, লালা, তুমিই সেই ধনে ধনী।

—ঠাকুর! তুমি তো সর্বজ্ঞ। সবকিছুই জান। কেন রহস্য করছো। আমার প্রাপ্য অংশ থেকে পঁচিশ লক্ষ টাকা এনেছিলাম। সবই তো ব্যয় করেছি মন্দিরের কার্যে। আমি তো এখন নিঃস্ব। দীন বৈষ্ণব, ঠাকুর।

—না গো না। তোমার কাছে আরো আছে। আমার জন্য

একটি নূতন মন্দির নির্মাণ করবে। আর সেই মন্দিরটি নির্মিত হলেই তোমার সাধনায় সিদ্ধিলাভ হবে।

—সে কি ঠাকুর। আবার নূতন মন্দির কেমন করে গড়বো? আমি তো এখন কপর্দক হীন। দীন ভক্ত তোমার।

—বিচলিত হয়ো না। ঐ তো বললে, এখনও বুঝলে না। দীন ভক্ত তুমি আমার। আর আমি হলাম প্রাত-বৈরাগী। তুমি তোমার ভক্তহৃদয়ে আমার জন্য শ্রীমন্দির গড়ে তোল লালা। পারবে না? এই ভিক্ষাই চাইতে এসেছি তোমার কাছে।

উৎফুল্লচিত্তে লালাবাবু বললেন, পারবো। নিশ্চয়ই পারবো ঠাকুর। আমার হৃদয়মন্দিরে তোমায় চির অধিষ্ঠিত করে রাখতে চাই ঠাকুর। শুধু চাই তোমার কৃপা। বল বল ঠাকুর কোথায় বসে সে মন্দির গড়বো।

প্রত্যুত্তরে কৃষ্ণচন্দ্র বললেন,—তুমি ব্রজমণ্ডলের তীর্থগুলি পরিক্রমা করে শ্রীগোবর্ধনে চলে যাও। সেই গোবর্ধনের পবিত্র ভূমিতে বসে আমায় হৃদয়ে স্থাপন করে ধ্যানমগ্ন হয়ে তপস্যা করো।

আর এক মুহূর্ত দেরি করেননি লালাবাবু। গোবর্ধনে এসে মৃত্তিকা গোফার অভ্যন্তরে বসে জপ ধ্যানে মগ্ন হয়ে রইলেন। একবার শুধু মাধুকরীতে বের হন। ব্রজমায়ীরা যা ভিক্ষা দেয় তাই দিয়েই দিনাতিপাত করেন।

সেদিন ঘন মেঘে আছন্ন ছিল আকাশ। প্রবল বারিধারা নেমেছে শ্রীগোবর্ধনে। অশনি সম্পাতে থেকে থেকে কেঁপে উঠছে দিগন্ত। এমনি এক প্রাকৃতিক দুর্যোগে মাধুকরীতে বের হলেন না লালাবাবু। সারাদিন শ্রীকৃষ্ণ ভজনানন্দে বিভোর হয়ে রইলেন। বৈকালে প্রকৃতি শান্ত হলেও লালাবাবু গুফা থেকে নির্গত হলেন না। কৃষ্ণ নামেই মত্ত হয়ে রইলেন। কিন্তু অন্তরে অভিলাষ হলো শ্রীবিগ্রহের বৈকালিক ভোগ প্রসাদ লাভ করবার। এদিকে মন্দিরে ভোগ

আরতির পর আবার দেখা দিল প্রাকৃতিক দুর্যোগ। এই ঝড় জলে কে পৌঁছে দেবে প্রসাদ তাঁর ভজন গুফায়? পূজারীর মন কিন্তু বিচলিত হলো। মনে মনে ভাবলেন এই দুর্যোগে লালাবাবু নিশ্চয়ই অনাহারে আছেন। থালায় ভোগপ্রসাদ সাজিয়ে সুযোগের প্রতীক্ষায় রইলেন। প্রকৃতি একটু শান্ত হলেই লালাবাবুকে দিয়ে আসবেন। প্রসাদ। ইতিমধ্যে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র পূজারীর ছদ্মবেশে ভক্ত লালাবাবুকে আপন হাতে সাজিয়ে প্রসাদ দিয়ে এসেছেন। লালাবাবু এমন স্বাদের ভোগপ্রসাদ জীবনেও খাননি। অন্তরের অভিলাষ পূর্ণ হয়েছে। তৃপ্তিসহকারে ভোগপ্রসাদ গ্রহণ করে আবার ভজনানন্দে বিভোর হয়েছেন। এমন সময় পূজারী এসেছেন প্রসাদ নিয়ে মহাভক্তের ভজন গুফায়। লালাবাবু বিস্মিত হলেন আবার প্রসাদ হস্তে পূজা-রীকে দেখে। পূজারী তো কিছুই বুঝতে পারছেন না। অবশেষে সবকিছু শুনে বিস্মিত হলেন পূজারী আর অভিভূত হয়ে অশ্রু বিসর্জন করতে লাগলেন লালাবাবু। ভক্ত লালাবাবুর নয়নে অঝোরে ঝরতে লাগলো অশ্রুধারা, ঝরনা ধারার মত। ধীরে ধীরে সমাধিস্থ হলেন পরম বৈষ্ণব লালাবাবু।

দিন আসে রাত্রি যায়। মাসের পর মাস, বছরের পর বছর চলে যায়। আবার আসে নূতন বছর। নূতন দিন। আর একটি নূতন দিন আলোকিত হয়ে ওঠে। কিছুদিনের জন্তে বৃন্দাবনে এসেছেন লালাবাবু। ব্রজধামের পথে-পথে মন্দিরে মন্দিরে করেন মাধুকরী। সামান্য ভিক্ষা যা মেলে তাতেই দিনপাত করেন।

সেদিন বার বারই মনে আসছে গুরু কৃপার সঞ্জীবনী সুধা হতে এখনও রয়েছেন বঞ্চিত। সময় হলে সদ্‌গুরু লাভ হবে। এখনও কি সময় হয়নি? কোথায় সদ্‌গুরু। সদ্‌গুরুর আবির্ভাব তো হলো না। মনের উত্থিত প্রশ্ন মনের মধ্যেই প্রশমিত হলো। অকস্মাৎ মনে পড়লো মহাত্মা কৃষ্ণদাস বাবাজীর কথা, 'বিষয়ী জীবনের সূক্ষ্ম সংস্কার এখনো সামান্য কিছুটা রয়েছে।' আবার আকুল হয়ে মনে

মনেই বলে উঠলেন, বলে দাও প্রভু! কোথায় আমার বিষয়ী মনের সংস্কার? আমি তো দীন ভিখারীর জীবন যাপন করছি। আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না প্রভু তোমার রহস্যলীলা। আবার ভাবনা-চিন্তাগুলো কেমন এলোমেলো হয়ে গেল। হঠাৎ মনে হলো তাইতো আমি বৃন্দাবনের কত মন্দিরে যাই মাধুকরী করতে। কিন্তু কই শেঠজীদের মন্দিরে তো কখনও যাই না। আমি তো এখন অন্য জগতের মানুষ। দীন বৈষ্ণব। সে মন্দিরে যেতে আমার বাধা কোথায়? আর দেরি করেননি লালাবাবু। এসে উপস্থিত হলেন শেঠজীর মন্দিরে মাধুকরী করতে। বৃদ্ধ শেঠজী লালাবাবুর আগমন সংবাদে চঞ্চল হয়ে ছুটে এলেন—স্বয়ং ভিক্ষাদানের জন্য। এ যে শেঠদের কল্পনারও অতীত। সেদিন মন্দিরপ্রাঙ্গণে পড়ে গেল মহা আলোড়ন। চাল ডাল ফল মূলের সঙ্গে একশত একটি স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে মস্তক অবনত করে শেঠজী বললেন, বাবুজী আপনার পদধূলিতে এ দীনের কুটির পবিত্র হলো আজ। দয়া করে এ থালটি গ্রহণ করলে আমরা ধন্য হবো।

প্রত্যুত্তরে বিনয়ের অবতার লালাবাবু নম্রস্বরে বিনীতভাবে বললেন, আমি মাধুকরী করতে এসেছি। কৃষ্ণনাম শুনিয়েছি। এখন একমুষ্টি তণ্ডুল ভিক্ষা দিন। আপনি যা দিতে এনেছেন তাকে ভিক্ষা বলা যায় না শেঠজী।

—ঠিকই বলছেন লালাবাবু! এ ভিক্ষা নয়, নজরানা। রাজ-ভিখিরী হয়ে রাজা লালাবাবু আমাদের যে হারিয়ে দিয়েছেন। তাইতো এ নজরানা গ্রহণ করতে অনুরোধ করছি।

—তা হয় না শেঠজী। আমি যে বৈষ্ণব। চির বৈরাগী। স্বর্ণথালা তো স্পর্শ করতে পারবো না। শুধু একমুষ্টি তণ্ডুল ভিক্ষা দিন। আর একটা ভিক্ষা দিন যদি কখনও আপনাদের মনস্তাপের কারণ হয়ে থাকি সেজন্য ক্ষমা করবেন। আর আশীর্বাদ করুন এ অভাজনের হৃদয়ে যেন কৃষ্ণভক্তি চিরদিন বিরাজমান থাকে।

এবারে আর শেঠজী নীরব হয়ে স্থির থাকতে পারলেন না। দুই বাহু প্রসারিত করে গৌরকান্তি পরম বৈষ্ণব লালাবাবুকে বক্ষে আলিঙ্গন করে অশ্রুবিসর্জন করতে লাগলেন। লালাবাবু ও বৃদ্ধ শেঠজী উভয়েই আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে প্রেমাবেগে উচ্ছ্বসিত হলেন। অভাবনীয় অনির্বচনীয় সে দৃশ্য নয়নগোচর করে মুগ্ধ ও বিস্মিত হলেন উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ। লালাবাবুর মনের সব দ্বন্দ্ব ও চাঞ্চল্য শান্ত হয়ে গেছে। আর কোন সংশয় নেই মনে। ধীর পদক্ষেপে বের হয়ে এলেন শেঠের মন্দির হতে। সম্মুখের গলিপথ ধরে কুটিরের দিকে যাত্রা করলেন। অকস্মাৎ পথ রোধ করে দাঁড়ালেন মহাত্মা কৃষ্ণদাস বাবাজী। ভক্ত শিষ্যকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করে বললেন, 'লালা, এবার তোমার সময় হয়েছে। অন্তরের গভীরে গোপন অহমিকাবোধ এতদিনও সুপ্ত ছিল। আজ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল। এখন তোমার চিত্তশুদ্ধি হয়েছে। তুমি মুক্তপুরুষ। সন্ন্যাসীদের দীক্ষা গ্রহণে আর কোন অন্তরায় নেই।'

অবশেষে শ্রীগোবর্ধনের পরম পবিত্রভূমিতে ভেক দীক্ষা দিলেন সিদ্ধপুরুষ কৃষ্ণদাস বাবাজী লালাবাবুকে। বৈষ্ণব সন্ন্যাসীর নাম হলো শ্রীচৈতন্যদাস বাবাজী। শ্রীগোবর্ধনে ভজন গোফার নিভৃতে কঠোর সাধনায় ব্রতী হলেন দীন বৈষ্ণব লালাবাবু। মাস গেল। বছর ঘুরে বছর এলো। রুক্ষ বৈরাগ্যের পীড়নে শুধু দেহটাই সন্ন্যাসী হয় নি মনও সন্ন্যাসী হয়েছিল ভক্ত লালাবাবুর। আর এই শ্রীগোর্ধনের পরম পবিত্র ভূমিতে শান্ত পরিবেশে মায়াময় জীবনের কামনা বাসনা থেকে অনেক দূরে বেশী নিরাপদ হয়ে সাধনার জীবন যাপন করতে লাগলেন। পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ চিন্তায় বিভোর হয়ে রইলেন। ইষ্ট দর্শনের ব্যাকুলতাও দিনে দিনে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে লাগল। ধীরে ধীরে দেহমন ভূমানন্দে ভরে গেল। যেন সচ্চিদানন্দ সাগরে অবগাহন করে উঠলেন ভক্তপ্রাণ লালাবাবু। অন্তরে বাইরে সর্বত্রই কৃষ্ণকে উপলব্ধি করলেন। কৃষ্ণময় হয়ে উঠলো লালাবাবুর জগৎ সংসার। মুগ্ধ চিত্তে দর্শন করলেন ইষ্টকে। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে। মনশ্চিত্রে সর্বজীবে কৃষ্ণচন্দ্রকে

দর্শন করে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করলেন প্রেমের অবতার লালাবাবু। ভক্তপ্রাণ লালাবাবু। রাজর্ষি লালাবাবু। ভক্ত ও ভগবানের লীলা-খেলা চললো শ্রীগোবর্ধনে, বৃন্দাবনধামে, সমগ্র ব্রজমণ্ডলে। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরও এলো ঘুরে।

আবার একদিন এই লীলাখেলারও হলো অবসান। এলো সেই ভীষণ দিনটি। বৈষ্ণব আকাশের একটি উজ্জ্বল তারকা স্খলিত হয়ে পড়লো আকাশের বক্ষ হতে।

সেদিন গোয়ালিয়রের রাজমাতা এসেছেন শ্রীগোবর্ধনে শ্রীকৃষ্ণ লীলাভূমি দর্শন মানসে। সঙ্গে ঘোড়সওয়ার পাইক বরকন্দাজ অসংখ্য লোকজন। পরমবৈষ্ণব লালাবাবুও বের হয়েছেন গুফা থেকে মাধুকরীর জন্য। অকস্মাৎ গোয়ালিয়র-রাজের এক অশ্বের পায়ের আঘাতে হলেন ধরাশায়ী। তখনও কিন্তু শান্ত নির্বিকার বৈষ্ণব লালাবাবু। ছুটে এলেন রাজমাতা। রাজর্ষি লালাবাবুর নিকট। বার বার ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। লালাবাবু কিন্তু ঐ আঘাতটির মধ্যে দিয়েও প্রেমময় ভগবানের প্রেমলীলাই অনুভব করেছিলেন মনে মনে। তাইতো রাজমাতার দিকে পুণ্য স্নিগ্ধ দৃষ্টি তুলে বিচলিত হতে বারণ করেছিলেন। অসুস্থ হয়ে শয্যাগ্রহণ করলেন। দীর্ঘদিন ধরে চললো রোগভোগের পালা। ভক্তমণ্ডলী নিয়ে এলো তাঁকে শ্রীধাম বৃন্দাবনে। শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রমার চরণতলে। জীবনের শেষ দিনটি লালাবাবুর অতিবাহিত হলো যমুনা পুলিনের রাসস্থলীতে। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বিগ্রহের সম্মুখে। রাধাপ্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের চরণ আশ্রয় করে।

১২২৮ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে লালাবাবু যমুনা পুলিনের রাসস্থলীতেই দেহলীলা সংবরণ করলেন। ব্রজ-মণ্ডলের দুঃখী তাপী আর্ত মানুষেরা উদারহৃদয় প্রেমময় এই মহাপুরুষের বিয়োগ ব্যথায় শোকসাগরে হলেন নিমগ্ন। সত্য সত্যই কৃষ্ণচন্দ্র ও রাধারাণীর অনন্ত বৈচিত্র্যময় যুগললীলা দর্শন করতে করতেই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন পরমবৈষ্ণব ভক্তপ্রাণ লালাবাবু। হৃদয়বান এই মহাপুরুষের হৃদয়টি আজও যেন তাই ফুল হয়ে ফুটে রয়েছে প্রেমময়ের লীলাভূমি শ্রীধাম বৃন্দাবনেরই মাটিতে।

শ্রীরূপ ও সনাতন গোস্বামী

মহাপ্রভু চৈতন্যদেব যখন বাংলাদেশে ভক্তিবাদের প্লাবন এনে দিয়েছিলেন, তখন সেই ভক্তিরসামৃত সিন্ধু পান করে এই বঙ্গভূমিরই দুই সহোদরের মনের মাটি হয়ে উঠেছিল সিক্ত। তাঁরা তাঁদের মনের ব্যাকুলতা জানিয়ে চৈতন্যদেবকে পত্রও লিখেছিলেন। মহাপ্রভু পত্রখানি পাঠ করে তাঁদের মনের অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন, এবং প্রত্যুত্তরে একটি শ্লোক রচনা করে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

পরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্মসু।
তদেবা স্বাদয়ন্ত্যন্তর্নবসঙ্গ রসায়নম্॥

পরাধীনা রমণী গৃহকর্মে নিযুক্তা থেকেও যেমন নব সঙ্গের রস মনে মনে আস্বাদন করে, সেইরূপ বিষয়কর্মে ব্যাপৃত থেকেও তোমরা ঈশ্বরের চিন্তা করবে।

তারপর চৈতন্যদেব যখন রামকেলিতে আগমন করেন তখন এই দুই সহোদর শ্রীগৌরসুন্দরের অলৌকিক মাধুর্যমণ্ডিত মুখমণ্ডল আর মুখনিঃসৃত অমিয় অমৃতনিস্যন্দী বাণী শ্রবণ করে মুগ্ধ ও অভিভূত হলেন। আত্মসমর্পণ করলেন গৌরাঙ্গ চরণে। শ্রীগৌরাঙ্গও দুই সহোদরের আকুলতায় প্রীত হলেন। স্নেহালিঙ্গন দিয়ে শিষ্যরূপে গ্রহণ করলেন। আর বললেন, 'তোমরা বিষয় ত্যাগ করে নিশ্চিন্ত মানস হও।'

এই দুই সহোদরই হলেন শ্রীরূপ ও শ্রীল সনাতন গোস্বামী।

গৌড়ের সুলতান হোসেন শাহের দুই মন্ত্রী। দবীর খাস ও সাকর মল্লিক। তাঁরা নিজ নিজ গুণে পাতসাহের প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠেন। পাতসাহ শ্রীরূপকে দবীর খাস আর শ্রীল সনাতনকে সাকর মল্লিক উপাধি প্রদান করে উভয়কেই অভিষিক্ত করলেন মন্ত্রী পদে। (দবীর খাস অর্থে উত্তম লেখক। আর সাকর অর্থে জ্ঞানবান এবং মল্লিক অর্থে শ্রেষ্ঠ মর্যাদাশীল।)

১৩০৩ শকে কর্ণাটদেশে সর্বজ্ঞ নামে ছিলেন এক রাজা। তিনি যজুর্বেদীয় ব্রাহ্মণ। এগারো বৎসর রাজত্ব করে অকালেই দেহলীলা সংবরণ করেন। পিতার মৃত্যুর পর একমাত্র পুত্র অনিরুদ্ধ ১৩১৪ শকে কর্ণাটের অধীশ্বর হলেন। অনিরুদ্ধের দুই পুত্র রূপেশ্বর ও হরিহর। ১৩৩৮ শকে অনিরুদ্ধের মৃত্যু হলে দুই ভ্রাতার মধ্যে রাজত্ব নিয়ে বাধলো বিবাদ। রূপেশ্বর যুদ্ধে পরাজিত হয়ে গৌড় দেশের রাজার আশ্রয়প্রার্থী হলেন। গৌড়রাজ ছিলেন অনিরুদ্ধের বিশিষ্ট বন্ধু। সাদরে আশ্রয় দিলেন বন্ধুপুত্র রূপেশ্বরকে। রূপেশ্বর স্থায়ীভাবে বাংলাদেশে বাস করে মনেপ্রাণে বাঙালী হয়ে পড়েছিলেন। এবং পরবর্তী বংশধরেরা বাংলার জল-হাওয়ায় মানুষ হয়ে পূর্ণ বাঙালীত্ব প্রাপ্ত হয়েছিলেন। দক্ষিণের কোন চিহ্নই বিদ্যমান ছিল না। রূপেশ্বরের মৃত্যুর পর পুত্র পদ্মনাভ গৌড়ের মন্ত্রিত্ব পদ লাভ করলেন। এবং বৃদ্ধ বয়সে স্ব-ইচ্ছায় মন্ত্রিত্ব পদ ত্যাগ করে গঙ্গাতীরের নৈহাটী গ্রামে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে লাগলেন। এই ধর্মপ্রাণ পদ্মনাভের পাঁচ পুত্র। পুরুষোত্তম জগন্নাথ নারায়ণ মুরারি ও মুকুন্দ। মুকুন্দের পুত্র কুমার। আর এই কুমারেরই পুত্র সনাতন রূপ ও বল্লভ। শ্রীরূপের পিতৃদত্ত নাম সন্তোষ আর সনাতনের নাম অমর।

১৩০৪ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীল সনাতন এবং ১৩৩৮ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরূপ এই ধরণীর ধূলিতে হলেন আবির্ভূত। দিনে দিনে শিশুদ্বয় বড় হয়ে উঠতে লাগলো। আবার শৈশবের সে আনন্দ উচ্ছল দিনগুলিরও

হলো অবসান। বাল্য ও কৈশোরে শুরু হলো শিক্ষাজীবন। সর্বজনশ্রদ্ধেয় পণ্ডিত সার্বভৌম ভট্টাচার্যের সহোদর পণ্ডিতপ্রবর বিদ্যাবাচস্পতি মহাশয় হলেন শিক্ষাগুরু। শ্রুতি স্মৃতি ও বিবিধ শাস্ত্র পাঠ শুরু হলো। শিক্ষাজীবনে অসাধারণ মেধার পরিচয় দিলেন ভ্রাতৃদ্বয়। অবশেষে সর্বশাস্ত্রে পণ্ডিত হয়ে উঠলেন। ধীরে ধীরে তাঁদের পাণ্ডিত্যের যশঃসৌরভ সমগ্র বঙ্গদেশে বিকীর্ণ হয়ে পড়লো। গৌড়ের সুলতান তাঁদের জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের খ্যাতির কথা শুনে মন্ত্রিত্ব পদে করলেন বরণ। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ভ্রাতৃদ্বয় রাজকার্যেও কর্মকুশলতার পরিচয় দিয়ে সুনাম অর্জন করলেন। আর অপরিমেয় অর্থ বিষয় বৈভবও করলেন লাভ। গৌড়ের সন্নিকটে রামকেলিতে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে লাগলেন। প্রাসাদোপম অট্টালিকায়। প্রাচুর্য ও ঐশ্বর্যের জীবনেও বিদ্যা-দেবীর আরাধনা হতে বিরত হলেন না ভ্রাতৃদ্বয়। 'হংসদূত' ও 'পদ্যাবলী' নামক গ্রন্থদ্বয় রচনা করে যশ লাভ করলেন। ঠিক এই সময় সনাতন ধর্ম ব্রাহ্মণদের বাহ্যক্রিয়া-কর্মানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শুষ্ক নীরস মূর্তি ধারণ করেছিল। ধর্মের সেই দুরবস্থার যুগে চৈতন্যদেব আবির্ভূত হয়ে ধর্মের নীরস মূর্তিকে সরস করে তুললেন। ভক্তিবাদের বীজ বপন করতে লাগলেন সমগ্র বঙ্গভূমিতে। মুষ্টিমেয় ব্রাহ্মণের কুক্ষিগত ধর্ম জনমানসের ধর্মে হলো রূপান্তরিত। ভক্তি-বাদের বীজ অঙ্কুরিত হয়ে ধীরে ধীরে বৃক্ষে হলো পরিণত। হরিনাম গানে আর মৃদঙ্গের ধ্বনিতে প্রচারিত হলো প্রেমধর্ম। সেই প্রেমধর্মের প্লাবনে ভেসে গেল নবদ্বীপ, শান্তিপুর, গৌড়দেশ ও সমগ্র বঙ্গভূমি। আর সেই কৃষ্ণপ্রেমের ঢেউ এসে লাগলো এই দুই সহোদরের বুকে। সিক্ত হলো দেহ মন। ব্যাকুল হলো প্রাণ।

প্রেমরসে অভিষিক্ত হয়ে শ্রীরূপের হৃদয়ে তীব্র বৈরাগ্যের অনল প্রজ্বলিত হয়ে উঠলো।

গৌড়ের সুলতানের মন্ত্রিত্ব পদ ত্যাগ করলেন। অর্থ বিষয়

সম্পত্তি, আত্মীয়-স্বজন ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবদের মধ্যে বণ্টন করে কনিষ্ঠ ভ্রাতা বল্লভ সহ যাত্রা করলেন প্রেমের ঠাকুর শ্রীগৌরসুন্দরের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ অভিলাষে। মহাপ্রভু তখন বৃন্দাবনের পথে প্রয়াগ-ধামে লীলারসে মত্ত।

ত্রিবেণী স্নান করে হরিনাম গানে বিভোর হয়ে অগণিত ভক্তবৃন্দ সহ বিন্দুমাধব দর্শনে চলেছেন। সেই দেবমন্দিরেই সাক্ষাৎ হলো মহাপ্রভুর সঙ্গে। শ্রীরূপের বিনয় দৈন্য ও ভক্তি নিষ্ঠা দেখে প্রীত হলেন। স্নেহালিঙ্গন দিলেন মহাপ্রভু। ভক্তপ্রবর বল্লভ ভট্টের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। তারপর প্রয়াগের অদূরে অম্বুলি গ্রামে বল্লভ ভট্টের গৃহে অবস্থান কালে মহাপ্রভু শ্রীরূপকে পরমার্থতত্ত্ব শিক্ষা দিলেন। ভক্তিলতা বীজ লাভ করলেন রূপ গোস্বামী স্বয়ং মহাপ্রভুর নিকট হতে। রূপ গোস্বামী নামও অবশ্য চৈতন্যমহাপ্রভুই দিয়েছেন। অনুরাগী ভক্ত শিষ্য দৈন্যের অবতারকে। মস্তক মুণ্ডন করে সন্ন্যাসীর দীক্ষা দিলেন আর এই নূতন নামে করলেন অভিষিক্ত।

অবশেষে মহাপ্রভু আদেশ করলেন রূপ গোস্বামীকে শ্রীধাম বৃন্দাবনে গিয়ে শাস্ত্রানুশীলন করে ভক্তি ধর্মের প্রচার করতে। প্রেমের ঠাকুর শ্রীগৌরসুন্দরের সাহচর্যলাভ করে রূপ গোস্বামীর মনের সব দ্বন্দ্ব ও চাঞ্চল্য তখন হয়ে গিয়েছে শান্ত। যাত্রা করলেন শ্রীধাম বৃন্দাবনের পথে। আর চৈতন্যদেব যাত্রা করলেন কাশীধাম অভিমুখে।

এই সময়ে মহাপ্রভুর সঙ্গে সাক্ষাতের বিস্তৃত বিবরণ দিয়ে পত্র লিখলেন ভ্রাতা সনাতনকে রূপগোস্বামী। আর সাঙ্কেতিক চিহ্ন দিয়ে একটি তাৎপর্যপূর্ণ শ্লোকের ইঙ্গিত করলেন। শ্রীল সনাতন সেই সাঙ্কেতিক অক্ষর অনুসরণ করে রচনা করলেন শ্লোক—

যদুপতেঃ ক্ব গতা মথুরাপুরী
রঘুপতেঃ ক্ব গতোত্তর কোশলা।

ইতি বিচিন্ত্য কুরুষ মনঃ স্থিরং
ন সদিদং জগদিত্যবধারয় ॥

যদুপতি কৃষ্ণের সে মথুরাপুরী কোথায় হয়েছে গত, আর রঘু-পতির উত্তর কোশলই বা আজ কোথায়? এ কথা চিন্তা করে তোমার মনকে কর স্থির আর জগতের নশ্বরত্বকে কর উপলব্ধি। শ্লোক রচনা করে আর তার যথাযথ অর্থ করে ব্যাকুল হলেন সনাতন পরমাশ্রয় লাভের জন্য। চিত্তচাঞ্চল্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হলো। বিষয় বৈভব বিষময় হয়ে উঠলো। গৌরাঙ্গপ্রেমে আকুল হয়ে রাজকার্যেও অমনোযোগী হলেন।

মন্ত্রিত্ব পদ ত্যাগ করবার সিদ্ধান্তও করে ফেললেন স্থির। রাজসভায় যোগদান হতে বিরত হলেন। এবং নিজেকে অসুস্থ বলে প্রচার করে দিলেন। বিচলিত হলেন গৌড়ের সুলতান হুসেন শাহ্। তিনি সুচিকিৎসার ব্যবস্থাও করলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। অবশেষে কবিরাজ বলে দিলেন সুলতানকে, এ সাধারণ রোগ নয় এ হলো দিব্যভাবের রোগ। দিব্যোন্মাদনা। এবারে ক্রুদ্ধ হলেন হুসেন শাহ্। বললেন, তোমার এক ভ্রাতা যে পথে যাত্রা করেছে সে পথ অনুসরণ করা যুক্তিযুক্ত হবে না। তারপর আদেশের সুরে ইঙ্গিত করলেন উড়িষ্যার যুদ্ধে সুলতানের সহযাত্রী হতে। প্রত্যুত্তরে দৃঢ়কণ্ঠে শ্রীল সনাতন প্রত্যাখ্যান করলেন সুলতানের আদেশ। হুসেন শাহ্ ঠিক সেই সময় উড়িষ্যারাজের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হচ্ছি-লেন। এবং সুচতুর ও বুদ্ধিমান মন্ত্রীকে মন্ত্রণাদাতা রূপে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার একান্ত ইচ্ছা।

গৌড় সুলতান আরও ক্রোধান্বিত হয়ে উঠলেন মন্ত্রী সাকর মল্লিকের মনোভাব বুঝতে পেরে। এবং কারাগারে নিক্ষেপ করলেন মন্ত্রী সাকর মল্লিককে।

হুসেন শাহ্ রাজধানী ত্যাগ করে চলে গেলেন। ব্যস্ত রইলেন রণক্ষেত্রে। সচেষ্ট হলেন বন্দী মন্ত্রিবর সাকর মল্লিক, কৌশলে

কারাগার থেকে নির্গত হওয়ার জন্য। সে চেষ্টায় সফলও হয়েছিলেন মন্ত্রিবর। সাত হাজার টাকার বিনিময়ে কারারক্ষকের সাহায্যে কারামুক্ত হয়ে গোপনে গৌড় ত্যাগ করে বৃন্দাবনের পথে করলেন যাত্রা। সঙ্গী হলো একমাত্র বিশ্বস্ত ভৃত্য ঈশান। গৌরহরি নাম সম্বল করে দুস্তর দুর্গম পথ অতিক্রম করে চলেছেন। তখন অপরাহ্নের আলো ম্লান হয়ে এসেছে। বৃক্ষবহুল এক অরণ্যের কিনারা ধরে চলেছেন। অদূরে এক জনপদ। অবশেষে উভয়ে আশ্রয় নিলেন এসে জনপদের অপরিচিত এক মানুষেব গৃহে। অতি সাধারণ এই বৈরাগীদ্বয়কে রাজজনোচিত সমাদরে আপ্যায়িত করলেন গৃহস্থ। বিব্রত বোধ করলেন বৈরাগী সাকর মল্লিক। গোপনে জিজ্ঞেস করলেন ঈশানকে সঙ্গে স্বর্ণমুদ্রা আছে কিনা। ভৃত্য ঈশানের সঙ্গে তখনও ছিল পনেরোটি মোহর। বুদ্ধিমান সাকর মল্লিক সেই পনেরোটি মোহরই গৃহস্থকে দিয়ে নিশ্চিন্ত হলেন। তিনি গৃহস্থ ছিলেন না, ছিলেন দস্যুসর্দার। সেই লুব্ধ দস্যুকে সর্বস্ব দিয়ে জীবনহানির বিপদ হতে মুক্ত হয়ে আবার যাত্রা করলেন মহাজীবন লাভের পথে। শ্রীগৌরাঙ্গ সন্নিধানে। এবারে বিদায় দিলেন একমাত্র সঙ্গী প্রিয় অনুচর ঈশানকে। একাকী চলেছেন সেই চির আপনের সন্ধানে। মাঠ ঘাট প্রান্তর বনভূমি গ্রামের পর গ্রাম শহরের পর শহর অতিক্রম করে এসে উপস্থিত হলেন স্বর্ণময়ী কাশীধামে। মহাপ্রভু তখন অবস্থান করছিলেন ভক্তপ্রবর চন্দ্রশেখরের গৃহে। ভক্তবৃন্দ পরিবৃত হয়ে মধুর হরিনাম সুধা বিতরণ করছিলেন। বৈরাগী সাকর মল্লিক দন্তে তৃণ ধারণ করে দীনভাবে ভবনদ্বারে দণ্ডায়মান রইলেন। অন্তর্যামী মহাপ্রভু ভক্তের আগমন বার্তা জানতে পেরে একজন ভক্তকে গৃহদ্বারের অপেক্ষমাণ বৈষ্ণবকে ভিতরে নিয়ে আসবার আদেশ করলেন। কিন্তু ভক্তটি কোন বৈষ্ণবকেই দেখতে না পেয়ে মহাপ্রভুকে বললেন—কোন বৈষ্ণবকে দেখছি না। তবে একজন কাঙালকে দেখলাম দাঁড়িয়ে আছে।

মৃদু হেসে মহাপ্রভু সেই কাঙালকেই তাঁর সন্নিকটে নিয়ে আসবার আদেশ করলেন।

অবশেষে গৌড় সুলতানের প্রতাপান্বিত মন্ত্রিবর সাকর মল্লিক দীনবেশে আকুল হয়ে নয়নজলে ভাসতে ভাসতে শ্রীগৌরসুন্দরের চরণে আত্মসমর্পণ করলেন :

দুই গোছা তৃণ করে
এক গোছা দন্তে ধরে,
পড়িলা গৌরাঙ্গ রাঙা পায়।
দুনয়নে শত ধারা
রাজদণ্ডি জন পারা
অপরাধী আপনা মানয়॥

ভক্তপ্রিয় চৈতন্য মহাপ্রভু গাঢ় আলিঙ্গনাবদ্ধ হলেন ভক্তপ্রাণ সাকর মল্লিকের সঙ্গে। অমেয় সৌভাগ্যবান ভক্তবৃন্দ এ দৃশ্য নয়ন-গোচর করে মুগ্ধ বিস্মিত ও অভিভূত হলেন। তারপর এই পুণ্যময় কাশীধামেই সন্ন্যাসমন্ত্রে করলেন দীক্ষিত ভক্তপ্রবরকে। সাকর মল্লিক হলেন সনাতন গোস্বামী। চৈতন্য মহাপ্রভুর অন্যতম পরিকর পরম বৈষ্ণব শ্রীরূপ আর সনাতন গোস্বামী। মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামীকে ভক্তিতত্ত্ব শিক্ষা দিলেন এই কাশীধামেই। তারপর আদেশ করলেন বৃন্দাবনধামে অবস্থান করে ভক্তিতত্ত্ব প্রচার করবার। তাহলেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রফুল্ল হবেন। মহাপ্রভুর আদেশ অবনত মস্তকে গ্রহণ করে সনাতন গোস্বামী যাত্রা করলেন শ্রীধাম বৃন্দাবনের পথে। আর মহাপ্রভু স্বয়ং অগ্রসর হলেন শ্রীক্ষেত্রের পথে।

অরণ্যসঙ্কুল দুর্গমপথ অতিক্রম করে সনাতন গোস্বামী শ্রীকৃষ্ণ লীলাভূমি বৃন্দাবনে এসে উপস্থিত হলেন। কিন্তু প্রিয় সহোদর শ্রীরূপের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো না। শ্রীরূপ ইতিমধ্যে কাশীধামের পথে যাত্রা করেছেন। ভিন্ন এক পথে। তাইতো পথিমধ্যেও

উভয়ের মিলন হয় নি। অবশেষে আশ্রয় নিলেন সুবুদ্ধি রায়ের আলয়ে। এই সুবুদ্ধি রায় এক সময় গৌড়ের অধীশ্বর ছিলেন। ভাগ্য বিপর্যয়ে রাজ্যচ্যুত হন। আর কর্মচারী হুসেন শাহ্ হলেন সুলতান। আবার এই হুসেন শাহ্ কর্তৃকই ইনি হলেন জাতিভ্রষ্ট। সুবুদ্ধি রায় চলে এলেন কাশীধামে। মহা মহা পণ্ডিতদের নিকট পাপস্খালন বিধান চাইলেন। কাশীর মহাজ্ঞানী পণ্ডিতেরা বললেন, গঙ্গা সলিলে আত্মাহুতি দিলে পাপ স্খালন হবে। বিচলিত ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত সুবুদ্ধি রায় চৈতন্য মহাপ্রভুর শরণাপন্ন হলেন। চৈতন্যপ্রভু আশ্বাস দিয়ে বললেন—'কৃষ্ণনামই মহাপাপের একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত বিধি। তুমি বৃন্দাবনে বাস করে কৃষ্ণ নাম কর।' সেই থেকে সুবুদ্ধি রায় বৃন্দাবনে বাস করছেন। সুবুদ্ধি রায় সাদরে গ্রহণ করলেন দীন বৈষ্ণব সনাতন গোস্বামীকে। দুই দিন মাত্র অবস্থান করেই সনাতন গোস্বামী গৃহের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য হতে বিরত হলেন। আশ্রয় নিলেন বৃক্ষতলে। শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলার মাধুর্যরস আস্বাদন করে গ্রন্থরচনায় করলেন মনোনিবেশ।

সেদিন এক অলৌকিক ঘটনা ঘটলো সনাতন গোস্বামীর জীবনে। ভোরে স্নান করতে এসেছেন গোস্বামী প্রভু যমুনায়। যেমন আসেন প্রতিদিন। ভোরের আলো ছলছল করছে যমুনার জলে। হঠাৎ চমকে উঠলেন গোস্বামী প্রভু। সোনার রং নয়, সত্যকার সোনা দেখতে পেয়ে চমকে উঠলেন। যোগসিদ্ধ মহাপুরুষ। কাছে যেতেই আরও স্পষ্ট হয়ে উঠলো সোনার চেয়েও মূল্যবান স্পর্শমণি। পরশপাথর। যার স্পর্শে তুচ্ছ লোহাও হয়ে যায় সোনা। মনে মনে ভাবলেন গোস্বামী কৃষ্ণের এ আবার কোন্ পরীক্ষা, কে জানে! তুলে নিয়ে নদীতীরে বালি চাপা দিয়ে রাখলেন। তারপর বসে রইলেন যমুনাতীরে কোন ভিক্ষুক এলে ভিক্ষা দিয়ে মুক্ত হবেন।

হঠাৎ এক ব্যক্তি এসে কৃপাপ্রার্থী হলেন। উপবাসখিন্ন কলেবর, ধূলিধূসরিত নগ্নপদ আর জীর্ণ উত্তরীয়।

আগন্তুক বললেন,—আমি মহাশয়ের সাহায্যপ্রার্থী। তারপর বর্ণনা করলেন তাঁর জীবনবৃত্তান্ত। বর্ধমান জেলার মানকর নিবাসী দরিদ্র এক ব্রাহ্মণ তিনি। নাম জীবন। অর্থাভাবে সংসার প্রতিপালনে অপারগ হয়ে অর্থকষ্ট হতে পরিত্রাণ লাভের জন্য কাশীধামে এসে মহেশ্বরের সাধনায় প্রবৃত্ত হন। কামনা বাসনা সাধনা হলো অর্থপ্রাপ্তির জন্য। দরিদ্র ব্রাহ্মণের একাগ্রতায় সন্তুষ্ট হয়ে মহেশ্বর স্বপ্নে নির্দেশ দিলেন,—বৎস, বৃন্দাবনে গিয়ে সনাতন গোস্বামীর শরণাপন্ন হও ঐশ্বর্য প্রাপ্তি ঘটবে।

তাইতো দরিদ্র ব্রাহ্মণ কাশীধাম থেকে ছুটে এসেছেন বৃন্দাবনে সনাতন গোস্বামীর কৃপালাভার্থী হতে। সনাতন গোস্বামী মৃদু হেসে বললেন সবই কৃষ্ণের ইচ্ছা, আমি স্নান সমাপন করেছি আর স্পর্শ করবো না। তারপর অঙ্গুলি নির্দেশে দেখিয়ে দিলেন যেখানে পরশ-পাথর বালিঢাকা ছিল।

দরিদ্র ব্রাহ্মণ ছুটে বালি অপসারণ করে সেই মহামূল্যবান রত্নটি দেখতে পেয়েই বিস্মিত হলেন। পরমুহূর্তেই লুব্ধ শ্বাপদের মত ঝাঁপিয়ে পড়লেন পরশপাথরের উপর। যেন তাঁর জীবনের স্বর্ণময় স্বপ্নের সব সফলতা লুকিয়ে ছিল যমুনার ঐ বালুকাময় তীরে। তারপর প্রীত মনে দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরম বৈষ্ণব সনাতন গোস্বামীর চরণধূলি মাথায় নিয়ে যাত্রা করলেন গৃহাভিমুখে। কিন্তু বেশী পথ যেতে পারেন নি সেই আগন্তুক ব্রাহ্মণ। কি চিন্তা করে আর কিসের জন্য আকুল হয়ে আবার এসেছিলেন ফিরে। অকস্মাৎ কেন জানি তাঁর বিষয়বৈভব আর কামনা বাসনার জীবন স্বপ্নগুলি হয়ে গেল ছিন্ন-ভিন্ন। তুমুল এক আলোড়ন সৃষ্টি হলো তাঁর মনোজগতে। স্নান করে পবিত্র হয়েছেন বলে মূল্যবান পরশপাথর যিনি ঘৃণায় স্পর্শ মাত্র করলেন না, অবহেলা ভরে শুধু অঙ্গুলি সংকেত করলেন, তাহলে নিশ্চয়ই এই সন্ন্যাসীর কাছে রত্নাধিক কোন অমৃতের ভাণ্ড আছে সে অমৃতের স্বাদের কাছে পৃথিবীর সব মণিমাণিক্যের স্বাদ হয়ে যায়

তুচ্ছ। সুতরাং এই সন্ন্যাসীর কৃপাপ্রার্থী হলে ঐ মহামূল্যবান রত্নটিও লাভ করা যেতে পারে। এই চিন্তাতেই ব্যাকুল হয়েছিলো সেই আগন্তুকের মন। তারপর পরশপাথর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সনাতন গোস্বামীর চরণে আত্মসমর্পণ করে কৃষ্ণপ্রেমের ঐশ্বর্য লাভ করে ঐশ্বর্যবান হয়েছিলেন। দীন ব্রাহ্মণের মনের সব দ্বন্দ্ব ও চাঞ্চল্য হয়ে গিয়েছিল শান্ত কৃষ্ণপ্রেমতত্ত্ব লাভ করে।

ইতিমধ্যে শ্রীরূপ গোস্বামী শ্রীক্ষেত্রে এসে উঠলেন হরিদাস ঠাকুরের কুটিরে। প্রতিদিন এসে দর্শন দেন মহাপ্রভু শ্রীরূপ গোস্বামীকে। পরিকরমণ্ডলী পরিবৃত হয়ে মুগ্ধচিত্তে শ্রবণ করেন, শ্রীরূপ রচিত 'বিদগ্ধ-মাধব' নাটকের অংশ। অদ্বৈতাচার্য যখন শ্রীক্ষেত্রে ছিলেন তিনিও শ্রীরূপ মুখনিঃসৃত এই নাটক পাঠ শুনে রসাস্বাদন করেছিলেন। নিত্যানন্দ প্রভু ও রায় রামানন্দও এই নাটকের মাধুর্য রস পান করে মুগ্ধ হয়েছিলেন।

তারপর একদিন শ্রীক্ষেত্রের লীলা সাঙ্গ করে শ্রীরূপ গোস্বামী আবার ফিরে এলেন বৃন্দাবনধামে। মিলিত হলেন সহোদর সনাতন গোস্বামীর সঙ্গে। শুরু হলো ভ্রাতৃদ্বয়ের কঠোর সাধনার জীবন। মাধুকরীব্রত অবলম্বন ও শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলার মাধুর্যরস আস্বাদন আর সেই সুধারস বিতরণ করেন গ্রন্থ রচনার মাধ্যমে। সনাতন গোস্বামী রচনা করলেন, বৃহদ্‌ভাগবতামৃত, বৈষ্ণবতোষিণী, শ্রীকৃষ্ণলীলাস্তব, শ্রীহরিভক্তিবিলাসটীকা এবং লঘু হরিণামামৃত, ব্যাকরণ। আর শ্রীরূপ গোস্বামী রচনা করলেন, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু উজ্জ্বলনীলমণি, লঘুভাগবতামৃত, বিদগ্ধ-মাধব, ললিত-মাধব, স্তবমালা, শ্রীরাধাকৃষ্ণগনোদ্দেশদীপিকা, মথুরা মাহাত্ম্য, উদ্ধবসন্দেশ, দান কেলিকৌমুদী শ্রীকৃষ্ণজন্মতিথিবিধি, নাটক চন্দ্রিকা প্রভৃতি গ্রন্থ।

সমস্ত বৈষ্ণব ভক্তের প্রাণ যেন নূতন করে ভাষা লাভ করলো। সুপ্ত বৃন্দাবন জাগরিত হয়ে উঠলো। নব উষার আভা ফুটে উঠলো বৃন্দাবনের আকাশে। শ্রীকৃষ্ণলীলাভূমি শ্রীধাম বৃন্দাবন নূতন প্রাণে

সঞ্জীবিত হয়ে বৈষ্ণব ভক্তদের নিকট আবার মহান তীর্থভূমিতে হলো রূপান্তরিত। দিকে দিকে মঠ মন্দির প্রতিষ্ঠিত হতে লাগলো। আর কৃষ্ণ নামে মুখরিত হয়ে উঠলো শ্রীকৃষ্ণলীলাভূমি। সনাতন গোস্বামীর যমুনাতটের প্রতিষ্ঠিত মদনমোহন বিগ্রহকে এক মুলতানবাসী বণিক নাম কৃষ্ণদাস বিশাল শ্রীমন্দির নির্মাণ করে সংস্থাপন করলেন।

সনাতন মন জানি মদনগোপাল।
নিজ সেবা বৃদ্ধি ইচ্ছা হইল তৎকাল॥
হেনকালে মূলতান দেশীয় একজন।
অতিশয় ধনাঢ্য সর্বাংশে বিচক্ষণ॥
দুর্জয় ক্ষত্রিয় শ্রেষ্ঠ নাম কৃষ্ণদাস।
নৌকা হইতে নামি আইলা গোস্বামীর পাশ॥
গোস্বামীর চরণে পড়িল লোটাইয়া।
কৈল কত দৈন্য নেত্র জলে সিক্ত হইয়া॥
সনাতন তারে বহু অনুগ্রহ কৈল।
শ্রীমদনমোহন চরণে সমর্পিল॥

(ভক্তি ২।৪৬৪-৭১)

ভক্তপ্রবর কৃষ্ণদাস শ্রীবিগ্রহকে সুশোভিত করে রাজভোগের ব্যবস্থা করেছিলেন। এবং সনাতন গোস্বামীর কৃপা লাভ করে বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করে শ্রীবৃন্দাবনেই বাকী জীবন অতিবাহিত করেন। দিকে দিকে প্রচারিত হলো শ্রীরূপ ও সনাতন গোস্বামীর ত্যাগ তিতিক্ষা সহিষ্ণুতা ও পাণ্ডিত্যের খ্যাতি।

বিচলিত হলেন এক গর্বিত পণ্ডিত। নিজেকে ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বলেই মনে করতেন তিনি। মনে মনে ভাবলেন এতদিন কি তাহলে মিথ্যা অহংকারেই মুগ্ধ হয়েছিলাম? আর দেরি করেননি সেই দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত শ্রীরূপচন্দ্র সরস্বতী। ছুটে এসেছিলেন বৃন্দাবন-ধামে। শ্রীরূপ ও সনাতন গোস্বামীর নিকট শাস্ত্রবিচারে পরাভূত করবার মানসে। কিন্তু মহাবৈষ্ণব ভ্রাতৃদ্বয় বিনা বিচারেই জয়পত্র

লিখে দিলেন। 'পরাজিত হইলাম' বলে স্বাক্ষরও করে দিলেন। জয়গৌরবের আনন্দে বিভোর পণ্ডিতপ্রবর।

যমুনার ঘাটে এসে আলোচনায় ব্রতী হলেন রূপ সনাতনের ভ্রাতুষ্পুত্র ও বল্লভের পুত্র শ্রীজীব গোস্বামীর সঙ্গে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত। গর্বিত পণ্ডিতের অহংকারকে সহ্য করতে পারলেন না শ্রীজীব। শাস্ত্র-বিচারে ও তর্কে আহ্বান করলেন পণ্ডিতপ্রবরকে। শ্রীরূপ গোস্বামীর বিশিষ্ট ছাত্র ও শিষ্য শ্রীজীব গোস্বামীর সঙ্গে শাস্ত্র-বিচারে পরাভূত হলেন এবং তুচ্ছ প্রমাণিত হলেন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত যমুনার ঘাটের তর্কসভায়।

এবারে পণ্ডিতপ্রবর স্বীকার করলেন এবং হৃদয়ঙ্গম করলেন শ্রীরূপ ও শ্রীল সনাতনের পাণ্ডিত্যের গভীরতা। আর পরাভবের গ্লানি নিয়ে আবার ফিরে গেলেন শ্রীরূপ ও সনাতনের নিকট। আত্মসমর্পণ করে জানালেন মানসিকজগতে অগৌরবের দুঃসহ পীড়নের কথা।

ব্যথিত হলেন ভ্রাতৃদ্বয়। ক্রুদ্ধ হয়ে শ্রীরূপ ভর্ৎসনা করলেন শ্রীজীবকে,—'তুমি জয়-পরাজয় মান-অপমান ত্যাগ করে বৈরাগী হয়েছো, জয়াভিলাষী পণ্ডিতের নিকট পরাভব স্বীকার করে তাঁকে দীনতার সঙ্গে মান দান করলে না কেন? তুমি এখনও বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করবার উপযুক্ত পাত্র হও নাই।'

শ্রীরূপ গোস্বামী তখনকার মত ত্যাগ করেছিলেন শিষ্য ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীজীবকে।

দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত অভিভূত হলেন। শ্রীরূপ ও সনাতনের মহত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করে। প্রভু বলে তাঁদের চরণে লুটিয়ে পড়েছিলেন সেই দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত। এবং প্রভুদ্বয়ের কৃপালাভ করে পরমাশ্রয় লাভ করেছিলেন।

আবার একদিন শ্রীল গোস্বামী সনাতনের মন ব্যাকুল হলো শ্রীগৌরসুন্দরের দর্শন আকাঙ্ক্ষায়। আকুল প্রাণে ছুটে চললেন শ্রীক্ষেত্রের পথে। দুস্তর দুর্গম পথে আবার যাত্রা হলো শুরু পদব্রজে।

দীন বেশ। মুখে গৌরহরি নাম। গ্রাম শহর বনভূমি জনপদ ছাড়িয়ে সম্মুখের পথে অগ্রসর হয়ে চলেছেন। অকস্মাৎ আক্রান্ত হলেন কুষ্ঠরোগে। তারপর একদিন এসে উপস্থিত হলেন শ্রীক্ষেত্রের পুণ্যময় ভূমিতে। আশ্রয় নিলেন হরিদাস ঠাকুরের কুটিরে। কিন্তু রোগের জন্য সঙ্কোচ ও লজ্জা নিয়ে মহাপ্রভুর সম্মুখে উপস্থিত হলেন না। অন্তর্যামী প্রেমের ঠাকুর ভক্তের মনোব্যথা হৃদয়ঙ্গম করে নিজে স্বয়ং এসে স্নেহালিঙ্গন দিলেন। অনির্বচনীয় সে দৃশ্য নয়নগোচর করে মুগ্ধ ও অভিভূত হলেন অমেয় সৌভাগ্যবান ভক্তবৃন্দ। কিন্তু প্রতিদিন এই রোগপূর্ণ দেহ নিয়ে মহাপ্রভুর সঙ্গে আলিঙ্গনাবদ্ধ হতে বিব্রত বোধ করতে লাগলেন সনাতন গোস্বামী। এবং আত্মহত্যা করে এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবেন স্থির করলেন। অন্তর্যামী প্রভু ভক্তপ্রাণের বেদনা অনুভব করে, আশ্বাস দিয়ে বললেন—

'আত্মহত্যা কেন করবে? আত্মহত্যা করলে যে কৃষ্ণপ্রাপ্তি ঘটবে না। কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায় হলো ভক্তি ও ভজন। তুমি বৃন্দাবনে গিয়ে সাধনভজন করো আর ভক্তিতত্ত্বের সুধারস বিতরণ করো জন-মানুষের মধ্যে। তাহলেই পরমানন্দ লাভ করবে।' সনাতন গোস্বামী মহাপ্রভুর আদেশ মাথায় নিয়ে হৃষ্টচিত্তে ফিরে এসেছিলেন বৃন্দাবনধামে। আর নবপ্রাণে উদ্দীপিত হয়ে গ্রন্থ রচনা করে শ্রীকৃষ্ণলীলারস মাধুর্য বিতরণ করেছিলেন। ভক্তদের ভাবনার পিপাসা মিটিয়ে দিয়ে মনের মাটি সিক্ত করে তুলেছিলেন। ভক্তি-ধর্মের বীজ রোপণ করেছিলেন জনমানস চিত্তে। বৃন্দাবনের লুপ্ত স্থান মাহাত্ম্যকে করেছিলেন প্রকাশিত। শ্রীরূপ আর শ্রীল সনাতনের কঠোর তপস্যা-বলে সুপ্ত বৃন্দাবন প্রাণময় হয়ে আবার জাগরিত হয়ে উঠেছিল।

শ্রীরূপ ও সনাতন গোস্বামী এইভাবে আজীবন ভক্তিসাধনায় বিভোর হয়ে শ্রীধাম বৃন্দাবনেই দেহলীলা সংবরণ করেছিলেন।

তাইতো মনে হয় আজও যেন বৃন্দাবনের বাতাসে আত্মগোপন করে রয়েছে শ্রীরূপ ও সনাতন গোস্বামীর ভক্তিসুধাপ্লাবিত কণ্ঠধ্বনি।

রাধারমণ চরণদাস বাবাজী

সংসারের সকল টান পিছনে ফেলে রেখে করতোয়ার তটের নিরালায় ভবানীপুরের শক্তিপীঠে এসে আশ্রয় নিলেন উদ্‌ভ্রান্ত এক তরুণ সাধক। উত্তর বঙ্গের জাগ্রত শক্তিপীঠ এই ভবানীপুর। বিগ্রহ দেবী ভবানীর। তপস্যাভাস্বর রাজা রামকৃষ্ণও একদিন সাধনা করেছিলেন এই মহাপীঠে। নবাগত তরুণ সাধক পঞ্চমুণ্ডির আসনে বসে দেবী ভবানীর আরাধনায় হলেন নিমগ্ন। গভীর নিষ্ঠা আর একাগ্রতা দেখে দেবী সন্তুষ্ট হলেন। দর্শন দিলেন ভক্তকে। স্নেহার্দ্র কণ্ঠে বললেন,—'বাছা, তুমি অযোধ্যার সরযূ তীরে যাও। সেখানে তোমার জন্য অপেক্ষা করছে স্বামী শঙ্করারণ্য পুরী। সেই তোমার সাধনপথের গুরু। সে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছে আর কাউকে শিষ্য করবে না। কিন্তু আমার আদেশে সে-প্রতিজ্ঞা সে ভঙ্গ করবে। তুমি তার নির্দেশিত পথে ভক্তিবাদের সাধনায় হবে নিমগ্ন। পরম সিদ্ধি নিশ্চয়ই লাভ হবে।'

আর কোন সংশয় রইলো না মনে উদ্‌ভ্রান্ত সাধকের। জগজ্জননীর কৃপা প্রাপ্ত হয়ে ব্যাকুল চিত্তে ছুটে এলেন অযোধ্যার পুণ্যময় সরযূ তীরে। অলৌকিক ব্যাপার। অকস্মাৎ এক মহাপুরুষ হাতছানি দিয়ে ডাকছেন। সুদীর্ঘ দেহ, আজানুলম্বিত বাহু, মায়াগভীর দৃষ্টি। অভিভূত হয়ে দেখলেন নবাগত তরুণ। পরমুহূর্তেই কিসের এক আকর্ষণে ছুটে গিয়ে তাঁর চরণে মাথা লুটিয়ে প্রণাম করলেন।

মহাপুরুষ আশীর্বাদ করে সস্নেহে বললেন,—এসো বাবা, তোমার জন্যই তো আমি অপেক্ষা করছি। তোমার কোন ভয় নেই। তোমার সমস্ত পরিচয়ই আমি জানি। মায়ের কৃপাদৃষ্টি তোমার উপর রয়েছে। তোমাকে দিয়ে জগতের অনেক শুভ কাজ সম্পন্ন হবে।

তারপর ইঙ্গিতে আগন্তুক তরুণকে অনুসরণ করতে আদেশ করলেন। ধীরে ধীরে উভয়ে সরযু নদীর অদূরে বনময় নিভৃতে এসে উপস্থিত হলেন। প্রাকৃতিক পরিবেশটি মনোরম। যেন প্রাচীনের সেই তপোবন। আর এই অরণ্যেরই নিভৃতে মহাপুরুষের সাধন কুটীর। একজন তরুণ সেবক শিষ্য অপেক্ষা করছিলেন। তিনি ব্যস্ত হয়ে ছুটে এলেন এবং আগন্তুক নবীন সাধকের সেবায় হলেন নিযুক্ত। অবশেষে মহাপুরুষ আদেশ করলেন নবাগত তরুণকে, সরযু নদী হতে স্নান করে আসতে। দীক্ষার সবকিছুই প্রস্তুত। দীক্ষা দান করবেন।

স্নান সমাপন করে পর্ণকুটিরে ফিরে আসেন তরুণ। পর্ণকুটিরের দ্বার বন্ধ করেন মহাপুরুষ। আর তাঁর সম্মুখে উপবিষ্ট হয়ে দুই চোখ বন্ধ করে তরুণ সাধক তার মনের সকল ভাবনাকে এক দিব্য বিভূতি লাভের আশায় ব্যাকুল করে তুলবার চেষ্টা করেন। মন্ত্রচৈতন্য দিলেন বৈষ্ণব সন্ন্যাসী শঙ্করারণ্য পুরী নবীন সাধককে। নবাগত সাধক ইতিপূর্বে কুলগুরুর নিকট হতে শাক্ত মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছিলেন। কিন্তু জগজ্জননীর ইচ্ছায় এবারে বৈষ্ণব মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে ভিন্ন এক সাধন পথে হলেন অগ্রসর।

শক্তিধর বৈষ্ণব সাধক শঙ্করারণ্য পুরী। পূর্বাশ্রমে তিনি খড়দহের এক বৈষ্ণব আচার্যরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন। নাম ছিল গোস্বামী যোগেন্দ্রনাথ। সন্ন্যাসাশ্রমে হয়েছেন স্বামী শঙ্করারণ্য পুরী। এই শক্তিধর মহাপুরুষের মন্ত্র দীক্ষায় নবীন শিষ্যের দেহ মনে আত্মায় মন্ত্রের ক্রিয়াও হলো শুরু। দেখা দিল অশ্রু কম্প স্বেদ ও

পুলকোদ্‌গম। অষ্টসাত্ত্বিক প্রেমবিকার অবস্থা। প্রভু শ্রীনিত্যানন্দের প্রেমভক্তি তাঁর মধ্যে হলো প্রতিফলিত। যেন প্রেমভক্তির এক মূর্ত বিগ্রহ। অভাবনীয় অনির্বচনীয় অবস্থা। অতি দ্রুত নবীন শিষ্যের মধ্যে এই ভাবান্তর লক্ষ্য করে মুগ্ধ বিস্মিত ও অভিভূত হলেন গুরু শঙ্করারণ্য পুরী। ভাবাবেগে স্নেহালিঙ্গন দিলেন নবীন শিষ্যকে। নয়নে নয়নে অঝোরে ঝরতে লাগলো প্রেমাশ্রু ঝরনা ধারার মত।

বিষয় বাসনার কোলাহল হতে অতি দূরে এই বনময় নিভৃতে এসে তরুণ বৈষ্ণব সাধক গুরুদেবের উপদিষ্ট বৈষ্ণব সাধন প্রণালী আয়ত্ত করা শুরু করলেন। কখনো ধ্যানে কখনো জপে নিমগ্ন হয়ে থাকেন। কঠোর উপবাস ব্রত এবং ভূতলশয্যা গ্রহণ করে এই সকল সুখতৃষ্ণাকে পরাভূত করবার জন্য তাঁর আগ্রহ ও প্রয়াসের ছিল না কোন ত্রুটি। ধীরে ধীরে মায়াময় জীবনের কামনা বেদনা আর তৃষ্ণাকে তিনি দূরীভূত করতে সক্ষম হলেন।

এই তরুণ সাধকই হলেন বিখ্যাত বৈষ্ণব সাধক চরণদাস বাবাজী।

বাংলা ১২৬০ সালের ২৯শে চৈত্র আবির্ভূত হন বাংলার মাটিতে। যশোহর জেলার নড়াইল মহকুমার অন্তর্গত মহিষখোলা গ্রামে। পূর্বাশ্রমের নাম ছিল রাইচরণ ঘোষ।

মহিষখোলা গ্রামের কায়স্থেরা বেশ বর্ধিষ্ণু। পিতা মোহনচন্দ্র ঘোষ ও মাতা কনকসুন্দরী, উভয়েই ছিলেন ধর্মনিষ্ঠ। আরও দুইটি পুত্রের অকাল মৃত্যুতে রাইচরণই রইলেন পিতা মাতার একমাত্র স্নেহের দুলাল হয়ে। কিন্তু শৈশবেই পিতৃস্নেহ হতে হলেন বঞ্চিত পাঁচবৎসর বয়ঃক্রম কালেই পিতৃদেব ইহলীলা সংবরণ করলেন পিতৃব্য ও মাতার স্নেহে বড় হয়ে উঠতে লাগলেন। স্নেহশীলা জননী হৃদয়ের ধন রাইচরণ দীনদুঃখীর প্রতি সমবেদনা আর মানুষকে ভালবাসার শক্তি লাভ করেছিলেন তাঁর মাতৃপ্রকৃতি হতে।

বর্ষার দিনে সহাধ্যায়ীর ছাতা নেই নিজের ছাতাটিই দান করে ফেললেন। দুঃস্থলোক পথে শীতে কষ্ট পাচ্ছে রাইচরণ ঘর থেকে দামী শালখানিই তার গায়ে জড়িয়ে দিলেন।

উদার হৃদয়া জননী এসব কার্যে পুত্রকে উৎসাহ দিতেন। রাইচরণের বাল্য ও কৈশোর প্রাচুর্যের মধ্য দিয়েই অতিবাহিত হতে লাগলো। শিক্ষা জীবন সমাপ্ত করে গার্হস্থ্য জীবনে করলেন প্রবেশ। বিবাহ সংস্কার সম্পন্ন হলো। নববধূরূপে গৃহ আলোকিত করলেন স্বর্ণময়ী দেবী। জমিদার সরকারে চাকরি গ্রহণ করলেন। নায়েব এবং সুপারভাইজার রূপে যথেষ্ট সুনামও অর্জন করলেন। অর্থ ও প্রাচুর্যের অভাব ছিল না। সর্বসুখের নিকেতনে বাস করতেন রাইচরণ ঘোষ। পুষ্করিণী খনন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন প্রভৃতি নানারকম সামাজিক কার্যের মধ্য দিয়ে অল্প সময়ের মধ্যেই আত্মপ্রতিষ্ঠাও লাভ করলেন। কিন্তু সংসারজীবনের ভিত্তি যেন দিনে দিনে শিথিল হয়ে আসতে লাগলো।

সংসার পাতলেন বটে, কিন্তু জমলো না। উপর্যুপরি দুইটি সন্তানের মৃত্যুর পর পুত্রসন্তান কামনায় আরও দুইটি বিবাহ করলেন। কিন্তু বাসনা কামনার জীবন সফল হলো না। ধীরে ধীরে অতি সংগোপনে বৈরাগ্যের ফল্গুধারা অন্তরে অন্তরে প্রবাহিত হয়ে চললো। তান্ত্রিক বংশের সন্তান রাইচরণ। কুলগুরু শক্তিমান তন্ত্রসাধক। তান্ত্রিক দীক্ষাও গ্রহণ করলেন। কিন্তু শান্তিলাভ হলো না। দিনে দিনে মনের শান্তি যেন অপসারিত হতে লাগলো।

কুলগুরু ভবিষ্যদ্বাণী করলেন,—বাবা, সংসার ভোগ তোমার জন্য নয়। তোমার তো সংসার ত্যাগের যোগ দেখছি।

তারপর সত্য সত্যই অকস্মাৎ একদিন প্রখর মধ্যাহ্নে সম্মুখের আহার্য ফেলে রেখে, ব্যাকুল হয়ে ছুটে গিয়েছিলেন উত্তর বঙ্গের পথে। ভবানীপুর শক্তিপীঠ অভিমুখে।

জমিদারের হুকুম, বিরোধী প্রজাদের ক্ষেতের ধান অধীনস্থ

লাঠিয়ালদের সাহায্যে কেটে আনতে হবে। জমিদারের সে অন্যায় হুকুম তামিল করার পরই, রাইচরণের মানসিক জগতে সৃষ্টি হলো তুমুল আলোড়নের। মনের শান্তি হারালেন। জোর করে আনা শস্যস্তূপের দিকে তাকিয়ে মহাপাপী বলে মনে করতে লাগলেন নিজেকে। চাকরি করতে এসে মনুষ্যত্বকেও যেন বিসর্জন দিয়ে ফেলেছেন। বেদনায় চক্ষুদ্বয় হয়ে উঠলো অশ্রুসিক্ত। আর দেরি করেন নি রাইচরণ ঘোষ। সেই মুহূর্তেই মুখের গ্রাস ফেলে রেখে করলেন গৃহত্যাগ। ব্যাকুল হলেন পরমাশ্রয় লাভের জন্য। একদিন উদ্‌ভ্রান্তের মত সমাজ সংসার ফেলে রেখে চলে গিয়েছিলেন সত্য। কিন্তু উত্তরকালে আবার সেই সমাজজীবনে ফিরে এলেন, ভিন্ন এক রূপে, আনন্দের অমৃত রসধারায় সিক্ত হয়ে। মানবপ্রেমিক এক মহাপুরুষরূপে। আর শত শত আর্ত মুমুক্ষু মানুষকে তাপিত জীব-জগৎকে সেই অমৃতের আনন্দধারায় করে দিলেন সিক্ত। রাইচরণ ঘোষ হলেন বৈষ্ণব চরণদাস বাবাজী।

অবশেষে সেই সরযূতীরের আশ্রমের সাধনার দিনগুলিরও আবার হলো অবসান। গুরু শঙ্করারণ্য আদেশ করলেন, বৎস, তুমি যে অমৃতের আস্বাদন লাভ করলে সেই নামামৃত জগতের তাপিত মানুষকে দান করো। নগরে নগরে নামকীর্তন করে বেড়াও। তাহলেই তোমার সাধনায় সিদ্ধিলাভ হবে।

তারপর এক শুভদিনে গুরুকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে নবীন শিষ্য বৈষ্ণব চরণদাস অশ্রুভারাক্রান্ত হৃদয়ে 'জয় নিত্যানন্দ রাম, জয় গৌর গুণধাম', বলে অযোধ্যার পুণ্যময় ভূমি ত্যাগ করে গৌরসুন্দরের লীলাভূমি নবদ্বীপধাম অভিমুখে করলেন যাত্রা।

নবদ্বীপধামে এসে আশ্রয় নিলেন জগদানন্দদাস বাবাজীর আশ্রমে। দিবারাত্র মেতে রইলেন হরিনাম গুণগানে আর বৈষ্ণব শাস্ত্র পাঠে। পুণ্যতোয়া গঙ্গা সলিলে অবগাহন স্নান করেন তিনবার। দিবাশেষে গঙ্গায় স্নান করে ইষ্টদেবের জন্য ভোগ রান্না করেন আর

ঐ গঙ্গাতীরেই ভোগ দিয়ে প্রসাদ গ্রহণ করেন। আবার শুরু হয় কৃষ্ণ নাম গান। তখন গৌরভাবে বিভোর হয়ে অপরূপ এক ভাব-বিহ্বল মূর্তিতে হয়ে ওঠেন প্রতিভাত। সেই অনির্বচনীয় ভাব-বিহ্বল দিব্যমূর্তি নয়নগোচর করে মুগ্ধ হলেন এক গৃহস্থ মানুষ। নবদ্বীপে স্ত্রীকে নিয়ে তীর্থ করতে এসেছেন, উঠেছেন নৃসিংহ আখড়ায়। গঙ্গাতীরে ভ্রমণরত নবাগত তরুণ কিসের এক আকর্ষণে আকুল হয়ে চরণদাস বাবাজীর চরণে লুটিয়ে পড়লেন।

চরণদাস বাবাজী দুইহাতে জড়িয়ে স্নেহালিঙ্গন দিলেন। অবশেষে নবাগত তরুণ অভিভূত হয়ে স্ত্রীকে বললেন,—'ওগো, তুমি আর আমায় সংসারের মায়ায় আবদ্ধ করো না। এখন থেকে এই বৈষ্ণব সাধকই আমার পরমাশ্রয়।' ইনিই হলেন ভক্ত নবদ্বীপ দাস।

চরণদাস বাবাজীর প্রথম দীক্ষাপ্রাপ্ত শিষ্য। আর নামকীর্তন প্রচারযজ্ঞের প্রথম সহকারী। চরণদাস বাবাজীর সাহচর্য লাভ করে দীনতম বৈষ্ণবরূপে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। ধীরে ধীরে আরও কয়েকজন অনুরাগী ভক্ত এসে বাবাজীর চরণ আশ্রয় করলেন। এবারে শুরু হলো নামকীর্তন যজ্ঞ। চরণদাস বাবাজী ক্ষুদ্র একটি কীর্তন দল গড়ে তুললেন। আর কীর্তনের মধ্য দিয়ে গৌরাঙ্গলীলা প্রচার করতে লাগলেন। শ্রীগৌরসুন্দরের লীলাভূমি আবার যেন নূতন উদ্দীপনায় প্রাণময় হয়ে উঠলো। সুপ্তপ্রায় প্রাণহীন বৈষ্ণব-ধর্মকে সঞ্জীবিত করে তুললেন। আর বৈষ্ণবভক্ত অনুরাগীদের মধ্যে নাম সংকীর্তনের মধ্য দিয়ে এনে দিলেন প্রাণ চাঞ্চল্য। ভক্তশ্রেষ্ঠ চরণদাস বাবাজীর মুখনিঃসৃত স্বতঃস্ফূর্ত ভাবমধুর কীর্তন পদ শুনে আর একবার উজ্জ্বল হয়ে উঠলো গৌড়জনের মনের আকাশ। বৈষ্ণব দর্শনের তত্ত্বকঠিন ভাবনাকে সরস করে নাম গানের মধ্য দিয়েই করতে লাগলেন ব্যাখ্যা।

চরণদাস বাবাজীর ভাষ্যে গৌড়ীয় ভক্তের প্রাণ আবার নূতন করে ভাষা লাভ করলো সেই সময়।

বাবাজী এসেছেন ভক্তবৃন্দসহ কালনায়। শ্রীগৌর নিত্যানন্দের বিগ্রহের সম্মুখে কীর্তনানন্দে হলেন বিভোর। অপরূপ পদকীর্তন আর নৃত্য হলো শুরু। অনির্বচনীয় এক আনন্দের তরঙ্গ প্রবাহিত হয়ে চললো উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের মনের মধ্য দিয়ে। দিব্যভাবে বিভোর সকলেই। অকস্মাৎ এক অভাবনীয় ব্যাপার ঘটলো। এক পাঁচ বৎসরের শিশু গৌরভাবে মত্ত হয়ে দুই হাত তুলে নৃত্য করতে শুরু করে দিলো। মুগ্ধ ও বিস্মিত হলো সকলে এতটুকু শিশুর ভাবোন্মদনা অবস্থা দর্শন করে। কখনও চেতনা হারিয়ে ফেলে আবার কখনও অর্ধবাহ্য অবস্থা। আর তার মুখনিঃসৃত আধো আধো ভাষার গৌর নাম কি অপূর্ব। কি মধুর। আর কিসের যেন ইঙ্গিত করছে কেউই বুঝতে পারছেন না। কিন্তু বিমোহিত সকলে। চরণদাস বাবাজী মনকে স্থির করে রাখলেন মহাপ্রভু ঐ শিশুরূপে আবির্ভূত হয়েছেন। নামকীর্তন সভায় মহাপ্রভু যে নিরন্তর উপস্থিত থাকেন। আর লীলাময় প্রেমের ঠাকুর—নীলাচলের পথে যাওয়ার জন্যই ইঙ্গিত করছেন।

কীর্তন ভঙ্গ হলো না। অবিরাম চললো নামগান। কৃষ্ণগুণ গান। গৌর কীর্তন। সমস্ত কালনার মানুষ মেতে উঠলো। জেগে উঠলো। ভক্তকণ্ঠের হরিনাম গানে, মৃদঙ্গের ধ্বনিতে।

পরম বৈষ্ণব চরণদাস বাবাজী প্রাণহীন সমগ্র গৌরমণ্ডলকে কীর্তনানন্দে জাগিয়ে মাতিয়ে গৌর নামের মহিমা প্রচার করে যাত্রা করলেন নীলাচলের পথে। কয়েকজন অনুরাগী ভক্তসহ। ক্ষুদ্র বৈষ্ণব দল পথে পথে গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে গৌর নামের মহিমা প্রচার করে অগ্রসর হতে লাগলেন। চরণদাস বাবাজীর সুদীর্ঘ সুঠাম দেহ, আজানুলম্বিত বাহু দিব্যশোভায় সমুজ্জল দেহের দিকে তাকিয়ে আর কণ্ঠনিঃসৃত সুস্বর মুখর গৌর নাম কীর্তন শুনে তৃপ্ত হলো কৃষ্ণনাম পিপাসু জনপদের মানুষেরা। শুনতো গান তারপরেই চোখ মুছে ফিরে যেতো ঘরে।

দুস্তর দুর্গম পথ অতিক্রম করে পদব্রজে এসে উপস্থিত হলেন সাক্ষীগোপালে। সাক্ষীগোপালের মন্দিরেই নিলেন আশ্রয় বাবাজী মহারাজ ভক্তবৃন্দসহ।

গভীর রাত্রিতে চরণদাস বাবাজী স্বপ্ন দেখলেন,—দিব্য প্রভায় সমুজ্জ্বল এক মহাপুরুষ এসে বলছেন,—বাবা, এই নাও মন্ত্র। এটি তুমি জপ করবে এবং প্রকৃত অধিকারী ভক্তদের হৃদয়ে এ নামের বীজ বপন করে যাবে। দ্বাবিংশ অক্ষরযুক্ত গৌরমন্ত্র। পরমুহূর্তেই মহাপুরুষ অন্তর্হিত হলেন।

আর ঘুম হলো না বাবাজীর। ঘুম ভেঙে গেলো। দিব্য আনন্দে অন্তর যেন ভরে উঠলো। শিষ্য ভক্তদের জাগিয়ে তুললেন। বললেন স্বপ্নবৃত্তান্ত। এ যে স্বয়ং প্রভু নিত্যানন্দেব কৃপা ছাড়া কিছুই নয়, হৃদয়ঙ্গম করলেন সকলে। অকস্মাৎ নিত্যানন্দের আবেশ হলো বাবাজী মহারাজের দেহে। মনে। আত্মায়। সে ভাবাবেশের দিব্য মূর্তি নয়নগোচর করে ভক্তবৃন্দ অনির্বচনীয় এক আনন্দসাগরে হলেন নিমগ্ন।

ধীরে ধীরে সেই ক্ষুদ্র বৈষ্ণবদল এসে উপস্থিত হলেন শ্রীক্ষেত্রে। মহাপ্রভুর লীলাময় পুণ্যভূমি নীলাচলে। জগন্নাথ দেবের মন্দিরে প্রবেশ করেই মহাভাবে বিভোর হলেন বাবাজী মহারাজ। আর স্বতঃস্ফূর্তভাবে পদাবলীর ধারা উৎসারিত হতে লাগলো অন্তর হতে। ভক্তিভাবপূর্ণ সুকণ্ঠস্বরের সঙ্গীতে মিষ্টি হয়ে উঠলো শ্রীক্ষেত্রের পিপাসিত মনের মাটি। মন্দিরের লোকারণ্যের শোরগোলও থেমে গেলো আর উৎকর্ণ হয়ে শুনতে লাগলো সে মধুর সঙ্গীত। আর ঐ বৈষ্ণবের কণ্ঠ হতে উৎসারিত সেই পদামৃত লহরী যেন জনতার হৃদয় প্লাবিত করে নিয়ে চললো কোন্ এক পরম পরিতৃপ্তির জগতের দিকে।

ভক্ত কণ্ঠে কণ্ঠে প্রচারিত হলো চরণদাস বাবাজীর নাম। দলে দলে বৈষ্ণব ভক্তরাও এসে উপস্থিত হলেন মন্দিরপ্রাঙ্গণে। মুগ্ধচিত্তে শ্রবণ করলেন অপূর্ব মধুর সে কীর্তন। মনে মনে ভাবতে লাগলেন

কে এই বৈষ্ণব মহাপুরুষ? জগন্নাথের শিঙ্গারী পাণ্ডা ভাবাবেগে ছুটে এসে প্রসাদী মালা-চন্দনে বিভূষিত করলেন বাবাজী মহারাজকে। অপূর্ব শ্রীরূপ ধারণ করলেন বাবাজী মহারাজ। অপ্রাকৃত সে দিব্যরূপ দর্শন করে মুগ্ধ হলো সভাজনতার মানুষেরা।

অবশেষে মন্দিরের লীলা সাঙ্গ করে বের হলেন মহাপ্রভুর লীলাস্থল পরিক্রমা করতে।

আবার শ্রীক্ষেত্রকে জাগিয়ে তুললেন, মাতিয়ে তুললেন কৃষ্ণনাম গুণগানে আর গৌর নামের মাহাত্ম্য প্রচারে। জগন্নাথবল্লভ মঠের মোহান্ত ভূতনাথ স্বামী চরণদাস বাবাজীর দিব্যপ্রভায় সমুজ্জ্বল দেহের দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হলেন এবং আহ্বান করলেন তাঁর মঠে থাকবার জন্য। সে আহ্বান সাদরে গ্রহণ করলেন চরণদাস বাবাজী। ক্ষুদ্র বৈষ্ণব দল এসে আশ্রয় নিলেন জগন্নাথ মঠে। আর মেতে রইলেন কীর্তনানন্দে।

অল্প সময়ের মধ্যেই শ্রীক্ষেত্রের শত শত আর্ত মুমূর্ষু মানুষ এসে আশ্রয় নিলো চরণদাস বাবাজীর শ্রীচরণে। দূরের আর বহুদূরের জনপদ থেকে ছুটে আসতে লাগলো কৃষ্ণনাম পিপাসী মানুষ। রামানন্দী মঠের মোহান্ত তরুণ সন্ন্যাসী শীতলদাসও বাবাজী মহারাজের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে বৈষ্ণব সন্ন্যাসীতে হলেন রূপান্তরিত।

শ্রীচৈতন্যের লীলাস্থল শ্রীক্ষেত্রের পুণ্যময় ভূমিতে বহু লুপ্তপ্রায় লীলা উৎসবকে আবার সঞ্জীবিত প্রাণময় করে তুললেন পরম বৈষ্ণব চরণদাস বাবাজী।

চৈতন্যদেবের গুণ্ডিচা-মার্জনের সেবাধিকারটি মহাপ্রভু স্বয়ং পুরীরাজের নিকট হতে চেয়ে নিয়েছিলেন। ধীরে ধীরে সে অনুষ্ঠানটি লুপ্ত হয়ে যায়। বাবাজী মহারাজ আবার সে উৎসবটিকে পুনরুদ্ধার করলেন। শ্রীচৈতন্যের পদচিহ্ন জগন্নাথ মন্দির চত্বরে ধুলিধুসরিত অবস্থায় পড়ে আছে। ঐতিহাসিক স্মারক-শিলা। ভারতের বৈষ্ণব ভক্তদের শ্রদ্ধার বস্তু। ঐ পদচিহ্নের পবিত্রতা রক্ষার জন্য পুরীর

রাজাকে অনুরোধ করে জগন্নাথ মন্দিরের উত্তর দ্বারে একটি মন্দিরের মধ্যে মহাসমারোহের সঙ্গে স্থাপিত করলেন বৈষ্ণব চরণদাস বাবাজী।

পুরীধামের রথযাত্রা উৎসবকে আবার প্রাণময় করে তুললেন ভাবমধুর কীর্তনানন্দের সমারোহে। নবাগত এই বৈষ্ণব মহাপুরুষ মহাধাম নীলাচলে মহাপ্রভুর লীলাস্থলে আবার প্রেমভক্তির এক নূতন জোয়ার এনে দিলেন। ধীরে ধীরে সমস্ত গোষ্ঠীর সাধু সন্ন্যাসীরাই চরণদাস বাবাজীর গুণমুগ্ধ হয়ে উঠলেন। তাইতো সিদ্ধপুরুষ শ্রীবাসুদেব রামানুজদাসও বলতেন বাবাজী মহারাজ সম্বন্ধে,—এমন প্রেমভাবপূর্ণ মনুষ্য আমি জীবনে দেখি নাই। ইনি সাধারণ মনুষ্য নন, মহাত্মা।

আবার একদিন শ্রীক্ষেত্রের সেই আনন্দের হাটকে ভেঙে দিয়ে চলে এলেন নবদ্বীপধামে। আবার নবদ্বীপধাম চরণদাস বাবাজীর আগমনে নূতন করে মেতে উঠলো নামগানে, কীর্তনের সমারোহে। এবারে বৃদ্ধ বৈষ্ণব সন্ন্যাসী গৌরহরি দাস বাবাজীর নিকট হতে নিলেন ভেক দীক্ষা। সাক্ষীগোপালের মন্দিরে স্বপ্নে যে মন্ত্র পেয়েছিলেন সেই নামমন্ত্রই দীক্ষামন্ত্র রূপে গ্রহণ করলেন। ভেকের নাম হলো রাধারমণ চরণদাস। রাধারমণ চরণদাস বাবাজী।

সেদিন কীর্তনানন্দে বিভোর হয়ে মন্দির হতে ফিরছেন অকস্মাৎ লক্ষ্য করলেন এক কুক্কুরী সঙ্গে সঙ্গে চলেছে। যেন ভক্তিভরে শুনছে নামগান। বাবাজী কুক্কুরীর নাম দিলেন ভক্তি-মা। কিছুদিন পরে হঠাৎ বাবাজীর সেই প্রিয় ভক্তি-মা দেহত্যাগ করলো। বাবাজী হলেন বিষাদমগ্ন। তারপর কি খেয়াল হলো ভক্তি-মা'র ধামপ্রাপ্তি উপলক্ষে এক মহোৎসবের করলেন আয়োজন। সমস্ত নবদ্বীপধামের বৈষ্ণবমণ্ডলীকে করলেন নিমন্ত্রণ আর আহ্বান করলেন সমস্ত কুক্কুরমণ্ডলীকে।

মহোৎসবের দিন হলো এক সমস্যার সৃষ্টি। আখড়ার বৈষ্ণব

সাধুরা আপত্তি তুললেন কুকুরদের যদি সত্য সত্যই ভোজন করানো হয় তাহলে পঙ্‌ক্তি-ভোজনে তাঁরা উপস্থিত হবেন না।

মহোৎসবের আয়োজন নষ্ট হওয়ার উপক্রম। ছুটে এলেন নবদ্বীপের প্রবীণ বৈষ্ণব রাধেশ্যাম বাবাজী। তিনি খুবই স্নেহ করেন চরণদাস বাবাজীকে। বললেন,—কোথায় তোমার নিমন্ত্রিত কুকুরের দল? শুধু শুধু এসব কথা তুলে নিজেকে কেন হাস্যাস্পদ করছো বাবাজী? মানুষের ভাষা কি কুকুরে বোঝে?

প্রত্যুত্তরে প্রেমাবেশে বললেন চরণদাস,—বাবা, আপনারা তো বলেন প্রভু সর্বঘটে বিরাজমান! আমি তারই পরীক্ষা করছি। তবে কি প্রভু কুকুরের মধ্যে নেই? প্রভু নিত্যানন্দ কি আমাকে কৃপা করবেন না।

ভাবাবেগে আকুল চরণদাস বাবাজীর অনির্বচনীয় সে মূর্তি দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন প্রবীণ বৈষ্ণব। আর চরণদাসের ব্যাকুল মনের সে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন নি তিনি। নীরবে মস্তক অবনত করে ছিলেন শুধু। বাষ্পায়িত হয়ে উঠেছিল তাঁর চক্ষুদ্বয়।

অলৌকিক ব্যাপার ঘটলো। বেলা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে নবদ্বীপের শত শত কুকুরের দল এসে হাজির হলো। আর নীরবে পঙ্‌ক্তি-ভোজনে বসে মহোৎসবের প্রসাদ করলো গ্রহণ। কুকুরদের আগমন ও শান্তভাব দর্শন করে সেদিন বিস্মিত ও হতবাক হয়েছিলেন বৈষ্ণব-মণ্ডলী আর নবদ্বীপ-ধামের মানুষেরা। আখড়ার বৈষ্ণব সাধুরাও কুকুরদের ভোজনের পর পঙ্‌ক্তি-ভোজনে বসে মহানন্দে গ্রহণ করে-ছিলেন মহাপ্রসাদ।

গঙ্গার তরঙ্গধ্বনির মত ভক্ত কণ্ঠে কণ্ঠে ধ্বনিত হলো রাধারমণ চরণদাস বাবাজীর নাম। সমগ্র বঙ্গদেশে ছড়িয়ে পড়লো বাবাজীর এই অলৌকিক বিভূতির কথা। বাংলাদেশের মানুষ জানলো চিনলো পরম বৈষ্ণব চরণদাস বাবাজীকে।

এই মহোৎসবের আনন্দ কোলাহলে আর নিজেকে সংযত রাখতে

পারলেন না প্রবীণ বৈষ্ণব রাধেশ্যাম বাবাজী। দুইহাতে জড়িয়ে স্নেহালিঙ্গন দিলেন চরণদাস বাবাজীকে। ভাবাবেগে নয়নে নয়নে অঝোরে ঝরতে লাগলো অশ্রুধারা ঝরণাধারার মত।

এবারে হরিনামের অমৃতধারা নদীয়ার গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে প্রবাহিত করে দিলেন চরণদাস বাবাজী। এইসময় বাবাজীর কীর্তন বাসরে নানা অলৌকিক বিভূতির প্রকাশও ঘটতে লাগলো। ভক্ত দেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর আহ্বানে কৃষ্ণনগরে এসেছেন। পথে পুলিশ ইন্সপেক্টর হীরালাল সিংহের অনুরোধে উঠলেন শ্রীকণ্ঠবাবুর বাগান-বাড়িতে শহর থেকে দূরে খড়ে নদীর ধারে। কীর্তনানন্দে বিভোর সকলে। শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা এসে হরিনামগানের সুধারস পান করছেন। এসেছেন অধ্যাপক অধরবাবু, শিক্ষক ব্রজলালবাবু, সাব-রেজিস্টার যোগেশচন্দ্র সান্যাল আরও অনেকে। তারপর শুরু হলো নগর কীর্তন। শহরের পথে পথে কীর্তনের সমারোহ। আবার বল হরিনাম আবার বল হরিনাম ॥'

শহরের একপ্রান্তে ভুবনমোহন মিত্রের বাড়ি। গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ ভুবনমোহনবাবু। বাবাজী মহারাজের কীর্তনের দলকে দেখে হঠাৎ তাঁর মনো হলো ইনি যদি আমার তুলসীমঞ্চের সামনে এসে কীর্তন করেন তাহলে বুঝবো ইনি অন্তর্যামী এবং একজন শক্তিধর মহাপুরুষ। অলৌকিক ব্যাপার। পরমুহূর্তেই দেখলেন কীর্তনের দলসহ চরণদাস বাবাজী তাঁর গৃহে প্রবেশ করছেন এবং তুলসীমঞ্চের সামনে এসে কীর্তনানন্দে হলেন বিভোর। অভিভূত হয়ে ভুবনমোহন মিত্র মহাশয় বাবাজী মহারাজের চরণে মাথা লুটিয়ে প্রণাম করলেন। ভাবাবেগে বাষ্পায়িত হয়ে উঠলো তাঁর চক্ষুদ্বয়।

আর একদিন কীর্তনানন্দে বিভোর হয়ে কীর্তন করছেন চরণদাস বাবাজী। কি সে ভাব! কি সে প্রেমোন্মাদনা! আসরে বসে ছিলেন একজন তান্ত্রিক ব্রাহ্মণ। অকস্মাৎ তাঁর মনোজগতে হলো সৃষ্টি তুমুল আলোড়নের। ভাবের আবেশে চরণদাস বাবাজীর পায়ে লুটিয়ে

পড়লেন। তারপর শান্ত হলে সকলে জিজ্ঞেস করলেন এ ভাবাবেগের কারণ কি ? তিনি প্রত্যুত্তরে বাষ্পায়িত লোচনে বললেন, আমি গৌর নিত্যানন্দের যুগলমূর্তি নয়নগোচর করেছিলাম এই চরণদাস বাবাজীর দেহে। আমি বৈষ্ণব বিদ্বেষী ছিলাম, আমাকে তোমরা ক্ষমা করো। আমি বাবাজীর কৃপাপ্রার্থী এখন।

চরণদাস বাবাজীও উপদেশচ্ছলে বললেন, বাবা, নাম ও নামী যে অভেদ। নামরূপে তিনি সদা সাক্ষাৎভাবে বর্তমান। নামকীর্তন ক্ষেত্রে আপনি দিব্যদর্শন করেছেন। মহামায়া আপনাকে কৃপা করেছেন বাবা।

নবদ্বীপের নিকটবর্তী মুসলমান মহল্লায়ও তিনি হরিনাম বিলিয়ে মুসলমান পল্লীর মোড়ল হারাধন মণ্ডলকে কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত করেন। তারপর কীর্তনানন্দে বিভোর হয়ে দিগ্‌নগরের সেই বিখ্যাত প্রাচীন বটবৃক্ষটির দিকে এগিয়ে যান। অভাবনীয় ব্যাপার নামকীর্তনের স্পন্দনে বটবৃক্ষের শাখা-প্রশাখাগুলিও যেন চৈতন্যময় হয়ে উঠলো। তালে তালে আন্দোলিত হয়ে নৃত্যপরায়ণ হয়ে উঠলো। সে অচিন্তনীয় অনির্বচনীয় দৃশ্য নয়নগোচর করে মুগ্ধ বিস্মিত হলেন অমেয় সৌভাগ্যবান ভক্তবৃন্দ।

পরম ভক্ত নবদ্বীপদাস অসুস্থ। মরণোন্মুখ অবস্থা। তখন ইংরাজী ১৯০৩ সাল। সাধক চরণদাস কিন্তু নির্বিকার। অন্যান্য ভক্তরা এসে ধরলেন। প্রত্যুত্তরে বাবাজী বললেন, 'নিতাই চাঁদের যা ইচ্ছে তাই ঘটবে। তবে নাম কর। নাম হচ্ছে ভুবনমঙ্গল।' কীর্তনানন্দে বিভোর হলেন ভক্তবৃন্দ। নামশক্তির অলৌকিক প্রভাবে অসুস্থ নবদ্বীপদাস ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠলেন। অভাবনীয় ব্যাপারে মুগ্ধ ও বিস্মিত হলো ভক্তবৃন্দ।

নবদ্বীপধামের আখড়ায় ভক্তবৃন্দ পরিবেষ্টিত হয়ে বসে আছেন চরণদাস বাবাজী। হঠাৎ এক কিশোর এসে মাথা লুটিয়ে ভক্তিভরে প্রণাম করলো বড় বাবাজীকে। ভক্তপ্রবর নবদ্বীপদাস পরিচয় করিয়ে

দিলেন, বালকের নাম রামদাস। মহাপুরুষ প্রভু জগদ্বন্ধুর অনুগ্রহ-ভাজন এই কিশোর। অপূর্ব কীর্তন করে। তারপর প্রেমোম্মাদে মত্ত হয়ে উজ্জ্বল শ্যামবরণ কিশোর রামদাস শুনালো হরিনামগান পরম বৈষ্ণব চরণদাস বাবাজীকে। মুগ্ধচিত্তে আশীর্বাদ করলেন বড় বাবাজী সেই ভক্তপ্রাণ কিশোরকে,—বাবা, নিতাইচাঁদের চরণে প্রার্থনা জানাই, তিনি তোমায় প্রেমধনে ধনী করুন।

চরণ আশ্রয় করে উত্তরকালে চরণদাস বাবাজীর এই কিশোর বৈষ্ণব রামদাস বাবাজীরূপে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। আর ভক্ত-দের মনের মাটি সিক্ত করে তুলেছিলেন 'চরিত-সুধা' গ্রন্থে বাবাজীর অলৌকিক জীবনলীলা বর্ণনা করে।

চরণদাস বাবাজীর পরমভক্ত জয়গোপাল সেবাব্রতকেই জীবনব্রত করে নিয়েছেন। সখী বেশে থাকেন। নাম হয়েছে ললিতাদাসী। নবদ্বীপধামেই একদিন ভাবাবিষ্ট হয়ে বললেন বাবাজী চরণদাস, '—শুধু বেশ ধরলেই হবে না। নিষ্কাম গোপীদের স্বভাবটিকে গ্রহণ করতে হবে হৃদয় মন দিয়ে। তবেই তো সেবাভাবের সাধনায় হবে সিদ্ধ।'

অবশেষে বাবাজীর কৃপায় সখীভাবের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন। এবং নবদ্বীপের সমাজবাড়ির ললিতাসখী রূপে করেন প্রতিষ্ঠালাভ। বড় বাবাজীর ভক্ত সংখ্যাও এখনও অগণ্য। এবং ভক্তদের একান্ত ইচ্ছা এই মহাপুরুষকে কেন্দ্র করে একটি স্থায়ী আশ্রম গড়ে তোলেন। বাবাজী মহারাজ কিন্তু কিছুতেই মত দেন না। ভক্তবৃন্দও হাল ছাড়লেন না। অবশেষে ভক্তপ্রবর কিশোরীমোহন সেনের চেষ্টায় বাবাজী মহারাজ রাজী হলেন। শ্রীক্ষেত্রের ঝাঁঝপিটার অবহেলিত শ্রীবিগ্রহকে সেবা পূজা ও জাগ্রত করবার দায়িত্ব নিতে। পুরাতন মঠ। নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের আদেশে শিষ্য সেবাদাস বাবাজী এই বিগ্রহ ও মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। বিগ্রহ শ্রীরাধাকান্ত।

মঠের বর্তমান সেবাধিকারীর মৃত্যুর পর মঠ সরকারের রক্ষণাধীনে

আছে। শ্রীবিগ্রহের দুরবস্থার কথা শুনে ভাবাবেগে বাবাজী চরণদাসের চক্ষুদ্বয় বাষ্পায়িত হয়ে উঠলো। এবং এক শুভদিনে কীর্তনের সমারোহে বৈষ্ণব সাধক চরণদাস বাবাজী ভক্তবৃন্দসহ প্রবেশ করলেন পুরীধামের ঝাঁঝপিটার নূতন আশ্রমে। তারপর সেবা পূজা ও কীর্তনের মধ্য দিয়ে বিগ্রহকে জাগ্রত করে তুললেন। বাবাজী মহারাজের ভক্তমণ্ডলীর বড় সাধের—ঝাঁঝপিটা আশ্রম ও শ্রীরাধাকান্ত বিগ্রহ প্রাণবন্ত হয়ে উঠলো। রসরাজ রাধাকান্তজীর লীলারঙ্গও হয়ে উঠলো প্রকট। ধীরে ধীরে লীলাময় ঠাকুরের লীলাখেলাও হলো শুরু ভক্তসেন।

ক্রমে ক্রমে সমগ্র উড়িষ্যাপ্রদেশে সাধারণ মানুষের মধ্যে পরম বৈষ্ণব চরণদাস বাবাজীর সাধনার যশঃসৌরভ বিকীর্ণ হয়ে পড়লো। শাক্ত ও বৈষ্ণব উভয় সম্প্রদায়ই ছিলেন তাঁর গুণমুগ্ধ।

বাবাজী মহারাজ অবশ্য সাধনপথের ভেদ মানতেন না। তিনি বলতেন ভক্তির পথ সম্প্রদায়ের ভেদ মেনে চলে না। তাইতো জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে সকলকেই কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত করতেন। আর আর্ত মুমুক্ষ মানুষকে কোনরূপ বিচার না করে প্রেমসাধনার বাণী শোনাতেন। আরও বলতেন, প্রকৃত ভেদবৈষম্য উপাস্যগত নয়, আমাদের নিজেরই রুচিগত আচারগত। বৈষ্ণবের সাধনা বড় কঠিন শুধু হর-পার্বতী শিব-দুর্গা কেন, কীটপতঙ্গ তৃণলতাকে পর্যন্ত ভক্তির চোখে দেখতে হবে নইলে প্রকৃত কৃষ্ণভজনের হানি হবে।

ভক্ত শিষ্য রামদাসকে বলেছিলেন,—'নাম সত্যই অসাধ্য সাধন করতে পারে। নামের সঙ্গে সঙ্গে যে নামীও বর্তমান। একমাত্র নামে বিশ্বাস হলে সব কিছুই সম্ভব। আর এই নামের কৃপা না হলে প্রকৃত প্রেমলাভ হবে না। অতীন্দ্রিয় ভাবময় রাজ্যেও প্রবেশ করা সম্ভব হবে না। আবার বিভূতিলীলা কিছুটা না দেখালে জীব ধর্মপথে বিশ্বাস রাখতে পারে না। তাইতো মাঝে মাঝে তোদের চোখের সামনে প্রকট হয়ে ওঠে প্রভু নিত্যানন্দের শক্তিলীলা।'

শ্রীবিগ্রহকেও বাবাজী মহারাজ নিত্য ও পরমবস্তু বলে মনে করতেন। তাঁর দৃষ্টিতে শ্রীমূর্তি চিন্ময় নিত্য ও স্বপ্রকাশ। তাইতো শ্রীবিগ্রহের মর্যাদাহানি তিনি সহ্য করতে পারতেন না। তাইতো দেখা যায় নিষ্ঠাপূর্ণ সেবা পূজার মধ্য দিয়েই ঝাঁঝপিটা শ্রীবিগ্রহকে তিনি প্রাণবন্ত করে তুলেছিলেন। আর বহু অলৌকিক ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল এই রাধাপ্রাণবল্লভ শ্রীরাধাকান্ত শ্রীবিগ্রহকে কেন্দ্র করে।

আর এই ঝাঁঝপিটা মঠেই বললেন ভক্ত মানুষ বিমলাপ্রসাদ দত্ত ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী মহাশয়কে, সন্ন্যাসীর পরিধেয় বস্ত্র সম্বন্ধে এক প্রশ্নের উত্তরে।

ভাবকে স্থায়ী করতে হলে স্বভাবে পরিণত করা প্রয়োজন। স্বভাবে পরিণত করতে হলে দেহে তদ্‌জাতীয় বেশভূষাদি ধারণ এবং আলাপে ব্যবহারে লীলাগুণ কীর্তনাদিতে নিত্য পরিকরগণের আনুগত্যে সেই ভাবকেই প্রকাশ করা আবশ্যক।

তারপর আবার একদিন অকস্মাৎ চলে এলেন গৌরমণ্ডলে। মেতে রইলেন লীলাকীর্তনে। গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে শুরু হলো কীর্তনের সমারোহ। কলকাতা শহরকেও কীর্তনানন্দে মাতিয়ে তুললেন। ভক্তবৃন্দসহ উঠলেন অনুরক্ত ভক্ত যোগেন মিশ্র মহাশয়ের আলয়ে। দর্জিপাড়ায়। তারপর বিরাট কীর্তনের দল আর বিপুল জনতাসহ কলকাতা নগরীর পথে পথে হরিনামগানের অমৃতসুধা বৃষ্টি করে চললেন। অবশেষে লীলা করলেন গঙ্গার ঘাটে নেমে আকণ্ঠ গঙ্গার জলে ডুবিয়ে হরিনামের মাহাত্ম্য বর্ণনার মধ্য দিয়ে। সে অনির্বচনীয় দৃশ্য নয়নগোচর করে আর সে ভাবময় বর্ণনা শ্রবণ করে মুগ্ধ হলেন সেদিনের অমেয় সৌভাগ্যবান ভক্তবৃন্দ। আর একদিন নিমতলা শ্মশানে এক মৃতা রমণীর দেহে কয়েকঘণ্টার জন্য প্রাণ সঞ্চার করে অলৌকিক বিভূতির প্রকাশ করলেন। বাবাজীর জীবনে বিভূতির প্রকাশ যেমন নূতন নয়, নামের প্রচারও তেমনি উল্লেখযোগ্য

কোনও ব্যাপার নয়। দেহাত্মবোধহীন অবস্থায় খ্যাতির বিভূতি অন্যান্য অজস্র স্বপ্রকাশ বিভূতির মতই বাবাজীর কাছে ছিল অর্থহীন।

বাবাজী কোথাও স্থির হয়ে বসতে পারছেন না। দু'দিন না যেতেই আবার অস্থির হয়ে উঠলেন নিরুদ্দেশের পথে যাত্রার জন্য। অবশেষে উড়িষ্যাবাসী অনুরক্ত ভক্ত শ্রীভাগবত মিশ্রের একান্ত অনুরোধে লীলাময় বাবাজী যাত্রা করলেন দুমকার পথে। সিউড়ী থেকে দুমকা বিশ ক্রোশ পথ। ভক্তপ্রবর মিশ্র গরুর গাড়ির ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু বাবাজী ভক্তবৃন্দসহ পদব্রজেই যাত্রা করলেন। পথে মৌড়েশ্বর শিবের মন্দিরে আশ্রয় নিলেন। গ্রামবাসীরাও মেতে উঠলো গৌরলীলা কীর্তনে।

'হায়রে তখন কেন জনম হোল না, প্রকট লীলা দেখতে পেলাম না।'

পরম বৈষ্ণব চরণদাস বাবাজীকে নিয়ে দুমকার গ্রামবাসীরা কীর্তনের সমারোহে মেতে উঠলো। নতুন প্রাণে সঞ্জীবিত হয়ে উঠলো আর্ত পীড়িত মুমুক্ষু মানুষেরা। মহামহোৎসবের আনন্দে মেতেছে তারা। যেন প্রভু নিত্যানন্দ আবার আবির্ভূত হয়ে এসেছেন দুমকা শহরে কৃষ্ণনাম গৌরনাম বিলাতে। বাবাজীর আদেশে দুমকার সেই বিশাল ভক্তসভা জনতায় রামদাস বাবাজী কীর্তন শুরু করলেন।

যদি গৌরাঙ্গ না হত, কি মেনে হইত কেমনে ধরিতাম দে।
রাধার মহিমা প্রেমরস সীমা, জগতে জানাতো কে॥
বৃন্দা বিপিন মধুর মাধুরী, প্রবেশ চাতুরী সার।
বরজ যুবতী, ভাবের ভকতি, শকতি হইত কার॥
গাও গাও পুনঃ গৌরাঙ্গের গুণ সরল করিয়া মন।
এ ভব সংসার দয়াল ঠাকুর, না দেখিয়ে অন্যজন॥
(এমন) গৌরাঙ্গ বলিয়ে, না গেলাম গলিয়ে, কেমন ধরিলাম দে।
বাসু ঘোষের হিয়া পাষাণেতে দিয়া কেমনে গড়িল সে॥

ভক্তপ্রাণ রামদাস বাবাজীর সুধামাখা কণ্ঠের সেই অপূর্ব কীর্তন শুনে মুগ্ধ হলো সভাজনতার মানুষ আর পুলকাবলি বিভূষিত হয়ে উঠলেন মহাবৈষ্ণব চরণদাস বাবাজীর দেহ। মহাভাবে হলেন বিভোর। অপূর্ব অনির্বচনীয় সে দিব্যদেহের দিকে তাকিয়ে আনন্দাশ্রু নির্গত হতে লাগলো সভাজনতার মানুষদের নয়ন হতে।

আবার একদিন ছুম্‌কার আনন্দের হাটকে ভেঙে দিয়ে ময়ূরাক্ষী নদী পার হয়ে যাত্রা করলেন বৈদ্যনাথধামের পথে। বৈদ্যনাথধাম থেকে এসে উপস্থিত হলেন শিবলীলাভূমি বারাণসীধামে। বিশ্বনাথ দর্শন করে মণিকর্ণিকার ঘাটে ভক্তবৃন্দ পরিবৃত হয়ে নানা শাস্ত্রীয় আলোচনায় বিভোর বাবাজী। অকস্মাৎ কলকাতা থেকে কামাখ্যা দাস বাবাজী এসে উপস্থিত। বাবাজীর চরণতলে কিছু টাকা রেখে বললেন ভক্ত যোগেন মিত্র মহাশয় আপনার বৃন্দাবনধাম যাত্রার জন্য টাকা পাঠিয়েছেন। বাবাজীর বৃন্দাবন যাত্রার ইচ্ছা হয়েছিল সত্য কিন্তু সে বাসনা যে এত তাড়াতাড়ি সফল হবে তা কেউই ধারণা করতে পারেন নি। বাবাজী বললেন, সবই নিতাইচাঁদের ইচ্ছা।

তারপর আবার যাত্রা হলো শুরু শ্রীধাম বৃন্দাবনের পথে। 'আবার বল হরিনাম আবার বল হরিনাম'—বলে এসে উপস্থিত হলেন শ্রীকৃষ্ণ লীলাভূমিতে। গোবিন্দজীউ'র মন্দির পরিক্রমা করে গঙ্গাজীউ'র মন্দিরে এসে উঠলেন। কৃষ্ণনাম গৌরনামের কীর্তনে বৃন্দাবনভূমিকে আবার মাতিয়ে তুললেন চরণদাস বাবাজী।

ভক্তপ্রাণ বনমালী রায় নিয়ে গেলেন শ্রীরাধাকুণ্ডে। যে কুণ্ডতীরে একদিন শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী সর্বস্ব ত্যাগ করে বাস করেছিলেন। সেইখানেই আজ বাস করছেন বনমালী রায় স্ত্রী পুত্র ও বিষয় বৈভব নিয়ে। গৃহমন্দিরে বিগ্রহ বিনোদবিহারীর। বিগ্রহ সেবায় গৃহের সকলেরই গভীর নিষ্ঠা। বাবাজী বলেন, ওদের গোপীভাব। 'রাই জয় জয় রাধে. রাধে', বলে রাধাকুণ্ডে জলকেলি করলেন ভক্তসনে বাবাজী মহারাজ। তিলক আহ্নিক করছেন এমন সময়

বিনোদের মহাপ্রসাদ এলো। ভক্ত ও মহাত্মারা বাবাজী মহারাজের সঙ্গে তৃপ্তিসহকারে গ্রহণ করলেন সেই মহাপ্রসাদ।

আবার গোবিন্দকুণ্ডে এসে শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীর আসনের নিকট এক বটবৃক্ষতলে কৃষ্ণকীর্তনে হলেন বিভোর।

এইখানেই সিদ্ধ মহাত্মা মনোহর দাস বাবাজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। এবং চরণদাস বাবাজীর মুখনিঃসৃত বৈষ্ণবশাস্ত্রের অপূর্ব ব্যাখা শুনে মুগ্ধ ও প্রীত হন।

এইভাবে শ্রীধামের বিভিন্ন স্থান পরিক্রমা করে শ্রীরাধাকুণ্ডের বিনোদবিহারীর মন্দিরে এলেন ফিরে। অবশেষে ভক্তবৃন্দ ও বৈষ্ণব বাবাজী রামহরিদাস, হরিচরণদাস, মাধবদাস, শ্যামদাস, রামদাস প্রভৃতির দ্বারা পরিবৃত হয়ে রজে গড়াগড়ি দিলেন। আর রজ সমাধির জন্য ভিক্ষা করলেন শ্রীধামের পুণ্যময় রজ। বৈষ্ণব মহাত্মারা সকলেই এক মুষ্টি করে রজ ভিক্ষা দিলেন। বাবাজী ধীরে ধীরে ভাব-সমাধিতে হলেন নিমগ্ন। অনির্বচনীয় সে দৃশ্য।

রাত্রিতে রাধাকুণ্ডের এক বকুল বৃক্ষ তলে আশ্রয় নিলেন। চরণ সেবা করতে লাগলেন শ্যামদাস বাবাজী। ক্রমে ক্রমে রাত্রি গভীর হতে গভীরতর হয়ে এলো। অপূর্ব মোহনীয় সে রাত্রি। লীলাময় কৃষ্ণচন্দ্র যেন লীলায় ছাওয়া শ্রীধামের মাটি আকাশ-বাতাস আর রাত্রিকে আবার দিব্যলীলায় প্লাবিত করে দিয়েছেন। কি অপূর্ব! কি মধুর! সে রাত্রির অন্ধকার।

অকস্মাৎ শ্যামদাস বাবাজী পরম বৈষ্ণব চরণদাস বাবাজীর দিকে তাকিয়ে বিস্মিত ও অভিভূত হলেন। জ্যোতির্ময় দেহধারী এক দিব্য মহাপুরুষরূপে দর্শন করলেন বাবাজীকে। বাবাজীর সেই ঐশ্বর্যময় রূপ নয়নগোচর করে পরমানন্দ অনুভব করতে লাগলেন মনে মনে। তারপর মাথা লুটিয়ে প্রণাম করে বললেন, বাবাজী একি দেখলাম? আপনি কে বাবা? আপনিই কি স্বয়ং নিত্যানন্দ প্রভু? তবে তো আপনার কৃপা হলেই আমার কৃষ্ণপ্রাপ্তি ঘটতে পারে! ব্যাকুলচিত্তে

জিজ্ঞেস করলেন শ্যামদাস বাবাজী। মৃদু হেসে প্রত্যুত্তরে চরণদাস বাবাজী বললেন,—'দেখ, নিতাই গৌর রাধাকৃষ্ণকে পাওয়া তো সহজ। তারা তো তোদের সম্মুখেই রয়েছেন। তবে উপযুক্ত হৃদয় না হলে তাদের চিনবি কি করে বল? আর না চিনলে সে অমৃত আস্বাদনই বা করবি কি করে?'

তাইতো আচার্যরা যতকিছু সাধন-ভজনের উল্লেখ করেছেন একমাত্র দেহ মনকে প্রস্তুত করবার জন্য। যোগ্য অধিকারী হওয়া মাত্রই কৃষ্ণপ্রাপ্তি ঘটবে।

এইভাবে শ্রীরাধাকুণ্ডের পুণ্যময় ভূমিতে অলৌকিক লীলা প্রকাশ করলেন বাবাজী মহারাজ।

আবার নব প্রভাত! নব উষা! শ্রীরাধাকুণ্ডে ভক্ত ও বৈষ্ণব মহাত্মাদের সঙ্গে শুরু হলো লীলাখেলা। নামকীর্তন। শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ড পরিক্রমা করে আবার রাধাকুণ্ডে জলকেলি করতে লাগলেন ভক্তসনে। তারপর বিনোদবিহারীর মন্দির হতে মহাপ্রসাদ গ্রহণ করে কুসুম সরোবরের তীরে মহাত্মা ও ভক্তবৃন্দ পরিবৃত হয়ে বসলেন। নানা বৈষ্ণবশাস্ত্রীয় আলোচনায় মত্ত হলেন বাবাজী মহারাজ। শ্রীধাম বৃন্দাবন ও গৌর লীলা-ভূমি শ্রীক্ষেত্রের ঐশ্বর্য প্রসঙ্গে বললেন,—

"মহাপ্রভু জগন্নাথকে ব্রজেন্দ্রনন্দন এবং পুরীধামকে বৃন্দাবন দর্শন করিয়েছেন। মহাপ্রভুর অনুগতরা পুরীধামকে মধুর হতে মধুরতম মনে করবে। ঐশ্বর্য ও মাধুর্য সাধকের মানসিক ভাব হতে হয়ে থাকে। যেমন পূর্ণ, পূর্ণতম ব্রজেন্দ নন্দনে, মাধুর্যের ও পূর্ণতমতা ঐশ্বর্যেরও পূর্ণতমতা। সেইরূপ তাঁর নিত্য বসতিস্থল শ্রীবৃন্দাবনধামেও উভয়েরই পূর্ণতমতা বর্তমান।"

অপূর্ব ব্যাখ্যা শুনে মুগ্ধ হলেন মহাত্মারা আর ভক্তবৃন্দরা। শ্রীগৌরসুন্দরের লীলাভূমি শ্রীক্ষেত্রের প্রতি দুর্বার আকর্ষণ ছিল চরণদাস বাবাজীর। তিনি বলতেন, মহামূল্যবান জীবনের আঠারোটি বৎসর অতিক্রান্ত হয়েছে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর শ্রীক্ষেত্রে। শ্রীক্ষেত্রে যে

গৌরসুন্দর নিত্যবিরাজমান। নীলাচল শ্রীগৌরসুন্দরের নিত্য লীলা-স্থল। তাইতো একদিন বৃন্দাবনধামে বসেই শ্রীগৌরাঙ্গের হাতছানি দেখতে পেলেন। লীলাময় প্রেমের ঠাকুর যেন তাঁকে ডাকছেন। ব্যাকুল হলেন বাবাজী মহারাজ। অকস্মাৎ একদিন আকুল হয়ে নয়নজলে ভাসতে ভাসতে গেয়ে উঠলেন,—'গাও গাও পুনঃ গৌরাঙ্গের গুণ সরল করিয়া মন।' তারপর ছুটে চললেন নীলাচলের পথে। মাঠ ঘাট প্রান্তর, গ্রাম শহর মঠ মন্দির বৃন্দাবনধামকে পেছনে ফেলে সম্মুখের পথে অগ্রসর হলেন শ্রীগৌরসুন্দরের লীলাভূমি শ্রীক্ষেত্র দর্শন মানসে। ঝাঁঝপীঠা মঠ অভিমুখে।

এইভাবে জীবনের শেষ মুহূর্তটি পর্যন্ত শ্রীনিত্যানন্দ—গৌরাঙ্গ যুগলের নামকীর্তনে বিভোর হয়ে এক মহাদিনে নিত্য লীলায় প্রবেশ করলেন মহাপুরুষ। মহাসাধক মহাযোগী পরম বৈষ্ণব রাধারমণ চরণদাস বাবাজী।

তাঁর সৌম্য মধুর মূর্তি, তাঁর ধৈর্য তিতিক্ষা সরলতা চিরপ্রসন্ন লীলাবিলাস, তাঁর নির্মল কল্যাণবর্ষী দৃষ্টি, জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে সকলের প্রতি করুণা-কোমল সমভাব, দ্বন্দ্বরহিত নিত্যযুক্ত ভাবধারা ছিল অনুপম অতুলনীয়। তাঁর দেহ আশ্রয় করে যে সব লৌকিক বা অলৌকিক ঐশ্বর্যাদি প্রকাশ হয়, তা ভক্তজনের কল্যাণের জন্যই হয়েছিল স্ফুরিত। তাইতো মানবজীবনের দুঃখ ক্লেশ অবসানের জন্যই সুধামাখা হরিনাম প্রচারের ব্রতকেই করে নিয়েছিলেন জীবন-ব্রত। নামব্রতই ছিল তাঁর জীবনব্রত। আজও তাই শ্রীক্ষেত্রে ভক্ত মানুষ শুনতে পায় গভীর রজনীর নিস্তব্ধতায় মহাবৈষ্ণব চরণদাস বাবাজীর সুস্বর কণ্ঠের সেই নাম-যজ্ঞের ধ্বনি 'আবার বল হরিনাম আবার বল হরিনাম।'

ভক্ত রাজা রামকৃষ্ণ

মনে মনে বড়ই অসুখী ছিলেন নাটোরের নবীন রাজা। অপরিমেয় ধন-সম্পত্তি ও ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়েও দুঃসহ এক বেদনায় কখনো বা অশান্ত হয়ে উঠতো আবার কখনও উদাস হয়ে যেতো ওঁর মন। জীবন নদীর ঠিক্ কোন্ ঘাটে ডিঙা লাগালে পরমাশ্রয় পাওয়া যাবে এই প্রশ্নেই যেন অস্থির হয়ে উঠেছিল সেই ব্যাকুলের মন।

চিন্তাকুল রাজা বসে আছেন রাজসভায় সভাসদ পরিবেষ্টিত হয়ে। অকস্মাৎ এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ এসে রাজার হাতে দিলেন একটি প্রস্তর খণ্ড। বিচিত্র সে প্রস্তর খণ্ডটি দেখতে দেখতে রাজা জিজ্ঞেস করলেন আগন্তুক ব্রাহ্মণকে, কে দিয়েছে এমন উপহার? প্রত্যুত্তরে ব্রাহ্মণ বললেন,—বাগ্‌সরের শ্মশানের অপরিচিত এক সন্ন্যাসী। আপনার হাতে দিতে আদেশ করেছেন।

তারপর আগন্তুক ব্রাহ্মণের দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ের দারিদ্র্যতার কাহিনী ও শ্মশানভূমিতে আত্মহত্যা করতে এসে হঠাৎ সৌম্যদর্শন সন্ন্যাসীর দর্শন লাভ এবং প্রস্তর খণ্ডটি তাঁর হাতে দেওয়ার ইতিবৃত্ত শুনে আরও বিস্মিত হলেন। ব্রাহ্মণকে পুরস্কৃত করবার আদেশ দিয়ে, বিস্ময়াপ্লুত দৃষ্টিতে দেখলেন, প্রস্তর খণ্ডটিতে সঙ্কেত লিপিতে লেখা আছে একটি শ্লোক।

যদুপতেঃ ক্ব গতা মথুরাপুরী।
রঘুপতেঃ ক্ব গতোত্তর কোশলা।
ইতি বিচিন্ত্য কুরুস্ব মনঃ স্থিরং।
ন সদিদং জগদিত্য বধারয়।

যদুপতি কৃষ্ণের সে মথুরাপুরী কোথায় হয়েছে গত, আর রঘুপতির উত্তর কোশলই বা আজ কোথায়? একথা চিন্তা করে তোমার মনকে কর স্থির আর জগতের নশ্বরত্বকে কর উপলব্ধি।

শ্লোকটি পড়ে আরও স্তম্ভিত হলেন রাজা। এ যে ভ্রাতা সনাতনের কাছে প্রেরিত মুমুক্ষু শ্রীরূপ গোস্বামীর সঙ্কেত লিপি! গৃহত্যাগের ইঙ্গিত! এ ইঙ্গিত লিপি সন্ন্যাসীঠাকুর আমার কাছে পাঠালেন কেন? তবে কি আমার জীবনের পরমাশ্রয় লাভের শুভ মুহূর্তটি এসে গেছে? আমার কল্যাণকামী এই সন্ন্যাসীঠাকুরই বা কে? মনোজগতে প্রবল আলোড়নের হলো সৃষ্টি। ভাবাবেশে চক্ষুদ্বয় অশ্রুসজল হয়ে উঠলো। রাজসভা ত্যাগ করলেন। আর অনুচরদের আদেশ দিলেন সন্ন্যাসীঠাকুরের অনুসন্ধান করতে। বহু অনুসন্ধান করেও তখন সে সন্ন্যাসীর দর্শন মিললো না।

আকুল হলো রাজার প্রাণ। শাশ্বত শান্তিলাভের জন্য বৈরাগ্য-অনল দিনে দিনে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হলো। অকস্মাৎ একদিন গৃহত্যাগ করে নাটোরের সন্নিকটস্থ বাগ্‌সর শ্মশানের নিভৃতে এসে জগজ্জননীর সাধনায় হলেন প্রবৃত্ত। মাতৃভাবে বিভোর। অন্তর হতে নিঃসৃত স্বতঃস্ফুরিত সঙ্গীতাঞ্জলি দিতে লাগলেন মাতৃ চরণে।

এখনো কি ব্রহ্মময়ী,
হয়নি মা তোর মনের মত,
অকৃতি সন্তানের প্রতি
বঞ্চনা কর মা কত!

এই মাতৃসাধক নাটোরের রাজাই হলেন রাণীভবানীর দত্তক পুত্র। রাজা রামকৃষ্ণ। পতিপরায়ণা নবযৌবনা রূপবতী পত্নী নবজাত শিশুপুত্র অপরিমেয় অর্থ ও ভোগের নানা উপকরণ তাঁর

মনকে করতে পারেনি প্রলোভিত। দিব্য উন্মাদনায় বিভোর রাজা রামকৃষ্ণ।

বিচলিত হলেন রাণীভবানী। কাশীতে অবসর বিনোদন করছিলেন। কাশী থেকে ছুটে এলেন নাটোরে। পুত্রের মতিগতির কথা শুনে। দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মন নিয়ে। সাক্ষাৎ করলেন পুত্রের সঙ্গে। কিন্তু পুত্রের মনের উপর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হলেন না। আরও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হলেন জমিদারীর দুরবস্থা দেখে। রাজস্বের দায়ে জমিদারী মহালগুলি একে একে নীলামে উঠছে। ওয়ারেন হেস্টিংসের ষড়যন্ত্রে নাটোরের প্রধান সম্পত্তি বাহির বন্দ পরগনা হস্তচ্যুত হয়েছে। আটগ্রামের জ্ঞাতিরাও গোপনে নাটোর জমিদারী দখলের জন্য নানা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। কিন্তু কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই পুত্র রামকৃষ্ণের। ধন-সম্পত্তি বিষয়-বৈভব ভোগ-লিপ্সা কোন দিকে কোন আকর্ষণ বোধই দেখতে পেলেন না পুত্রের মধ্যে।

রাণীভবানী শুধুমাত্র মূর্তিময় সন্ন্যাসীরূপে দেখতে চাননি পুত্রকে। তিনি চেয়েছিলেন পুত্রের মধ্যে দুইভাবের সমন্বয় হোক। প্রজারঞ্জক রাজা আর শক্তিমান [illegible]ক। এই দুইভাবের সমন্বয়ে পুত্র গড়ে উঠুক সংসারের একজন শ্রেষ্ঠ মানুষ হয়ে। আর প্রসিদ্ধ নাটোরের রাজবংশের বংশমর্যাদাকে উন্নীত করুক রাজা হয়ে। সংসারে বৈরাগী হয়ে নয়। তাইতো মনান্তর হলো মাতা পুত্রের মধ্যে।

তখন অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পলাশীর যুদ্ধের মাধ্যমে তখন বাংলার ভাগ্য হয়নি নির্ধারিত। রাষ্ট্রীয় বিপর্যয়ের পূর্বাভাস জে[illegible]। উঠেছে বাংলার আকাশে বাতাসে। বিশ্বাসঘাতকের দল [illegible] চরণে। কারও মস্তিষ্ক স্থির নেই। চতুর্দিকে কেবল শঙ্কা [illegible] ধীরে ধীরে চিন্তিত হয়ে উঠেছিলেন রাণীভবানী। কোনও [illegible]ক রূপে রূপান্তরিত তাঁর। বিশাল ভূ-সম্পত্তি কে রক্ষণাবেক্ষণ করে[illegible]র ভাবান্তর লক্ষ্য করে। রাজবংশের সুনাম ও মর্যাদার চিরাচরিত ধারা[illegible] রাখবে? অবশেষে প্রতিভাময়ী রাণীভবানী [illegible]গীশকে আহ্বান করলেন

দয়ারাম রায়ের সঙ্গে পরামর্শ করে দত্তক পুত্র গ্রহণ করাই স্থির করলেন।

বাংলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সুলক্ষণযুক্ত সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ বালকেরা আমন্ত্রিত হয়েছে। দত্তক গ্রহণের দিনটিতে। যেন শিশুমেলা বসেছে দ্বিতলের কক্ষে। সমাগত বহু মানুষের কলরবে আর রোশন-চৌকির বাদ্যে আনন্দমুখর হয়ে উঠেছে নাটোরের রাজপ্রাসাদ। মহামহোৎসব হয়েছে শুরু।

প্রাসাদের এক কোণে একাকী গম্ভীর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে শুধু একটি শিশু। হঠাৎ লক্ষ্য পড়লো শিশুটির উপর দেওয়ান দয়ারাম রায়ের। জিজ্ঞেস করলেন গুরুগম্ভীর স্বরে শিশুটিকে,—তুমি এখনও এখানে দাঁড়িয়ে কেন খোকা? যাও, উপরে যাও, রাণীমার কাছে। সকলেই যে খেতে বসে গেছে।

ভীত না হয়ে ধীর স্থিরভাবে বালক প্রত্যুত্তরে বললো,

—কি করে যাই বল, কে জুতো পরিয়ে দেবে আমায়?

—কেন? তুমি নিজেই পরে নাও না?

—না, তুমি পরিয়ে দাও জুতো। আদেশের সুরে বলে উঠলো বালক।

এবারে মুগ্ধ হলেন পুরুষসিংহ দেওয়ান দয়ারাম। এই বয়সে বালকের শান্ত অথচ গম্ভীর ভাব আর কথা বলবার ভঙ্গিমা দেখে। জুতো পরিয়ে দিয়ে সস্নেহে কোলে তুলে নিলেন তেজস্বী বালককে। তারপর রাণীভবানীর কাছে নিয়ে এসে গুণের পরিচয় দিয়ে হেসে বললেন, দুর্ধর্ষ দেওয়ানকে দিয়ে যে বালক জুতো পরিয়ে নিতে রাজপাটে বসবার উপযুক্ত বলে মনে করি।

প্রিয়দর্শন বালককে দেখে মুগ্ধ হলেন। আর এই মাতৃসাধক মনোগত ইচ্ছাকেই সমর্থন করে নির্বাচন করলেন পুত্র। রাজা রামকৃষ্ণরূপে গ্রহণ করবার জন্য।

নবজাত শিশুপুত্র অপহৃত, সঙ্গেই দত্তক গ্রহণের অনুষ্ঠানও হলো

সম্পন্ন। রামকৃষ্ণ হলেন রাণীভবানীর দত্তক পুত্র। ধর্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ হরিদেব রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র এই রামকৃষ্ণ।

রাজসাহীর আটগ্রাম হলো নিবাসস্থান। নাটোর রাজবংশের সঙ্গে তাঁর জ্ঞাতিত্ব সম্পর্কও ছিল।

শুরু হলো বালক রামকৃষ্ণের শিক্ষাজীবন। নাটোরের রাজ-প্রাসাদে তখন জ্ঞানী গুণী সাধুসন্ন্যাসীদের খুবই আনাগোনা। আর রাণীভবানীও ছিলেন খুবই ভক্তিমতী রমণী। শ্রেষ্ঠ আচার্যদের নিকট থেকে বালক শাস্ত্রবিদ্যায় যেমন পারদর্শী হয়ে উঠলেন তেমনি মাতা রাণীভবানীর সাহচর্যে থেকে ধীরে ধীরে হয়ে উঠলেন ধর্মনিষ্ঠ। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বালকের মধ্যে উদাস অনাসক্ত ভাবই যেন প্রবল হয়ে উঠতে লাগলো। ধর্মনিষ্ঠ অথচ অসামান্য শক্তিসম্পন্ন পুরুষসিংহ রূপে গড়ে তোলার যে আকাঙ্ক্ষা নিয়ে বালকের প্রতি দৃষ্টি রেখে-ছিলেন রাণীভবানী, সে চেষ্টা, সে দৃষ্টি, সফল হয়ে ওঠেনি। কোন্ এক অজানা শক্তির প্রেরণায়, অতীন্দ্রিয় জগতের হাতছানি তরুণ রাম-কৃষ্ণকে উন্মত্ত করে তুলতে লাগলো। আনন্দের আধার আনন্দময়ী জগজ্জননী তার মনোজগতেও যেন প্রবাহিত করে দিলো আনন্দের স্রোতধারা। সে আনন্দের তরঙ্গে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে ছেড়ে দেওয়া ছাড়া যেন তার করবার আর কিছুই নেই। কি মুক্তি! কি আনন্দ!

নাটোরের জয়কালী বিগ্রহ খুবই জাগ্রতা! ভাবোন্মাদে উন্মত্ত হয়ে কালিকা বিগ্রহের সম্মুখে ধ্যানমগ্ন হয়ে থাকেন তরুণ রামকৃষ্ণ। কখনো আবার স্বরচিত সঙ্গীতের অঞ্জলি দেন মায়ের চরণে। নাটোরের ভবিষ্যৎ ভূম্যধিকারী তরুণ রামকৃষ্ণ যেন ধীরে ধীরে মাতৃউপাসক মাতৃসাধক ত্যাগ বৈরাগ্যের মূর্ত প্রতীক রূপে রূপান্তরিত হতে লাগলেন।

চঞ্চল হলো রাজমাতার অন্তর। পুত্রের ভাবান্তর লক্ষ্য করে। পরামর্শলাভের জন্য কুলগুরু রঘুনাথ তর্কবাগীশকে আহ্বান করলেন

রাজমাতা রাণীভবানী। সুপণ্ডিত বিচক্ষণ তর্কবাগীশ মহাশয় বুদ্ধি দিলেন, অবিলম্বে কুমারের বিবাহের ব্যবস্থা করতে। আর ধর্ম-জীবনের আকাঙ্ক্ষায় যে তীব্রতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে তার জন্য প্রয়োজন দীক্ষার। দীক্ষাগুরু হবেন মাতা রাণীভবানী স্বয়ং। উত্তরকালে দত্তক পুত্র অন্তত গুরুজ্ঞানেও মাতার প্রতি থাকবে শ্রদ্ধাশীল।

তরুণ সাধক রামকৃষ্ণের সংসার ও ধর্মজীবনের চতুর্দিকে এইভাবে সেদিন লৌহ প্রাচীর তুলবার পরিকল্পনা করা হলো। আর সেই পরিকল্পনাকে অতি দ্রুত বাস্তবে রূপায়িত করেও তোলা হলো।

সর্বসুলক্ষণা রূপবতী বধূ ঘরে নিয়ে এলেন রাণীভবানী পুত্রের সংসার আসক্তি বৃদ্ধির জন্য। আর গুরুদেবের নির্দেশমত পুত্রকে দীক্ষামন্ত্রও নিজেই দিলেন। তৃপ্ত হন আর শান্ত হন। পরিতৃপ্তির প্রসন্নতা ফুটে ওঠে রাণীভবানীর চোখে মুখে। নাটোরের জাগ্রতা বিগ্রহ জয়কালী কিন্তু হাসলেন। আর হাসেন ভবানীপুরের শক্তি বিগ্রহ জগজ্জননী ভবানী। চোখ মেলে তাকালেন তারাপীঠের তারা মা।

পুত্রকে সংসারী দেখে আশ্বস্ত হলেন রাণীভবানী। যুবক রাম-কৃষ্ণের উপর বিশাল জমিদারীর দায়িত্ব দিয়ে অবসর গ্রহণ করলেন। কখনও থাকেন মুর্শিদাবাদের নিকট গঙ্গাতীরে, কখনও বা বড়নগরের প্রাসাদে। আর বেশীর ভাগ সময় অতিবাহিত করেন পুণ্যময় কাশী-ধামে। ব্যাপৃত থাকেন পূজা ব্রত উদ্‌যাপন নিয়ে। শান্তিতেই দিন অতিবাহিত হচ্ছিল রাণীভবানীর।

কিন্তু যে অজানাশক্তি রামকৃষ্ণকে রাণীভবানীর হাতে এনে দিয়েছেন, সেই রহস্যময় শক্তিরই ইচ্ছায় তরুণ রামকৃষ্ণ ধীরে ধীরে মাতৃসাধকে রূপান্তরিত হলেন। তাইতো রূপবতী পত্নী ও একমাত্র পুত্রের মায়ায় অভিভূত সংসারের সকল টান পিছনে ফেলে রেখে শ্মশানের নিভৃতে এসে উপস্থিত হলেন। বাগ্‌সরের শ্মশান হলো

রাজা রামকৃষ্ণের সাধনভূমি। মনের সব দ্বন্দ্ব ও চাঞ্চল্য শান্ত হয়ে গিয়েছে। আর কোনও সংশয় নেই মনে। তাঁর মনডিঙা ঘাট খুঁজে পেয়েছে।

শুরু হলো রাজা রামকৃষ্ণের সাধকজীবন। একান্ন শক্তিপীঠের অন্যতম হলো ভবানীপুরের শক্তিপীঠ। নাটোরের সন্নিকটে। করতোয়ার তীরে। অধিষ্ঠাত্রী বিগ্রহের নাম অপর্ণাদেবী। কিন্তু জনপদের মানুষেরা বলে ভবানীদেবী। সাধক রামকৃষ্ণ রাজসরকার থেকে প্রচুর অর্থ বরাদ্দ করলেন দেবীর সেবাপূজার জন্য। মন্দিরের চারিদিকে চারটি পঞ্চমুণ্ডীর আসনও স্থাপন করলেন। মাতৃসাধনায় প্রবৃত্ত হলেন। কখনও বাগ্‌সরের শ্মশানে আবার কখনও ভবানী-পুরের শক্তিপীঠে চললো তন্ত্রসাধনা। বহু উচ্চকোটির তান্ত্রিক সাধকদের আনাগোনা ছিল ভবানীপুরের এই শক্তিপীঠে। তাঁদের নিকট হতে তন্ত্রসাধনার নির্দেশও গ্রহণ করতেন রাজা রামকৃষ্ণ। এক শক্তিমান কৌলাচার্যের নিকট হতে তন্ত্রসাধনার দীক্ষা গ্রহণ করে শব-সাধনায় রত হলেন সাধক রাজা রামকৃষ্ণ। ধীরে ধীরে সাধনার চরম শিখরে উন্নীত হলে-। জগজ্জননীর দর্শনলাভ করে অনির্বচনীয় আনন্দে হলেন বিভোর।

এবারে এসে উপস্থিত হলেন মহাপীঠ তারাপীঠে। তারাপুরের তারাপীঠে। ব্রহ্মার মানসপুত্র বশিষ্ঠদেবের সাধনভূমিতে। সুপ্ত সেই তারাপীঠকে সাধনবলে জাগ্রত করে তুললেন। বহু শক্তিধর কৌলাচার্যদের তখন আনাগোনা ছিল তারাপীঠে। তাঁদের সাহচর্যে এসে তন্ত্রসাধনার গূঢ়তত্ত্ব অবগত হলেন। অমারজনীর গভীর তমিস্রায় শ্মশানভূমির বুকে বশিষ্ঠের সিদ্ধাসনে বসে তারামায়ের সাধনায় নিমগ্ন হলেন সাধক রাজা রামকৃষ্ণ। পরমানন্দ অনুভব করতে লাগলেন মনে মনে।

ভক্তপ্রাণ রাজা রামকৃষ্ণ তারামায়ের মন্দিরের সংস্কারসাধন ও নিত্য পূজারও সুবন্দোবস্ত করলেন। একটি বৃহৎ তালুক উৎসর্গ

করলেন তারামায়ের পূজা ও মন্দিরের সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার ব্যয়ের জন্য।

রাজা রামকৃষ্ণের এখন দিব্যোন্মাদনা অবস্থা। বাংলার বিভিন্ন শক্তিপীঠে শ্মশানে মশানে ঘুরে বেড়ান। আর মাতৃভাবে হয়ে থাকেন বিভোর। আবার কখনও এসে উপস্থিত হন বড়নগরের কিরীটেশ্বরী মন্দিরে। নানা দেশে দেশে তীর্থে তীর্থে ঘুরে ঘুরে আবার একদিন এসে উপস্থিত হলেন ভবানীপুরের শক্তিপীঠে। পঞ্চমুণ্ডীর আসনে বসে মাতৃসাধনায় বিভোর হলেন।

অমাবস্যার এক শুভ তিথিতে দেবী ভবানীর ষোড়শোপচারে রাজসিক পূজার আয়োজন করলেন সাধক রামকৃষ্ণ। দেবীবিগ্রহকে সেদিন বহু মূল্যবান আভরণে সজ্জিত করা হলো। রাজ অন্তঃপুরের মেয়েরাও এসেছেন মূল্যবান অলঙ্কারে ও বসনে সজ্জিত হয়ে। আর উৎসব রজনী মেতে উঠেছে প্রেমানন্দে বিভোর মাতৃসাধক রামকৃষ্ণের অন্তর হতে উৎসারিত স্বতঃস্ফূর্ত মাতৃসঙ্গীতের রসধারায়। ভাবোন্মাদে বিভোর হয়ে রামকৃষ্ণ গাইছেন। অনির্বচনীয় এক পরিবেশের হলো সৃষ্টি।

ভবে সেই সে পরমানন্দ
যে জন পরমানন্দময়ীরে জানে।
সে যে না যায় তীর্থ পর্যটনে,
কালী কথা বিনা না শুনে কানে।
সন্ধ্যা-পূজা কিছু না মানে,
যা করেন কালী ভাবে সে মনে।
যে জন কালীর চরণ করেছে স্থূল,
সহজে হয়েছে বিষয়ে ভুল।
ভবার্ণবে পাবে সেই সে কূল,
বল সে মূল হারাবে কেমনে।

রামকৃষ্ণ কয় তেমনি জনে,
লোকের নিন্দা শুনিবে কেনে।
আঁখি ঢুলুঢুলু রজনী দিনে,
কালী নামামৃত পীযুষ পানে।

অকস্মাৎ এক অভাবনীয় ঘটনা ঘটলো। বাধা পেয়ে ভক্ত সাধক রামকৃষ্ণের কণ্ঠ স্তব্ধ হলো। হঠাৎ মৌন মিছিলের মত দস্যুদের আবির্ভাব। দস্যুসর্দার শঙ্করা হাতের অস্ত্র দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সাধক রামকৃষ্ণের পায়ে লুটিয়ে পড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করলো। অনুচরেরাও নীরবে আত্মসমর্পণ করলো অপরাধীর মত। সাধক রাজা রামকৃষ্ণ ও মন্দিরের উৎসবের মানুষেরা বিস্মিত ও অভিভূত হয়ে দেখতে থাকেন এই অভিনব দৃশ্য। একি কল্পনা না সত্য! দুর্ধর্ষ দস্যুসর্দার শঙ্করা বলে,—আজ উৎসবের দিনে মন্দিরের ঐশ্বর্য লুণ্ঠন করতে এসেছিলাম। কিন্তু হাতে অস্ত্র নিয়ে কিছুতেই মন্দির চত্বরে প্রবেশ করতে পারলাম না। রণচণ্ডী মূর্তি ধরে কালীমাতা আমাদের বাধা দিতে লাগলেন। কালীমায়ের মাহাত্ম্য বুঝতে পেরেই আমরা হাতের অস্ত্র ফেলে দিয়ে মায়ের পায়ে লুটিয়ে পড়লাম। পরমুহূর্তে আর মা'কে দেখতে পেলাম না। তাইতো আপনার কাছে এসেছি আপনি আমাদের ক্ষমা করে আশ্রয় দিন। আপনার আশ্রয়ই জীবনের সব চেয়ে বড় আশ্রয়। অসহায়ের মত করুণভাবে রামকৃষ্ণের মুখের দিকে তাকায় দস্যু শঙ্করা।

মায়ের কৃপার কথা চিন্তা করে নয়নজলে ভাসতে ভাসতে আলিঙ্গনাবদ্ধ হন শঙ্করার সঙ্গে সাধক রামকৃষ্ণ।

রামকৃষ্ণের প্রভাবে কুখ্যাত দস্যুর জীবনধারায় আসে আমূল পরিবর্তন। ধীরে ধীরে রূপান্তরিত হয় ভক্ত মানুষে। জনপদের মানুষেরা আর বলে না দস্যু শঙ্করা,—বলে ভক্ত শঙ্করা।

দিকে দিকে প্রচারিত হলো অভিনব এ কাহিনী। বাংলার মানুষ জানলো চিনলো রাজা রামকৃষ্ণকে সিদ্ধসাধক মহাপুরুষরূপে। শক্তিসাধকরূপে।

রাজা রামকৃষ্ণের দয়াদাক্ষিণ্যের যশঃসৌরভও তখন সমগ্র বাংলা ও উত্তর ভারতে বিকীর্ণ হয়ে পড়েছে। মহাপুরুষের যশঃগাথা শুনলেন দিল্লীর বাদশাহ্। বাদশাহ্ তাঁকে,—'মহারাজাধিরাজ পৃথ্বীপতি বাহাদুর' উপাধিতে করলেন ভূষিত। বাদশাহের ও ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রতিনিধিরা নাটোরে এসে এই সনদ দান করলেন। রাজা রামকৃষ্ণ কিন্তু নির্বিকার। নিস্পৃহ। মুক্তপুরুষ। তাঁর কাছে রাজচ্ছত্র আর কৌপীন একসমান হয়ে উঠেছে।

এবারে আত্মগোপনকারী সন্ন্যাসী গোপনে আত্মপ্রকাশ করলেন রাজার কাছে। নগর প্রান্তের এক নির্জন স্থানে মিলিত হলেন উভয়ে। সন্ন্যাসী অকস্মাৎ রাজা রামকৃষ্ণের মেরুদণ্ড স্পর্শ করলেন। তড়িৎ সঞ্চালিত তন্ত্রীর মত তাঁর দেহটি পুলকিত হলো। অশ্রু সজল হয়ে উঠলো চক্ষুদ্বয়। হৃদয়তন্ত্রী কার মধুর স্পর্শে যেন এক অতি সুমধুর তানে উঠলো বেজে। পরমুহূর্তেই পূর্বজন্মের স্মৃতি মানসপটে উঠলো ভেসে।

হিমালয়ের এক গিরিগুহায় গুরুর সম্মুখে উপবিষ্ট স্বয়ং তিনি আর তাঁর গুরুভ্রাতা। আজকের এই সন্ন্যাসী শ্রীজী। অধ্যাত্মজীবনের পথপ্রদর্শক।

সাধকজীবনের অন্তস্তলে সংসার বাসনার একটি অর্ধস্ফুট কলিকা লুকিয়ে ছিল তাঁদের উভয়ের মনের গহনে। সদ্‌গুরু দিব্যদৃষ্টিতে শিষ্যদ্বয়ের মনের গভীরের সে বাসনার জীবনকে জানতে পেরেছিলেন। তাইতো প্রারব্ধ খণ্ডনের জন্য তাঁদের আসা। গুরুভ্রাতা শ্রীজীও রাজপুতনার এক রাজবংশে জন্মগ্রহণ করে রাজপাট ছেড়ে চলে এসেছেন।

তারপর শুরু হলো উভয়ের মধ্যে সাধনার গূঢ় তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা। অবশেষে সুনন্দিত হৃদয়ের অর্ঘ্য দান করলেন উভয়ে উভয়কে।

মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন শ্রীজী গুরুভ্রাতার মুখের দিকে। না, বিষয় বাসনার আর কোন চিহ্ন নেই ঐ নিঃস্বের মুখের ভাষায় আর চোখের দৃষ্টিতে। সকল প্রজার সব প্রণাম আর শ্রদ্ধা লুণ্ঠন করে নিয়েছে এই সাধক রামকৃষ্ণ। ইহজীবনের লীলা তাঁর হয়েছে সার্থক। প্রারব্ধ ভোগও হয়েছে খণ্ডন। এইবার বিদায় নিলেন আনন্দিত চিত্তে শ্রীজী। ধীরে ধীরে সেই রহস্যময় সন্ন্যাসী রহস্যের অন্তরালে করলেন আত্মগোপন।

এবারে রাজা রামকৃষ্ণ সংসারের অবশিষ্ট দায়িত্বটুকু ও দুই নাবালক পুত্রের ভার সহধর্মিণীর উপর সম্পূর্ণরূপে ছেড়ে দিয়ে ভবানীপুরের পঞ্চমুণ্ডীর আসনে কঠোর সাধনায় হলেন নিমগ্ন।

ব্যাকুল হলো প্রাণ মাতৃদর্শনের জন্য। মা'কে দেখবেন। মা'র সঙ্গে কথা বলবেন। ঠিক যেমন জীবন্ত মায়ের সঙ্গে ছেলে কথা বলে।

অবশেষে এক শুভদিনে সত্য সত্যই জগজ্জননী দর্শন দিলেন কথাও বললেন। ভক্তকে স্নেহার্দ্র কণ্ঠে যেন বলছেন,—বাছা, তোমার শেষ অহমিকা বোধটুকুকেও লুপ্ত কর। মায়ের সঙ্গে যে মনান্তর আছে সেটুকু মিটিয়ে ফেল। তাহলেই আমি তোমার হৃদয়ে চির-অধিষ্ঠিত থাকবো।

আর দেরি করেননি রামকৃষ্ণ। পরমুহূর্তেই অলৌকিকভাবে এসে উপস্থিত হলেন বড়নগরে রাণীভবানীর চরণতলে। মাতার শ্রীচরণে মাথা লুটিয়ে প্রণাম করে ভিক্ষা করলেন। সেদিন মাতা-পুত্রের মিলনটুকুও হয়েছিল বড় প্রাণস্পর্শী। নয়নে নয়নে অঝোরে ঝরতে লাগলো অশ্রুবিন্দু, ঝরনা ধারার মত। মাতৃসাধক রামকৃষ্ণের দেহ মন আত্মা হয়ে উঠলো মাতৃময়।

রাণীভবানীও আর তাঁর সাধনপথে বাধার সৃষ্টি করলেন না। জগজ্জননী আদ্যামায়ের উপরই পুত্রের মঙ্গলামঙ্গলের ভার অর্পণ করে নিশ্চিন্ত হলেন।

—আবার একদিন বড়নগরের গঙ্গাতীরে ধ্যানমগ্ন রামকৃষ্ণ দর্শন-

লাভ করলেন ইষ্টদেবীকে। জগজ্জননী আন্থাশক্তিকে। মাতৃভাবে বিভোর রামকৃষ্ণ আনন্দবিহ্বল হলেন। অন্তরের অন্তস্তল হতে উত্থিত সঙ্গীত মায়ের চরণে নিবেদন করলেন।

মন যদি মোর ভুলে,
তবে বালির শয্যায় কালীর নাম
দিও কর্ণমূলে।

আর একটি নূতন দিন। মনে হয় যেন কোন ভাবনা নাই। চিন্তা নাই। চির মুক্ত। রাজা রামকৃষ্ণের জীবনের সেই পরম-মুহূর্তটি ধীরে ধীরে ঘনিয়ে এলো।

সেবক শিষ্য উত্তরসাধক ভোলানাথ যোগীবরের কর্ণমূলে বার বার মাতৃনামের সুধা সিঞ্চন করতে লাগলেন। আর সেই মাতৃনাম সুধা পান করতে করতে ধীরে ধীরে সুধা-সমুদ্রে নিমগ্ন হলেন মাতৃ-সাধক রাজা রামকৃষ্ণ। মহাসাধক মহাসমাধিতে হলেন নিমগ্ন।

সতেরো শো পঁচানব্বই খ্রীষ্টাব্দের এক শুভ দিনে। গঙ্গাতীরে তখন গঙ্গার তরঙ্গধ্বনিতে যেন ধ্বনিত হতে লাগলো ভক্তপ্রাণ রাজা রামকৃষ্ণ নাম।

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব বৃন্দাবন যাত্রার ছলে নীলাচল হতে রামকেলি গ্রামে এসে শ্রীরূপ ও সনাতন গোস্বামীকে ভক্তিরসামৃত সুধা পান করালেন। সেই সময় মহাভাবে বিভোর হয়ে নাম সংকীর্তন করতে করতে পদ্মা নদী অভিমুখে দৃষ্টিপাত করে প্রেমকণ্ঠে 'নরু-নরু' বলে কাকে যেন আহ্বান করলেন। তারপর রামকেলি থেকে ফিরবার পথে পদ্মাতীরের 'গড়ের হাট' গ্রামে এসে আশ্রয় নিলেন এক তমাল বৃক্ষতলে। সম্মুখেই প্রবাহিতা পুণ্যসলিলা পদ্মা। নদী সলিলে স্নান করে ভাবমগ্ন হয়ে প্রভু বললেন,—পদ্মা, আমার প্রেম তোমার নিকট সঞ্চিত রাখলাম, যথাসময়ে তুমি অর্পণ করো নরুকে।

এই নরুই হলেন পরম বৈষ্ণব শ্রীশ্রীনরোত্তম ঠাকুর। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আবেশাবতার। নরোত্তম ঠাকুর ১৪৫৫ শকে শুভ মাঘী পূর্ণিমার দিন আবির্ভূত হলেন বাংলার মাটিতে। পদ্মাতীরের খেতুরী গ্রামে। জেলা রাজসাহী।

পিতা হলেন খেতুরীর রাজা কৃষ্ণানন্দ দত্ত আর মাতা নারায়ণী দেবী। পিতা মাতা উভয়েই ছিলেন ধর্মনিষ্ঠ। জন্ম সময়ে ধর্মপ্রাণ পিতামহও ছিলেন জীবিত।

> শ্রীকৃষ্ণানন্দের পিতা পরমমহান।
> পৌত্রের কল্যাণে দেন বহু অর্থ দান॥
> গায়ক মাগধ সূত বন্দীরে।
> বৈছে তুষ্ট কৈল তাহা কে বর্ণিতে পারে॥

(নরো—২)

দিনে দিনে শিশু বড় হয়ে ওঠে। শিশুর ছদ্মবেশে আত্মগোপন করে অনাদিকালের এই মহাশিশু দুজ্ঞে'য় মহাভাবের শৈশবলীলায় তখনও অপ্রকাশ হয়ে রইলেন। অন্নপ্রাশনের সময় ঘটলো এক অভাবনীয় ঘটনা। অনিবেদিত অন্ন ছোট্ট শিশুর সম্মুখে দেওয়া হলো, শিশু কিন্তু বিচিত্র মুখভঙ্গিমা করে মুখ ফিরিয়ে রাখলো। স্পর্শও করলো না। চিন্তিত হলেন পিতামাতা। অবশেষে যখন নিবেদিত প্রসাদ সম্মুখে রাখা হলো সানন্দে গ্রহণ করলো লীলাময় এই শিশু।

আবার সেই শৈশবলীলার দিনগুলিরও হলো অবসান। শৈশবের পর এল বাল্যকাল। তখনও মেতে রইলেন অপ্রাকৃত ভাবের খেলায়। শুরু হলো শিক্ষাজীবন। অসাধারণ মেধার পরিচয় দিলেন শিক্ষা-জীবনে। আর এই বাল্য ও কৈশোরজীবনে প্রভাবিত হলেন গ্রাম-বাসী পরম ভাগবত শিক্ষাগুরু শ্রীল কৃষ্ণদাসের দ্বারা। তাঁর মুখ-নিঃসৃত শ্রীগৌরসুন্দরের লীলাময় অলৌকিক জীবনের লীলাকাহিনী শুনে মুগ্ধ হতেন কিশোর নরু। আরও শুনতেন মহাপ্রভুর দ্বিতীয় প্রকাশ আচার্যপ্রভু শ্রীনিবাসের বৈচিত্র্যময় জীবনলীলা। শ্রীনিবাস আচার্যের দর্শনের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলেন কিশোর নরু—নরোত্তম। ধীরে ধীরে কিশোর বয়স হতেই নরু ভক্ত নরোত্তমে হলেন রূপান্তরিত। উদাস অনাসক্ত ভাব। প্রেমময় গৌরাঙ্গ ভাবে বিভোর।

বাল্যকালে পরম বৈষ্ণব শ্রীল কৃষ্ণদাস, যে ভক্তিভাবের বীজ নরু'র অন্তরে বপন করেছিলেন ক্রমে ক্রমে সেই বীজই অঙ্কুরিত হয়ে বিশাল মহীরুহে হয়েছিল পরিণত। নরু হয়ে উঠেছিলেন শ্রীশ্রীনরোত্তম ঠাকুর। শ্রীল কৃষ্ণদাস বৈষ্ণবজগতে কৃষ্ণদাস বিপ্র নামে খ্যাত। গৌর অন্ত প্রাণ। নরোত্তম ঠাকুরের বিদ্যাগুরু।

শ্রীখেতুরী গ্রামে এক প্রবীণ ব্রাহ্মণ।
নাম তার কৃষ্ণদাস কৃষ্ণ পরায়ণ॥

চৈতন্যের আদি মধ্য অন্তলীলা যত।
ক্রমে শুনাইল কিছু হৈয়া সাবহিত॥
(নরো—১।১৬ পৃঃ)

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নরোত্তমের মনে বৈরাগ্যভাব আরও প্রবল হয়ে উঠলো। পিতামাতা নিশ্চিন্ত হলেন। অপরিমেয় ধনসম্পদ ও প্রাচুর্যের মধ্যেই লালিত পালিত হচ্ছে পুত্র, কিন্তু ভোগ লালসার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না তার আচরণে, মুখের ভাষায় আর চোখের দৃষ্টিতে।

মনের শান্তি হারিয়েছেন নরোত্তম। দিবারাত্র মেতেছেন কৃষ্ণ-নাম আর গৌরগুণকীর্তনে। সর্বশাস্ত্র অধ্যয়ন করে ভক্তিভাবকেই জীবনবেদ করে নিয়েছেন। তাইতো কৃষ্ণপ্রেমে আকুল শ্রীল নরোত্তম। ব্রজধামের জন্য তাঁর প্রাণ হতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ক্রন্দন রোল উত্থিত হচ্ছে। ব্রজের রস আস্বাদনের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছে তাঁর দেহ মন আত্মা।

অকস্মাৎ স্বপ্ন দেখেন শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু বলছেন,—'নরু, শুদ্ধ প্রেম তোমার জন্য পদ্মায় সঞ্চিত আছে। তুমি পদ্মায় স্নান করে মহাপ্রভুর রক্ষিত সেই প্রেমলাভ করো। তারপর মহাপ্রভুর মুখনিঃসৃত নরোত্তম ঠাকুরের আগমন বার্তা সম্বন্ধে সমস্ত ইতিহাস বিবৃত করলেন প্রভু নিত্যানন্দ। স্বপ্ন ভঙ্গ হলো। মুগ্ধ বিস্মিত ও অভিভূত হলেন ভক্তপ্রাণ নরোত্তম।

ভাবানন্দে বিভোর হয়ে মহাপ্রভুর নির্দেশিত পদ্মার সেই ঘাটে স্নান করলেন, আর কৃষ্ণপ্রেমে হলেন উন্মত্ত। সেই অচিন্ত্য মধুর রসে হলেন মগ্ন। শ্রীশ্রীরাধাশ্যামের মাধুরী হৃদয়ঙ্গম করে নয়নজলে ভাসতে লাগলেন। প্রেমভক্তির উদয় হওয়ায় কৃষ্ণ-সেবার জন্য আকুল হয়ে উঠলেন।

নরোত্তম দাসের মন প্রাণ কাঁদে রাত্রি দিনে,
পাছে ব্রজ প্রাপ্তি নাহি হয় ॥

ভক্তের প্রাণ আকুল হওয়ায় বিচলিত হলেন শ্রীগৌরসুন্দর। স্বপ্নে আবির্ভূত হয়ে বললেন,—নরু, তুমি বৃন্দাবনধামে যাও। সেখানে লোকনাথের আশ্রয় গ্রহণ করো। তোমার গৃহত্যাগের সুযোগ আসন্ন।

সত্য সত্যই সুযোগও এসে উপস্থিত হলো। পিতা কৃষ্ণানন্দ দত্ত প্রয়োজনীয় কার্যোপলক্ষে গেলেন গৌড়ে। সেই সুযোগে মাতার অনুমতি নিয়ে গৃহত্যাগ করলেন নরোত্তম। যুবা বয়সে।

যেন নিত্যানন্দের প্রেম মূর্তিমান হয়ে মহাপ্রভুর প্রেমস্বরূপের নিকট ধরা দেবার জন্য খেতুরী হতে ছুটে চললেন সুদূর বৃন্দাবন-ধামের পথে। ভবিষ্যতের শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর।

দুস্তর দুর্গম পথ অতিক্রম করে চলেছেন পদব্রজে রাজনন্দন। কৃষ্ণপ্রেমে, গৌরপ্রেমে পথকষ্টও ভুলেছেন। অপ্রাকৃত এক ভাবে বিভোর ভক্তপ্রাণ নরোত্তম। পথেও নানারূপ অলৌকিক দর্শন হলো।

একদিন এক বৃক্ষের শীতল ছায়ায় উপবেশন করে ভাবাবিষ্ট হয়ে পড়লেন। আত্মহারা হয়ে শ্রীকৃষ্ণ আনন্দ বিগ্রহের প্রীতিরস আস্বাদন করছেন। অকস্মাৎ নয়নগোচর করলেন অপরিচিত এক গৌরবর্ণ পুরুষ এক ভাঁড় দুধ নিয়ে তার সম্মুখে দণ্ডায়মান। আর বিনয় নম্র কণ্ঠে অনুরোধ করছেন দুধ পান করবার জন্য। অভিমানভরে ভক্ত-প্রবর নরোত্তম প্রত্যাখ্যান করলেন। অভাবনীয় ব্যাপার। পর-মুহূর্তেই ভাবাবেশে দেখলেন শ্রীরূপ আর শ্রীল সনাতন স্নেহার্দ্র কণ্ঠে অনুরোধ করছেন ঐ দুধ সেবন করার জন্য। কারণ অনাহারে ক্লান্ত হয়ে পড়লে সুদূর বৃন্দাবনে পৌঁছানো অসম্ভব হয়ে পড়বে। শ্রীগৌর-সুন্দরের মনোবাসনা অপূর্ণ রয়ে যাবে যে। ভাব-বিহ্বল হয়ে সে দুধ গ্রহণ করলেন নরোত্তম। পথশ্রমের ক্লান্তি দূর হলো। অদৃশ্য

হলেন গৌর বরণ পুরুষ। আত্মভূত হয়ে পরমানন্দ অনুভব করতে লাগলেন মনে মনে। স্থির বিশ্বাস হলো এ গৌরসুন্দরের কৃপা ছাড়া আর কিছুই নয়।

আবার শুরু হলো পদযাত্রা। দ্বিগুণ উৎসাহে কৃষ্ণপ্রেমে ব্যাকুল হয়ে পথ চলতে লাগলেন। মাঠ-ঘাট প্রান্তর-বনভূমি গ্রামের পর গ্রাম শহরের পর শহর পেছনে ফেলে চির আপনের সন্ধানে। ব্রজ-ভক্ত শ্রীল নরোত্তম চললেন ব্রজধামের পথে।

অবশেষে এসে উপস্থিত হলেন শ্রীধাম বৃন্দাবনে। আর এই বৃন্দাবনধামেই শুরু হলে তাঁর কঠোর সাধনার জীবন। স্বপ্নাদিষ্ট গুরু শ্রীল লোকনাথ গোস্বামীর কৃপাপ্রার্থী হলেন। লোকনাথ গোস্বামী ইতিপূর্বে কাউকেই শিষ্যত্বে বরণ করেন নি। আর তাঁর জীবন কাহিনীও অতি বিচিত্র। কঠোর তপস্যার জীবন। তাইতো তরুণ নরোত্তম দীক্ষাপ্রার্থী হলে তিনি প্রত্যাখ্যান করলেন। নরোত্তম বিচলিত হলেন না। মনে মনে গুরুরূপেই বরণ করলেন পরম বৈষ্ণব লোকনাথকে। ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার জীবন হলো শুরু। প্রত্যহ রাত্রি শেষ প্রহরে সম্মার্জনী দিয়ে গুরুদেবের শৌচস্থান পরিষ্কার করে রাখতেন। তারপর সেই সম্মার্জনী হৃদয়ে ও মস্তকে স্পর্শ করে ভক্তিভরে রেখে দিতেন। এইভাবে অতি গোপনে গুরুসেবা চললো দিনের পর দিন মাসের পর মাস। বছর ঘুরে এলো। অকস্মাৎ একদিন গুরুর হাতে পড়লেন ধরা। গুরু তরুণ সাধকের ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা দর্শন করে প্রীত হলেন। স্নেহার্দ্র কণ্ঠে বললেন,—তুমি যদি আজীবন ব্রহ্মচর্য ব্রত ধারণের সঙ্কল্প করতে পারো, তবে তোমার বাসনা পূর্ণ হতে পারে। পথ বড় কঠিন। চিন্তা করে দেখ।

অবশেষে শ্রাবণের পূর্ণিমা দিবসে শ্রীজীব গোস্বামী, আচার্য প্রভু শ্রীনিবাস ও অন্যান্য বৈষ্ণবাচার্যদের কৃপাশীর্বাদ মস্তকে ধারণ করে লোকনাথ গোস্বামীর সম্মুখে এসে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন কঠোর তপস্যার

জীবনকে বরণ করবেন বলে। হৃষ্টচিত্তে লোকনাথ গোস্বামী শ্রীল নরোত্তমকে দিলেন সন্ন্যাসীর দীক্ষা।

শ্রাবণ মাসের পৌর্ণমাসী শুভক্ষণে।
করিলেন শিষ্য লোকনাথ নরোত্তমে॥

আর নরোত্তমও পরবর্তীকালে কঠোর সাধনাবলে প্রেম সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। নিষ্ঠা ও ভক্তিভাব দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন ব্রজমণ্ডলের বৈষ্ণবাচার্যগণ। তাঁরা শ্রীল নরোত্তমকে মেনে নিয়েছিলেন শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আবেশাবতার বলে। শ্রীল নরোত্তমও সাধারণ মানুষের শ্রদ্ধায় একদিন সত্য সত্যই ঠাকুর হয়ে উঠেছিলেন। ভক্তরা বলতেন শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর। আর এই তিন আবেশাবতার আচার্য প্রভু শ্রীনিবাস, শ্যামানন্দ গোস্বামী ও নরোত্তম ঠাকুরের মিলন হয় এই ব্রজভূমি বৃন্দাবনধামে। বৈষ্ণবাচার্যদের গ্রন্থপঞ্জী নিয়ে গো-শকটে করে যখন যাত্রা করেছিলেন শ্রীনিবাস আচার্য প্রভু গৌড় অভিমুখে, সেই সময় নরোত্তম ঠাকুরও সহযাত্রী হয়েছিলেন। আর গ্রন্থপঞ্জী অপহরণকারী বন-বিষ্ণুপুরের দস্যুরাজ বীর হাম্বীর আচার্য শ্রীনিবাসের অলৌকিক ক্ষমতাবলে যখন পরম বৈষ্ণবে রূপান্তরিত হয়েছিলেন, তখন প্রত্যক্ষদর্শীরূপে উপস্থিত ছিলেন নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়।

এবারে শুরু হলো বৈষ্ণবশাস্ত্র অধ্যয়নের জীবন। শ্রীজীব গোস্বামীর নিকট ছাত্ররূপে শ্রীল নরোত্তম ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন শুরু করলেন। ধীরে ধীরে সমগ্র বৈষ্ণবশাস্ত্রগ্রন্থ অধ্যয়ন করে শিক্ষা-গুরু শ্রীজীব গোস্বামীকেও প্রীত করলেন।

ভজন অধ্যয়ন আচার্য প্রভু শ্রীনিবাসের সঙ্গ আর গুরু-সেবায় করলেন আত্মনিয়োগ। শ্রীল নরোত্তমের ত্যাগ তিতিক্ষা ধৈর্য সহিষ্ণুতা ভাবপূর্ণ ভজন ও পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে শ্রীজীব গোস্বামী, 'ঠাকুর মহাশয়' উপাধিতে অভিষিক্ত করলেন। নরোত্তম হলেন

শ্রীশ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয়। সমগ্র ব্রজমণ্ডলে ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব-জগতে নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় বলেই পরিচিত হলেন।

শ্রীশ্রীরাধাশ্যামের সঙ্গ ও সেবাভিলাষময় ব্যাকুলতার উজ্জ্বল বিগ্রহ শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয় মুমুক্ষু ভক্তবৃন্দকে শ্রীগৌরসুন্দরের প্রদর্শিত প্রেমভক্তির পথ নির্দেশ করলেন। আর যুগল প্রেম সেবা-ভাবনার কথামৃত প্রকাশ করলেন শ্রীশ্রীপ্রেমভক্তি চন্দ্রিকা গ্রন্থের মাধ্যমে। বৈষ্ণব ভক্তের প্রাণ আর একবার নূতন করে ভাষালাভ করলো আর তাদের মনের মাটি হয়ে উঠলো সিক্ত।

নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় বলেন,—

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু মোরে যে বলান বাণী।
তাহা বিনা ভাল মন্দ কিছুই না জানি॥
শ্রীগোপীনাথ পাদপদ্ম হৃদয়ে বিলাস।
প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা কহে নরোত্তম দাস॥

অবশেষে রাজনন্দন শ্রীনরোত্তম দীন সন্ন্যাসীর বেশে উপস্থিত হলেন খেতুরীতে। তখন পিতৃদেব দেহলীলা সংবরণ করেছেন। শ্রীল নরোত্তম রাজ্যভার অর্পণ করলেন খুল্লতাত পুত্র শ্রীসন্তোষ দত্তের উপর। আর রাজধানী খেতুরী থেকে এক ক্রোশ দূরে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করলেন। জনপদের মানুষেরা বলতো 'ভজনটুলি'। আর মহা সমারোহে প্রতিষ্ঠা করলেন ছয় বিগ্রহের। শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীবল্লবীকান্ত, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীব্রজমোহন ও শ্রীরাধাকান্ত। বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে মহা মহোৎসবের আয়োজন করলেন। হরিনামগানে আর মৃদঙ্গের ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠলো 'ভজনটুলি'। খেতুরীর শ্রীল নরোত্তমের আশ্রম গৃহ। আচার্য প্রভু শ্রীনিবাসও এই মহোৎসবে উপস্থিত হয়েছিলেন।

পদ্মার তরঙ্গধ্বনির মতো ভক্তের কণ্ঠে কণ্ঠে ধ্বনিত হলো নরোত্তম

ঠাকুর নাম। সমগ্র গৌরমণ্ডলকেই আবার নামগানে গৌর কীর্তনে মাতিয়ে তুললেন নরোত্তম ঠাকুর।

আবার একদিন বহির্গত হলেন নামপ্রচারে ঠাকুর মহাশয় শ্রীল নরোত্তম। নবদ্বীপ শান্তিপুর খানাকুল কৃষ্ণনগর সপ্তগ্রাম হয়ে যাত্রা করলেন গৌরসুন্দরের লীলাভূমি নীলাচলের পথে।

শ্রীক্ষেত্রে এসে মিলিত হলেন পরমবৈষ্ণব গোপীনাথ আচার্যের সঙ্গে। গোপীনাথ হলেন সার্বভৌম ভট্টাচার্যের ভগ্নীপতি আর মহাপ্রভুর মরমী ভক্ত। তিনিই পুরীধামে সর্বপ্রথম শ্রীগৌরাঙ্গকে ভগবানের অবতার বলে প্রচার করেন।

গোপীনাথ আচার্যকে দর্শন করে শ্রীল নরোত্তম বলছেন,—

গোপীনাথ আচার্য আদি পরম বৈষ্ণব।
দেখিলাম অতি জীর্ণ হইয়াছেন সব॥

মানব প্রেমিক নরোত্তম ঠাকুর একদিন ফিরে এলেন গৌরমণ্ডলে। আর বৈষ্ণবধর্ম প্রচারে মেতে উঠলেন। আর্ত মুমুক্ষু মানুষকে দীক্ষিত করতে লাগলেন। সর্বশ্রেণীর মানুষের জন্যই উন্মুক্ত করে দিলেন অমৃত আস্বাদনের দ্বার।

বিচলিত ও চিন্তিত হলেন পক্ক-পল্লীর ভূস্বামী রাজা নরসিংহ। রাজসভার পণ্ডিতমণ্ডলী বললেন,—'মহারাজ ঘোর কলিকাল উপস্থিত। খেতুরীর কায়স্থ রাজা কৃষ্ণানন্দের পুত্র নরোত্তম শূদ্র হয়েও ব্রাহ্মণকে দীক্ষা প্রদান করে শিষ্য করছে। ধর্ম কর্ম সব পণ্ড হয়ে যাচ্ছে। দেবীর পূজায় বলিদান রহিত হচ্ছে। লোক মৎস্য মাংস ভোজন পরিত্যাগ করে 'হরি হরি' বলে নেচে নেচে চীৎকার করতে করতে পাগল হয়ে যাচ্ছে। নরোত্তম কুহক বিদ্যা জানে। সেই বিদ্যা-বলে দেশকে ছারেখারে দিচ্ছে। আপনি দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। আপনি ব্রাহ্মণের মান-সম্ভ্রম আর সনাতন হিন্দু ধর্মকে রক্ষা করুন।'

কৃষ্ণানন্দ দত্ত পুত্র নরোত্তম দাস।
ব্রাহ্মণেরে মন্ত্র দিয়া কৈল সর্বনাশ॥
বুঝি এতদিনে ঘোর কলি উপস্থিত।
শূদ্রের ব্রাহ্মণ শিষ্য শুনি কাঁপে চিত্ত॥

(প্রেম)

অবশেষে রাজা নরসিংহের নির্দেশে পণ্ডিতমণ্ডলী খেতুরীতে আগমন করলেন অনাচার প্রত্যক্ষ করবার জন্য। নরোত্তম ঠাকুরের গৌরবর্ণ দিব্যদেহ দর্শন করে আর ভাববিহ্বল অবস্থায় কৃষ্ণকীর্তন গৌরকীর্তন শ্রবণ করে মুগ্ধ ও অভিভূত হলেন তাঁরা। সমগ্র পণ্ডিত-মণ্ডলীর মস্তক অবনত হলো ঠাকুর মহাশয়ের চরণে, তাঁর ত্যাগ তিতিক্ষা সহিষ্ণুতা পাণ্ডিত্য ও বিনয়নম্র স্বভাবগুণের সাহচর্য লাভ করে। নরোত্তম ঠাকুরের সঙ্গলাভে কৃত কৃতার্থ হয়ে পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ বললেন,—

হৃদে যাঁর ব্রহ্ম আছে, সে হয় ব্রাহ্মণ।
বাহ্য পৈতা কেবল ব্রাহ্মণ জাতির লক্ষণ।

(প্রেম বিলাস)

সবকিছু শুনে মুগ্ধ বিস্মিত ও অভিভূত হয়ে রাজা নরসিংহ ও রাণী রূপমালা শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের নিকট হতে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হয়ে শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন।

অবশেষে একদিন চাঁদরায়ও নরোত্তম ঠাকুরের কৃপাপ্রার্থী হলেন। দুর্ধর্ষ জমিদার চাঁদ রায়। লুণ্ঠতরাজ করে অর্থ উপার্জন করতেন। অত্যাচারী জমিদার বলেই খ্যাতি ছিল।

তাহার পাপের কথা লেখা নাহি যায়।
কানে হাত দিয়া লোক ছাড়িয়া পালায়॥

(প্রেম)

সেই কুখ্যাত জমিদার চাঁদ রায়কেও ঠাকুর শ্রীনরোত্তম গৌর নামে দীক্ষিত করলেন। মন্ত্রবলে পরিবর্তিত হলো চাঁদ রায়ের

জীবনাদর্শ। ধীরে ধীরে বিনয়নম্র পরমবৈষ্ণব রূপে রূপান্তরিত হলেন।

জয় চাঁদ রায় চারু চরিত্র বিদিত।
বৈষ্ণব সেবায় যার পরম পীরিত॥

(নরো-১২)

দিকে দিকে প্রচারিত হলো শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের সাধনার জীবনের সফলতার কথা। ভক্ত জনতার সমাগম হয় খেতুরীর ভজনটুলিতে। এক তীর্থক্ষেত্রে রূপান্তরিত হলো খেতুরী। শত শত আর্ত মুমুক্ষু মানুষ এসে ভিড় করে আর মাথা লুটিয়ে প্রণাম করে সন্ন্যাসী ঠাকুরকে। মহাপুরুষকে। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়কে। তৃপ্ত হয়ে আর শান্ত হয়ে ফিরে যায় গৃহে।

হিন্দুসমাজের সেই সঙ্কট সন্ধিক্ষণে মহাপ্রভুর প্রেমধর্মের আদর্শকে ত্যাগ সহিষ্ণুতা আর গভীর নিষ্ঠার সাহায্যে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর আবার নূতন প্রাণে উদ্দীপিত করে তুলেছিলেন। হরিনাম গানে আর মৃদঙ্গের ধ্বনিতে আর একবার মুখরিত করে তুলেছিলেন বঙ্গভূমির মঠ-মন্দির গ্রাম-শহরকে। গ্রামে গ্রামে প্রেমধর্ম প্রচার করে নিত্যানন্দ প্রভুর অসম্পূর্ণ কার্যকে সম্পূর্ণ করেছিলেন পরম বৈষ্ণব আজন্ম ব্রহ্মচারী শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়।

এইভাবে কৃষ্ণগুণগানে আর গৌরকীর্তনে মত্ত হয়ে ব্রজসুধারস আস্বাদন করতে করতে একদিন কোটি সঙ্গীতের মধুরতার মধ্যে ডুব দিলেন শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর। চিরদিনের জন্য। মহাবৈষ্ণব প্রবেশ করলেন নিত্যলীলায়।

উদ্ধারণ ঠাকুর

পঞ্চদশ শতাব্দীর সেই উদ্ধারণপুর আর সেই মন্দির, যে মন্দিরে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ ও গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর শ্রীমূর্তি নিজ হাতে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন ভক্তপ্রাণ উদ্ধারণ ঠাকুর, সেই মন্দির আজও আছে। আজও সেখানে ভক্তকণ্ঠের হরিনাম গানে ও মৃদঙ্গের ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে ওঠে মন্দিরপ্রাঙ্গণ। ধনী ভূস্বামী সুবর্ণবণিক উদ্ধারণ দত্ত একদিন এখানেই তো শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ মহাপ্রভুর চরণে প্রণত হয়ে ভক্তিসুধার উপহার করেছিলেন গ্রহণ। আর সর্বস্ব ত্যাগ করে পরম বৈষ্ণব হয়ে নিত্যানন্দ প্রভুর চরণ সেবায় হয়েছিলেন ব্রতী।

নিত্যানন্দ প্রভুবর পরম আনন্দে।
সেই ঘাটে স্নান করিলেন সর্ববৃন্দে॥
উদ্ধারণ দত্ত ভাগ্যবন্তের মন্দিরে।
রহিলেন তথা প্রভু ত্রিবেণীর তীরে॥
কায়মনোবাক্যে নিত্যানন্দের চরণ।
ভজিলেন অকৈতবে দত্ত-উদ্ধারণ॥
নিত্যানন্দ-স্বরূপের সেবা-অধিকার।
পাইলেন উদ্ধারণ, কিবা ভাগ্য তাঁর॥
জন্ম জন্ম নিত্যানন্দ স্বরূপ ঈশ্বর।
জন্ম জন্ম উদ্ধারণো তাঁহার কিঙ্কর॥

(চৈঃ আঃ অ ৫।৪৪৮-৪৫২)

চৈতন্য-চরিতামৃতের কবি বলেন,—

মহাভাগবত শ্রেষ্ঠ দত্ত উদ্ধারণ।
সর্বভাবে সেবে নিত্যানন্দের চরণ॥

(চৈঃ চঃ আদি ১১।৪১)

উদ্ধারণ ঠাকুরের কৃষ্ণপ্রেম ত্যাগ ও বৈরাগ্য দর্শন করে পরম বৈষ্ণবী ভগবতীও হয়েছিলেন বিচলিত। তাইতো একদিন কিশোরী মূর্তিতে উদ্ধারণপুরে আবির্ভূতা হয়ে উদ্ধারণপুরের মাটিকে করেছিলেন পবিত্র।

গ্রাম্যজনপদের স্মৃতি ও টুকরো টুকরো প্রবাদের মধ্যে সে কাহিনী আজও হয়ে রয়েছে জীবন্ত।

মধ্যাহ্নের খরতাপে এক শাঁখা বিক্রেতা চলেছে সপ্তগ্রামের দিকে। চলতে চলতে এই উদ্ধারণপুর গ্রামে এসে হঠাৎ দাঁড়ালো সে, এক রূপবতী কিশোরী মেয়েকে ছুটে আসতে দেখে। চোখ ফেরানো যায় না এমন রূপ। যেন রূপের কুসুম! সর্বাঙ্গ সুন্দরী এমন মেয়ে জীবনে দেখেনি সে। তারপর তাকে হতবাক করে দিয়ে এক জোড়া মনের মত শাঁখা নিয়ে কোথায় যেন হয়ে গেল অদৃশ্য। পয়সা নেবার জন্য দেখিয়ে দিয়ে গেল উদ্ধারণ দত্তের গৃহ। আরও বলে গেল যদি উদ্ধারণ বিশ্বাস না করেন তাহলে তাঁকে বলো, পুবের ঘরের পশ্চিমদিকের কুলুঙ্গায় আছে পাঁচটি সুবর্ণমুদ্রা। তাই যেন দিয়ে দেয় তোমাকে। তাতেও বিশ্বাস না হলে এখানে এসো। আমার দেখা পাবে।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই ঘটে গেল এই অভাবনীয় ব্যাপার। এত সময় ধরে শাঁখা বিক্রেতা কিসের মোহে যেন হয়েছিলো মোহাচ্ছন্ন। তারপর ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়ে উদ্ধারণ দত্তের গৃহপ্রাঙ্গণে এসে হলো উপস্থিত। বললো সবকিছু যেমন যেমন ঘটেছিল। উদ্ধারণ দত্তকে।

শাঁখারীর কথা শুনে বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে বলে উঠলেন উদ্ধারণ দত্ত—বাপু হে! আমার তো কন্যা নাই, তবে যদি অন্য কারো মেয়ে শাঁখা নিয়ে আমার নাম করে থাকে বলতে পারি না।

শাঁখারী তখন কুলুঙ্গায় রক্ষিত সুবর্ণমুদ্রার কথা উল্লেখ করলো। উদ্ধারণ দত্ত শাঁখারীর কথার সত্যতা নিরূপণের জন্য কুলুঙ্গায়

অনুসন্ধান করলেন এবং সত্য সত্যই পাঁচটি স্বর্ণমুদ্রা পেলেন দেখতে। বিস্মিত ও অভিভূত হয়ে মনে মনে বললেন, এ মেয়ে তো সাধারণ মেয়ে নয়। এঁর দর্শনলাভ করতেই হবে।

অবশেষে শাঁখারীর নিকটে এসে বললেন,—বাপু হে, যদি তুমি আমায় সেই মেয়েকে দেখাতে পারো তাহলে এই পাঁচটি মুদ্রা তোমারই প্রাপ্য।

শাঁখারী উদ্ধারণ দত্তের কথায় সম্মত হলো। উদ্ধারণ দত্তও চললেন শাঁখারীর পিছু পিছু। নির্দিষ্ট স্থানে এসে বালিকাকে অনুসন্ধান করতে লাগলো শাঁখারী। বহু অনুসন্ধান করেও সেই গ্রামের মেয়ের দর্শন মিললো না। তখন উদ্ধারণ দত্ত বললেন শাঁখারীকে,—বাপুহে, তুমি মহাভাগ্যবান। এই মেয়ে সামান্য মেয়ে নয়। ইনি মানবী নন, দেবী। পরম বৈষ্ণবী ভগবতী। তুমি মা'কে দেখেও চিনতে পারলে না?

এবারে শাঁখারী বুঝতে পারলো, কি সে ভুল করেছে। অভিভূত হয়ে উদ্ধারণ দত্তের চরণে লুটিয়ে পড়লো। হাত ধরে তুলে স্নেহালিঙ্গন দিলেন উদ্ধারণ দত্ত। মাতৃহারা সন্তানের মত উভয়েই তখন নয়নজলে ভাসতে লাগলেন। উপস্থিত হলেন গঙ্গাতীরে। শাঁখারী আকুল প্রাণে বলতে লাগলো,- মা গো! তুমি কি পূর্বকথা ভুলে গেলে! তুমি যে বলেছিলে এখানে এলেই আমার দেখা পাবে। মা গো! আমি যে দত্তমশায়ের কাছে মিথ্যাবাদী হলেম। মিথ্যাপবাদ মোচনের জন্য একবার শাঁখা দু'গাছা দেখা মা!

সন্তানের আকুলতায় বিচলিত হলো মায়ের প্রাণ। পুণ্যতোয়া গঙ্গার মধ্য হতে শঙ্খ-পরিহিত হস্ত দুইখানি তুলে দেখালেন। অলৌকিক সে দৃশ্য নয়নগোচর করলেন উদ্ধারণ দত্ত আর ভাগ্যবান শাঁখারী।

দিকে দিকে প্রচারিত হলো উদ্ধারণ দত্তের বৈরাগ্য ও সাধুতায় মুগ্ধ হয়ে স্বয়ং ভগবতী আবির্ভূতা হয়েছেন উদ্ধারণপুর গ্রামে।

তাইতো গ্রামের লোকে আর উদ্ধারণ দত্ত বলতো না। বলতো ঠাকুর উদ্ধারণ। পরম বৈষ্ণব উদ্ধারণ ঠাকুর। আর গঙ্গার সেই স্মৃতি বিজড়িত ঘাটকে লোকে বলতো উদ্ধারণ ঠাকুরের ঘাট।

উদ্ধারণ দত্ত মহাবৈষ্ণব উদার।
নিত্যানন্দ সেবায় যাঁহার অধিকার॥

৯৭৫ শকে উদ্ধারণ দত্তের আদিপুরুষ ভবেশ দত্ত অযোধ্যা থেকে সুবর্ণগ্রামে এলেন বাণিজ্য করতে। তৃপ্তি খুঁজে পেলেন এই গ্রামের মাটিতে। আর ফিরে গেলেন না দেশে। স্থানীয় বাসিন্দা কাঞ্জিলাল ধরের ভগিনী শ্রীমতী ভাগ্যবতীকে বিবাহ করে এখানেই বসবাস করতে লাগলেন। এই ভবেশ দত্তের পুত্র কৃষ্ণ দত্ত। সে সময় কৃষ্ণ দত্তের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি দূর দূরান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। কৃষ্ণ দত্তের পুত্র শ্রীকর দত্ত। সপ্তগ্রামের একজন প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ীরূপে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন শ্রীকর দত্ত। প্রচুর অর্থ ও ভূ-সম্পত্তির অধিকারী ছিলেন তিনি। স্ত্রী ভদ্রাবতী দেবী ছিলেন ভক্তিমতী রমণী।

১৪০৩ শকে ভদ্রাবতীর গর্ভে আবির্ভূত হলেন উদ্ধারণ দত্ত। ভবিষ্যতের ভক্তপ্রাণ ঠাকুর উদ্ধারণ। সে যুগের সমৃদ্ধিশালী সপ্তগ্রাম নগরীতে। সুবর্ণবণিক কুলে।

ধীরে ধীরে অতিক্রান্ত হলো বাল্য ও কৈশোরের দিনগুলি। যৌবনে পদার্পণ করলেন। যুবক উদ্ধারণ দত্ত খুবই বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিলেন কর্মজীবনে।

নবহট্ট বা নৈহাটির 'নৈরাজা' নামক রাজার দেওয়ানের পদ লাভ করলেন। ক্রমে ক্রমে বিরাট ধনী হয়ে উঠলেন। পৈতৃক সম্পত্তিও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত করলেন। উদ্ধারণ দত্ত হলেন ভূস্বামী উদ্ধারণ দত্ত। অবশেষে গৌড়ের সুলতান হুশেন শাহের নিকট হতে একটি জমিদারী ক্রয় করে নিজ নামানুসারে উদ্ধারণপুর রাখলেন। কাটোয়ার সন্নিকটে গঙ্গাতীরে গড়ে উঠেছিল এই উদ্ধারণপুর গ্রাম।

অকস্মাৎ শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু আবির্ভূত হলেন সপ্তগ্রামে। বৈষ্ণব-ধর্ম প্রচারমানসে। উচ্চ নীচ বৈশ্য বণিক সকলের গৃহই মুখর হয়ে উঠলো হরিনাম গানে। গঙ্গার এপার আর ওপার হতে, দূরের আর বহুদূরের জনপদ থেকে ছুটে আসতে লাগলো কৃষ্ণনাম পিপাসী মানুষ।

সপ্তগ্রামে সব বণিকের ঘরে ঘরে।
আপনে নিতাইচাঁদ কীর্তনে বিহরে॥
বণিক সকল নিত্যানন্দের চরণ।
সর্বভাবে ভজিলেন লইয়া শরণ॥

(চৈঃ ভাঃ অ। ৫)

আকস্মিকভাবে নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর সাহচর্য লাভ করে বিচলিত হলো ভূস্বামী উদ্ধারণ দত্তের মন। ব্যাকুল হলো অন্তর। অনুভব করেন তাঁর অন্তরের অতি গভীরে যেন এক আকুলতার পদ্মকোরক আলোকের স্পর্শলাভের জন্য এতদিন উন্মুখ হয়েছিল। আর এই জীবনই অঞ্জলি হয়ে গ্রহণ করবে ঐ আলোক, আর সেই আলোকের ধারায় ধুইয়ে দিয়ে ফুটিয়ে তুলতে হবে হৃদয়ের পদ্মকোরক। আর দেরি করেন নি উদ্ধারণ দত্ত। সংসারের সকল টান পিছনে ফেলে রেখে অতুল ভূসম্পত্তি পরিত্যাগ করে বৈরাগী হয়ে ছুটে গিয়েছিলেন নীলাচলে শ্রীগৌরাঙ্গের চরণ দর্শন অভিলাষে। সর্বদাই বিভোর হয়ে রইলেন কৃষ্ণনাম আর গৌরহরি নাম গানে। অবশেষে শ্রীকৃষ্ণ লীলা-স্থল শ্রীধাম বৃন্দাবনে এসেও বসবাস করলেন কিছুদিন। অবশিষ্ট জীবন শ্রীনিত্যানন্দের সেবায় করলেন অতিবাহিত। নিত্যানন্দ প্রভুর এত প্রিয় ছিলেন যে এক সময়ে সূর্যদাস পণ্ডিত গৃহে ব্রাহ্মণ ভট্টাচার্যগণ যখন জিজ্ঞেস করলেন,—শ্রীপাদ আপনার সেবার জন্য রন্ধন কে করে? প্রত্যুত্তরে মহাপ্রভু বললেন,—কখনো আমি করি, না পারিলে উদ্ধারণ রন্ধন করে।

বাংলার বৈষ্ণবসমাজের মুখ আর একবার উজ্জ্বল হয়ে উঠলো বণিককুল চূড়ামণি উদ্ধারণ দত্তের প্রেম ভক্তি আর বৈরাগ্য দর্শন করে। উদ্ধারণ দত্ত হয়ে উঠলেন মহাবৈষ্ণব উদ্ধারণ ঠাকুর।

যতেক বণিককুল উদ্ধারণ হৈতে।
পবিত্র হইল দ্বিধা নাহিক ইহাতে॥
বণিক তরিতে নিত্যানন্দ অবতার।
বণিকেরে দিল প্রেম ভক্তি অধিকার।

উদ্ধারণপুরে মন্দির নির্মাণ করে স্থাপন করলেন শ্রীগৌরাঙ্গ আর নিত্যানন্দ প্রভুর শ্রীমূর্তি। ভজন পূজন আরাধনা নিয়ে বৈরাগীর জীবন যাপন করতে লাগলেন অবশেষে 'পুরাণ কানুর-পদচ্ছায়া'—কামনা করেই একদিন চোখ বন্ধ করে চিরকালের মত বিদায় নিলেন।

১৩৩৮ ৬০ বৎসর বয়সে; অগ্রহায়ণ কৃষ্ণা ত্রয়োদশীতে দত্ত ঠাকুর দেহলীলা করলেন সংবরণ। উদ্ধারণপুরে।

নিজ হৃদয়ের আকুলতার দুটি অশ্রুবিন্দুকে পূজার ফুলে পরিণত করে কৃষ্ণপদে নিবেদন করে ধন্য হয়েছিল উদ্ধারণ ঠাকুরের জীবন। ধন্য হয়ে ছিল বণিককুল। বৈষ্ণবসমাজ। আর তৃপ্ত হয়েছিলো অবহেলিত মুমূর্ষু মানুষের প্রাণ।